প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ ১৩৬৫

শব্দগ্রন্থন
ইন্ডিগ্রো
১২, জহরলাল নেহেরু রোড
কলিকাতা ৭০০০১৩

মুদ্রণ
ওয়েব ইম্প্রেশনস্
৩৪/২ বিডন স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৬

প্রকাশক
স্ত্রী
মন্দিরা সেন
১৬ সাদার্ন অ্যাভিনিউ
কলকাতা ৭০০ ০২৬

সূচি

মুখবন্ধ

গত কয়েক বছর ধরে স্ত্রী প্রকাশনী বাঙালি মহিলাদের লেখা দুষ্প্রাপ্য রচনা পুনঃপ্রকাশ করে বাঙালি পাঠকদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তাঁদের নতুন অবদান *পথের কথা*— গত শতাব্দীর শেষ ভাগ এবং বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে লেখা প্রায় অপরিচিত ভ্রমণ কাহিনী। সাহিত্যরস এবং নারী-চেতনার ইতিহাস—এই দুই দিক থেকেই লেখাগুলি মূল্যবান।

লেখিকারা বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রায় সকলেই পরিচিত নাম। কবির জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমাবী, বিখ্যাত স্মৃতিকথার রচয়িত্রী প্রসন্নময়ী, তাঁর কন্যা প্রিয়ম্বদা, বিপ্লবী চেতনার অন্যতরা পথিকৃৎ স্বর্ণকুমারীর কন্যা সরলা যথাক্রমে পাঁচটি ভ্রমণ কথার লেখিকা। ষষ্ঠ রচনাটি শরৎরেণুর। তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় প্রকাশক বা সম্পাদকরা উদ্ধার করতে পারেননি।

রচনাগুলির বিশেষত্ব কোথায় তার হদিশ পাই প্রসন্নময়ীর একটি উক্তিতে: "পুরুষের পক্ষে যাহা যেরূপ দেখায় নারীর নেত্রে তাহা ঠিক সেইরূপ না দেখিতে পারে।" না পারার অন্যতর কাবণ সে যুগের মহিলাদের কাছে দেশভ্রমণ একটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা। স্বর্ণকুমারী, প্রসন্নময়ী, প্রিয়ম্বদা, সরলা—এঁরা কেউই অসূর্যম্পশ্যা শুদ্ধান্তঃপুরবাসিনী ছিলেন না। কিন্তু পাঁচজন লেখিকার মধ্যে অন্তত তিনজন নতুন যুগের মানুষ হলেও পুরুষের উপর নির্ভরশীল। স্বর্ণকুমারীর চলনদার তাঁর "সক্রেটিস দাদা" দ্বিজেন্দ্রনাথ, প্রসন্নময়ী স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায় আর্যাবর্তমুখী, সঙ্গী "ভ্রাতা", শরৎরেণু পারস্যে পেট্রোল কোম্পানীর কর্মচারী স্বামীর সহগামিনী, এক প্রিয়ম্বদা পুরুষ চলনদারের উল্লেখ করেননি। আর সরলাবালা ত নবনারী, নেতৃস্থানীয়া— বর্মা মুলুকে সভায় নেতৃত্ব করতেই জাহাজে প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। এঁদের চোখে দেখা পৃথিবী পুরুষের চেতনা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কিনা জানি না। কিন্তু ভ্রমণ যে এঁদের কাছে একটা বিশেষ সৌভাগ্যের দ্যোতক, ঘরের বাইরের জগৎটাকে নির্দ্বিধায় দেখা একটা প্রাণচঞ্চলকারী অভিজ্ঞতা, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সেই অ্যাডভেঞ্চারের রস কাহিনীগুলিতে সুস্পষ্ট।

শুধু নারীর রচনা হিসাব নয়, ভ্রমণকাহিনী হিসাবেও এ লেখাগুলির বিশেষ মূল্য আছে। গত একশ বছরে ভারতবর্ষের চেহারা কতটা বদলে গিয়েছে তার পরিচয় এই ভ্রমণকাহিনী থেকে পাওয়া যায়। প্রসন্নময়ী দেবীর "আর্য্যাবর্ত্ত"-এ বর্ণিত শাহী দিল্লী গালিবের ভেঙে যাওয়া পোড়ো বাগান, লেখিকার ভাষায় "শাপভ্রষ্ট সুরধাম"। বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরী থেকে এসে দিল্লীতে ইংরাজের তৈরী বাড়িঘর তাঁর চোখে তুচ্ছ মনে হয়। দিল্লীর পথ জনবিরল, কার্জন-পূর্ব যুগে প্রত্নসৌধগুলি অযত্নলাঞ্ছিত। স্বাধীন ভারতের রাজধানীর সঙ্গে লেখিকাবর্ণিত

দিল্লীর মিল অল্পই। উপমহাদেশে জনসংখ্যা বাড়ায় সহর-গ্রামের বাহ্যিক রূপ কত পরিবর্তন হয়েছে তার উদাহরণ মেলে লেখিকার মথুরা-বৃন্দাবন বর্ণনায়। মথুরায় লেখিকা "কেমন একটি শান্তিময় শোভা ও নীরবতা" দেখেছিলেন, তাঁর দেখা বৃন্দাবন "স্বর্ণ কাননবৎ", যমুনার ঘাটগুলি "শান্তিময়ী"। বর্তমান শতাব্দীর শেষ দশকে ধূলিধূসর মথুরা-বৃন্দাবনের ক্ষেত্রে এই কাব্যিক বর্ননা প্রযোজ্য নয়। এলাহাবাদের দাবাগঞ্জ স্বর্ণকুমারীর বর্ণনায় ঠিক যেন ছবির মত। মানুষের ভীড, ধূলার প্রকোপ, নগরপিতা তথা নেতাবাবুদের কৃপায় উত্তর ভারতের কোনও প্রধান সহরই আর "ছবির মতো" নেই। সময় যে বদলে গিয়েছে তাব কৌতুকজনক নিদর্শনও এই কাহিনীগুলিতে পাই। মাদ্রাজগামী জাহাজে বৈদ্যুতিক আলো দেখে স্বর্ণকুমারীর উৎসাহ প্রণিধানযোগ্য: "ধূম নাই, গন্ধ নাই, জ্বালাইতে নিভাইতে কোন জ্বালা যন্ত্রণা নাই, দীপসংলগ্ন ক্ষুদ্র কলদণ্ড উঠাও, দপ করিয়া সহসা জ্বলিয়া উঠিবে, নামাও, তৎক্ষণাৎ নিভিয়া যাইবে। সেদিন ক্যাবিনে আসিয়া কতবার যে আমি বিদ্যুৎ প্রদীপের কানটা উপর নীচে নাড়া দিয়াছিলাম তাহার ঠিক নাই।" লেখাটির প্রকাশকাল ১৮৯৫ সন। "কলিকাতাব ঘরে ঘরে পথে পথে" বিদ্যুতালোক পৌঁছতে তখনও অনেক দেরী।

উনিশ শতকের মনোভঙ্গীর নানা নিদর্শন এই রচনাগুলিতে ছড়ান আছে। শাসকশ্রেণী হিসাবে ইংরাজ তখনও ভয়ের জিনিষ। সাহেবী পোশাকে দ্বিজেন্দ্রনাথ তাই বোনের কামরার দরজায় খাড়া, যাতে অবাঞ্ছিত দেশবাসী হঠাৎ ঢুকে শান্তিভঙ্গ না করে। আর সাহেব-বিতাড়নের ব্যবস্থা আলাদা। অন্নব্যঞ্জনপূর্ণ হাঁড়িকুড়ি দরজার সামনে রাখা। সে দৃশ্য দেখে গৌরাঙ্গতনয়ের দ্রুত পশ্চাদপসরণ। সাহেব-বাবু সম্পর্কের বর্ণনায় পুরানো জুতা-প্রসঙ্গ এসে পড়ে। নেটিভদের জুতা পায়ে সাহেব-সন্নিধানে আসা মানা, কৃষ্ণাঙ্গ সিভিলিয়ান সেই নির্দেশ মেনে সাদা সিভিলিয়ানের ঘরে জুতা খুলতে যাচ্ছেন। সহৃদয় সাহেব বাধা দিলেন, "তুমি এখন আমাদের দলের লোক, তুমি জুতা খুলিবে কেন, তোমার বাপ যখন আসিবেন জুতা খুলিয়া আসিবেন।" বর্ণগত জাতিভেদ সে যুগে হিন্দুর ব্রাহ্মণ চণ্ডালে ভেদের মতই প্রচণ্ড শক্তিমান। বর্মাগামী জাহাজে দুই ফিরিঙ্গি রমণী শ্বেতাঙ্গদের টেবিলে বিপর্যস্ত বোধ করে সরলার নিরামিষভোজী টেবিলে আশ্রয়প্রার্থনা করেন।

এই জাতিভেদের অন্য রূপ বাঙালীর চেতনায়ও মুখর হয়েছিল। প্রসন্নময়ী বাঙালির ক্ষুরধার বুদ্ধি বিষয়ে নিঃসন্দেহ। কিন্তু স্বাস্থ্যটা খারাপ। তাই উত্তর ভারতীয় গোলগাল গৌরাঙ্গ শিশুদের বাঙালির ঘরে দত্তক নিয়ে বাঙালি কন্যাদের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তিনি সুপ্রজননের পরামর্শ দিয়েছেন। হিন্দুস্থানীরা সমাজ ও রাজনৈতিক চেতনায় বাঙালীর চেয়ে অনেক পেছনে—এ বিষয়ে স্বর্ণকুমারীর সন্দেহ নেই। অবশ্যি উত্তর ভারতের শিক্ষিত পরিবারের মেয়েদের দেখে তিনি মুগ্ধ—কিছুটা বিস্মিতও সন্দেহ নেই।

এই সংকলনের একটি রচনার সুর আলাদা। শরৎরেণু পারস্যে বিদেশী পেট্রোল কোম্পানীর বাঙালি কর্মচারীর স্ত্রী, মনে হয় স্বামীটি কেরাণী। তাঁরা জাহাজে নীচু শ্রেণীর যাত্রী। পারস্য পৌঁছেও তাঁদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ঠিক আরামদায়ক না। তাঁর বৃত্তান্ত সমুদ্রযাত্রায় দরিদ্র

যাত্রীর লাঞ্ছনারই কাহিনী। তাতে আনন্দের ছিটেফোঁটাও নেই। এই মানুষটি সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য জানতে ইচ্ছে করে। এলিট-গোষ্ঠির বাইরের একটি নারীর অভিজ্ঞতা অন্তর্ভুক্ত করে সম্পাদকেরা এই সংকলনের মূল্য বাড়িয়েছেন।

আশা করি বাঙালি পাঠক-পাঠিকা সংকলনটি সাদরে গ্রহণ করবেন।

কথামুখ

বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণবৃত্তান্তের সংখ্যা খুব একটা কম নয়। জলধর সেনের *হিমালয়*, রামকুমার বিদ্যারত্ন—পরবর্তী জীবনে যিনি স্বামী রামানন্দ ভারতী নামে সুপরিচিত হন, তাঁর *উদাসীন সত্যশ্রবার আসাম-ভ্রমণ* এবং *হিমারণ্য* বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের গোড়াপত্তন করেছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের *আত্মজীবনী*র মধ্যেও মথুরা, বৃন্দাবন, সিমলা ও ডালহৌসি ভ্রমণের সরস বর্ণনা পাওয়া যায়। সুতরাং, উনিশ শতক থেকেই ভ্রমণ বাঙালি মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের জীবনচর্যার মধ্যে প্রবেশ করে। সে-যুগের যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, আর্থিক সংকট অথবা সামগ্রিকভাবে বিরাটকায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাব, এর কোনোটাই বড় বাধা হয়ে উঠতে পারেনি। তাই, ধর্মের টানে, শান্তির খোঁজে অথবা নিছক দেশ-দেখার আগ্রহে মধ্যবিত্ত বাঙালি ঘর ছেড়েছিল। ব্রিটিশ উপনিবেশের ভালোমন্দ নিয়ে যতই বিতর্কের ঝড় উঠুক, এ-কথা অস্বীকার করা যায় না যে দেশভ্রমণের উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে ওঠে এই যুগেই। আর সেইজন্যেই পুরুষের সঙ্গী হয়ে বাড়ির মেয়েরাও বেরিয়ে পড়েন দেশভ্রমণে।

এই সংকলনের সবগুলো লেখাই যে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে তা হল এগুলো বাঙালি মধ্যবিত্ত নারীর চোখে দেখা বহির্জগৎ। যে পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে, চিরায়ত নিয়মকানুনের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে, প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যেই জীবনের সার্থকতার অন্বেষণে কাটিয়ে দিয়েছিল একাধিক প্রজন্মের বঙ্গনারী, উনিশ শতকের আধুনিকায়নের ধাক্কায় তাদের জীবনের অর্গলবদ্ধ দরজাগুলো একে একে খুলে যেতে থাকে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারে মুক্ত হাওয়ার চলাচল শুরু হয় একটু আগে। কিন্তু যে দেবেন্দ্রনাথ সিমলা পাহাড়ের সৌন্দর্যে মুগ্ধ ছিলেন, তিনি তাঁর সঙ্গী হিসাবে পরিবারের কোনো মহিলাকে সৌন্দর্য আস্বাদনের সুযোগ করে দেননি। কিন্তু ঠাকুর পরিবারের "অন্তঃপুরে যে-কয়েদখানার মত নবাবী বন্দোবস্ত ছিল তা আমার আদবে ভাল লাগিত না।" লিখেছিলেন দেবেন্দ্র-পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। হয়ত সেইজন্যেই আমরা পাই জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে—উনিশ শতকের আধুনিক বাঙালি নারীর এক মডেল হয়ে ওঠেন তিনি।

দেবেন্দ্র-কন্যা স্বর্ণকুমারী ছিলেন ঠাকুর পরিবারের সেই যুগের অপর আধুনিকা যিনি তাঁর "প্রয়াগ যাত্রা" রচনায় প্রথমেই বাঙালি আবেগকে ব্যঙ্গ করার সাহস দেখিয়েছেন— "বাঙালী ঘরের মেয়ে, ছেলেবেলাতেই ইঁচড়ে পাকিয়াছি, প্রথম ভাগ শেষ না হইতে দু'চারিখানা ছন্দোপুস্তকের পাতা উল্টাইয়া ছেলেবেলা হইতেই মনে একটা বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে অশ্রুজল নহিলে বিদায়ের মাহাত্ম্য থাকে না।"

রেলগাড়ির সেই আদিযুগে, সাহেবমেমদের এই বাহনে সাধারণ ভারতীয়দের চড়বার অধিকার প্রায় ছিলই না বললে চলে। ইউরোপীয় যাত্রী ও তাদের ভারতীয় সেবকরা এবং

অভিজাত ভাবতীয় পরিবারগুলিই প্রধানত রেলযাত্রার আনন্দ উপভোগ করত। স্বর্ণকুমারীর সঙ্গী তাঁর "সক্রেটিস দাদা" (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) ছিলেন প্রকৃতই মুশকিল আসান। কেননা— "ইনি আমাদের সঙ্গে করিয়া প্রয়াগ পৌঁছাইয়া দিতে সম্মত না হইলে এ যাত্রা আমাদের ভাগ্যে অযাত্রা বই আর কিছু ঘটিত কিনা সন্দেহ।" লিখেছেন স্বর্ণকুমারী। হাওড়া থেকে এলাহাবাদ, সে-যুগে এই পথ ছিল সুদীর্ঘ। কয়লার ধোঁয়া আর গরম থেকে ট্রেনের অভিজাত যাত্রীদেরও নিস্তার ছিল না, কিন্তু স্বর্ণকুমারী ও তাঁর পুত্রকন্যাকে পথের অন্যান্য ঝামেলা থেকে রক্ষা করেন সেই সক্রেটিস দাদা। ১২৯৩ বঙ্গাব্দে *ভারতী*-তে প্রকাশিত স্বর্ণকুমারীর "প্রয়াগ যাত্রা" সংক্ষিপ্ত কিন্তু তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে ভাস্বর এক ভ্রমণবৃত্তান্ত।

লেখিকার অপর রচনা "সমুদ্রে"। এখানেও স্বর্ণকুমারীর বাংলা গদ্যরচনার পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। কলকাতা থেকে মাদ্রাজ অবধি এক উপভোগ্য সমুদ্রযাত্রার বর্ণনাটি প্রকাশিত হয় ১৩০২ সালে *ভারতী* পত্রিকায়।

প্রসন্নময়ী দেবীর "আৰ্য্যাবর্ত্তে বঙ্গমহিলা" (প্রথম ভাগ) পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় পৌষ, ১২৯৫ সালে। নাতিদীর্ঘ এই স্মৃতিচারণে উত্তর ভারতের বিভিন্ন সুপরিচিত শহরগুলির বর্ণনা আছে। লেখিকার মনোগত ইচ্ছা থাকলেও এর দ্বিতীয় প্রস্তাব কোনোদিনই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। শুধুমাত্র একাধিক সাময়িকপত্রে অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় এবং সম্ভবত অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই এই লেখার পরিসমাপ্তি ঘটে। এই সংকলনে প্রসন্নময়ীর ভ্রমণবৃত্তান্তের দু'একটি বাদ দিয়ে পুরোটাই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রীভূত হওয়ায় লেখিকার ভ্রমণের পূর্ণ চিত্রটি পাওয়া যায়।

আৰ্য্যাবর্ত্তে বঙ্গমহিলা বইটি প্রসন্নময়ী উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর কন্যা প্রিয়ম্বদাকে। উপহারপত্রে তিনি প্রাচীন ভারতের হিন্দু ঐতিহ্য এবং সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতি হিন্দুনারীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে তাঁর কন্যাকে উপদেশ দিয়েছেন। প্রসন্নময়ী বলছেন— "প্রাতঃস্মরণীয়া আৰ্য্যনারীগণ যে দেশেব মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন সেই দেশে তুমিও জন্মিয়াছ এইটী সতত স্মরণ রাখিয়া তাঁহাদিগের উচ্চতম আদর্শে এবং তাঁহাদেরই পদানুসরণে অদ্যকার বিজাতি-সভ্যতা-বিড়ম্বিত না হইয়া যথার্থ হিন্দু মহিলার উপকরণে নিজের সুকুমার হৃদয় ও কিশোর চরিত্র সুগঠিত কর।" ভ্রমণকাহিনীর বিজ্ঞাপন-পত্রে লেখিকা সুন্দরভাবে তাঁর লেখার যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন তা থেকে তাঁর নিজস্বতার পরিচয় পাওয়া যায়। অন্তঃপুরবদ্ধা নারী বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত হতেন তীর্থযাত্রার কালে। প্রসন্নময়ী তাঁদেরই দলের একজন হয়ে দেখেছিলেন "আৰ্য্যাবৰ্ত্ত"-এর নানা লোকালয়। বাঙালি মধ্যবিত্ত নারীর জীবনে এই বৈচিত্র্যের স্বাদ ছিল সে-যুগে এক বিরাট ঘটনা। প্রসন্নময়ী যথার্থই মনে করতেন বাইরের পৃথিবীকে দেখার ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী দুজনের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকতেই পারে। কেননা শিকল-পরা নারীর কাছে বাইরের পৃথিবী অনেক দূরের বস্তু। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর সুযোগ হয়েছিল, তাই "বঙ্গনারীর চক্ষে ও হৃদয়ে এই ইতিহাসময় আৰ্য্যাবর্ত্তের ভিন্ন ভিন্ন স্থান কিরূপে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল তাহা কেহ কেহ জানিতে ইচ্ছা করিতে পারেন এবং তাই আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে আমি যাহা দেখিয়াছি তাহা বর্ণনা ও প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম।"

প্রসন্নময়ীর পর্যবেক্ষণ শক্তি পাঠককে নাড়া দেয়। যুগে যুগে মানুষ তাজমহলের সৌন্দর্যে

মুগ্ধ, কিন্তু লেখিকা সেই সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েও একথা লিখতে পারেন— "প্রণয়ের স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার জন্য কোন পার্থিব সমাধির যে প্রয়োজন আছে, আমি তাহা বুঝিতে পারি না। . . . তাজমহল স্বরূপ অলৌকিক সমাধিমন্দির দেখিয়াও তাহার অভ্যন্তরে চির-নিদ্রিতা সাজাহান প্রেয়সী মহিষীকে 'নারীকুলে ভাগ্যবতী' কিম্বা 'পতি সোহাগিনী' বলিয়া আমি মনে করি না।" এই ব্যতিক্রমী চিন্তা আমাদের স্পর্শ করে। ভালোকে ভালো, মন্দকে মন্দ বলতে দ্বিধা করেননি তিনি। সমগ্র ভ্রমণবৃত্তান্তটিতে আমরা এক আধুনিকা নারীকেই পাই যিনি নারীর দৃষ্টিতেই দেখেছিলেন বিশাল, পরিব্যাপ্ত আর্য্যাবর্ত্তকে।

সংকলনের চতুর্থ রচনাটি প্রসন্নময়ী দেবীর কন্যা প্রিয়ম্বদা দেবীর। তাঁর "বারাণসী" ভ্রমণ প্রকাশিত হয় *ভারতী* পত্রিকায় ১৩০৭ সালে। বাঙালি গৃহবধূর ভ্রমণের ক্ষেত্রে প্রথম বিস্ময় হাওড়া স্টেশন। প্রিয়ম্বদার সামনে নিভৃত গৃহকোণের পরিবর্তে কলরবমুখর ব্যস্ত মানুষের প্রবাহ। রেলগাড়ির জানালা দিয়ে দ্রুত অপস্রিয়মান প্রকৃতি, মোগলসরাই পেরিয়ে গাড়ি বদল করে হিন্দুতীর্থ কাশী। বলা হয়, বরুণা ও অসি এই দুই নদীকে নিয়ে বারাণসী। প্রিয়ম্বদা যখন দেখেছিলেন তখন গঙ্গা-তীরবর্তী বারাণসী exotic ভারতীয় জীবনের পরিচয় বহন করত। সেই সময় কাশী ছিল বাংলার বাইরে বাঙালিদের সবচেয়ে পরিচিত শহর, বাঙালি বিধবাদের উপনিবেশ। শিবমন্দির, ঘাট, শ্মশান, রাজপ্রাসাদ, সাধুসন্ত—এই নিয়ে গড়ে উঠেছিল কাশী। লেখিকা বারাণসীর জনস্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন এক হিন্দু সভ্যতাকে, আবার কাশীর অদূরে সারনাথে বৌদ্ধমঠের ধ্বংসাবশেষ তাঁকে আকর্ষণ করেছিল।

যাঁর সম্পর্কে বিশেষ কোনো তথ্য আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি—সেই শরৎরেণু দেবীর সুদীর্ঘ জলযাত্রা (বোম্বাই বন্দর থেকে আরব সাগর ও পারস্য উপসাগর হয়ে পারস্যের আহ্‌ভাজ শহর) *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় ১৩২৩ বঙ্গাব্দে দুই কিস্তিতে (আষাঢ় ও কার্তিক) প্রকাশিত হয়েছিল। শরৎরেণু অথবা তাঁর স্বামীর জন্য "এস্ এস্ চাকলা" জাহাজে কোনো কেবিনের বন্দোবস্ত ছিল না। শেষ পর্যন্ত যখন কেবিনের ব্যবস্থা হল তখন তিনি সমুদ্রপীড়ায় কাতর। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে স্বর্ণকুমারী অথবা সরলাদেবীর মতো সুবন্দোবস্ত শরৎরেণুর জন্য ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কোনো অভিযোগ করেননি। তাঁর শারীরিক অসুস্থতা যে অন্যদের বিব্রত করেছিল, স্বামী-সহ জাহাজের একাধিক ব্যক্তির সাহায্য যে তিনি পেয়েছিলেন, তার জন্য এক অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত হয়েছে। স্বল্প-পরিসরে শরৎরেণু তাঁর যে অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাতে সাধারণ মানুষের বর্ণনাই প্রাধান্য পেয়েছে। বঙ্গমহিলার পরিচিত জগৎ সমুদ্র-ভ্রমণের দ্বারা যে বহুদূর প্রসারিত হয়েছিল শরৎরেণুর কাহিনী সেই সাক্ষ্যই বহন করে।

বহুল-পঠিত "জীবনের ঝরাপাতা"র লেখিকা সরলাদেবী চৌধুরাণী অনেক অর্থেই বিদ্রোহিণী। ঠাকুর পরিবারের ঐতিহ্য ভেঙে বেরিয়ে এসেছিলেন তিনি। স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার সংস্পর্শে সমাজসেবা ও রাজনীতিকে গ্রহণ করেছিলেন তিনি অনেক সমালোচনা উপেক্ষা করে। আগ্রহ ছিল তাঁর উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে। বিজয়াদশমীর দিন তাঁর উদ্যোগেই অনুষ্ঠিত হতো "বীরাষ্টমী ব্রত"। এহেন বীরাঙ্গনার ভ্রমণ এবং সেটা যদি ভারতবর্ষের বাইরে ব্রহ্মদেশে জলপথে হয় তবে তা বহু অর্থেই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

মাতা স্বর্ণকুমারীও সমুদ্রযাত্রার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। সে যাত্রা ছিল "ডুনেরা"

জাহাজ-যোগে কলকাতা থেকে মাদ্রাজ। কন্যা সরলা ভারতবর্ষের সীমানা পেরিয়ে ব্রহ্মদেশে পৌঁছেছিলেন এক প্রজন্ম পরে। সরলাদেবীর বর্মাযাত্রা নিছক প্রমোদ ভ্রমণ ছিল না। ভারতীয় রাজনীতিতে ততদিনে তিনি স্বনামধন্যা—তাঁর ব্রহ্মদেশ-যাত্রা ঘটেছিল বর্ম্মা প্রাদেশিক "হিন্দু কনফারেন্স"-এর আমন্ত্রিত প্রতিনিধি হিসেবে। তবে মাতা ও কন্যা সমুদ্রযাত্রায় দুজনেই আভিজাত্য বজায় রেখেছিলেন ফার্স্ট ক্লাশ কেবিনের যাত্রী হয়ে। হয়ত এই কারণেই দুজনের লেখায় শ্রেণীবিভাজিত জাহাজী-জীবনের খুঁটিনাটি ঘুরেফিরে এসেছে, বিশেষ করে উচ্চশ্রেণীর যাত্রীদের চলাফেরা, খানাপিনা, সমুদ্রব্যাধি ইত্যাদির বিবরণে। শরৎচন্দ্রের *শ্রীকান্ত* যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই বুঝবেন উচ্চবিত্তের বর্মাযাত্রার সঙ্গে সাধারণের সমুদ্রযাত্রার তফাৎটা কোথায়। রেঙ্গুণ বন্দরে সরলাদেবী "মাল্যভারে অবনত"। বিদেশে বঙ্গনারীর এই সম্মান, এই শতকের গোড়ার দিকে আমাদেরও গর্বিত করে।

সংকলিত রচনাগুলোর সবকটিই নারীর চোখে দেখা ভূখণ্ড—স্বদেশে ও বিদেশে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে গত শতকের শেষ অথবা বর্তমান শতক-সূচনায় ক'জন ভদ্রমহিলার এই ভ্রমণের সৌভাগ্য হয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে উনিশ শতকে এই সংখ্যা ছিল যথেষ্ট কম। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, কৃষ্ণভাবিনী দাস, স্বর্ণকুমারী দেবীরা সেই যুগের ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। কিন্তু আধুনিকায়নের স্রোত থেমে থাকেনি, যার পূর্ণ প্রতিভূ সরলাদেবী চৌধুরাণী। বঙ্গমহিলার স্বাধীন অস্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে তাঁর মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছিল—এ-কথা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না।

ভ্রমণ মানুষকে আনন্দ দেয়। তৎকালীন ভদ্রমহিলারা পথচলার সেই আনন্দ সমান-অংশে ভাগ করে নিয়েছিলেন তাঁদের "পরিচিত" ও "পরিবারস্থ" পুরুষদের সঙ্গে।

শতাব্দী-সূচনায় বঙ্গমহিলার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত গ্রন্থাকারে সম্ভবত এই প্রথম সংকলিত হল। কলেবর আরো বাড়ানো যেত, কিন্তু মুদ্রণের সময়ে স্থান-সংকুলানের প্রশ্ন ওঠায় বেশ কিছু লেখা বাদ দিতে হল। যাঁরা বাদ পড়লেন তাঁদের মধ্যে আছেন গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, নিস্তারিণী দেবী, অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্ত, শতদলবাসিনী বিশ্বাস, কুমুদিনী খাস্তগির এবং বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ। ভবিষ্যতে এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণের পরিকল্পনা হলে অসামান্য এই লেখাগুলো বাদ যাবে না।

সব-শেষের টীকা অংশ সম্পর্কে এটাই বলা যায় যে আরেকটু মনোযোগী ও অধ্যবসায়ী হলে ওই অংশটি বাড়ানো যেত—অন্তত যোগ্যতর কোনো সংকলক হয়ত তাই করতেন। আশা করব পাঠকেরা এসব ত্রুটি মার্জনা করে দেবেন।

যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আমাদের সাহায্য করেছেন তাঁরা হলেন কলকাতাস্থ সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশাল সায়েন্সেস-এর অন্তর্গত হিতেশরঞ্জন সান্যাল মেমোরিয়াল কালেকশন এবং ওই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কর্মী শ্রী অভিজিৎ ভট্টাচার্য। এঁদের আমরা সবিশেষ কৃতজ্ঞতা জানালাম।

১

প্রয়াগ যাত্রা

স্বর্ণকুমারী দেবী

কিছুদিন হইতে মনে করিয়া আছি— পূজার ছুটিতে এলাহাবাদ যাইব, কিন্তু কবে যাইব কিছুই জানি না, হঠাৎ একদিন বিকালে ঠিক হইল, কাল যাইব। পরদিন জিনিস-পত্র গোছানর বন্দবস্ত, চাকরদাসীদের ডাক হাঁক, ছেলেদের প্রাণভরা আনন্দের ছুটাছুটির গণ্ডগোলে আমি এমনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম, কাজের ভাবনায় এমনি বিব্রত হইয়া পড়িলাম—যে তার উপর অধিক কাজ করা আর আমার কিছুতেই পোষাইয়া উঠিল না। যে সকল বন্ধু বান্ধবেরা আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, সমস্ত দিন তাঁহাদের সহিত বিছানায় বসিয়া, গড়াইয়া, গল্প করিয়া, আর মিনিটের মধ্যে পাঁচ শ পঁয়তাল্লিশ বার করিয়া, আমার সময়ের অভাব, কাজের ভিড় ও ব্যস্ততার পরিমাণটা তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম করিতে প্রয়াস পাইয়া বেলাটা একরকমে গুজর করিয়া দিলাম। যাই হোক, আমার জন্য যে কাজকর্ম্ম পড়িয়া রহিল তাহা নহে, আমি ছাড়াও গোছান গাছান সব একরকমে হইয়া গেল। ঐ রকম সকল কাজই যদি, মনে মনে ব্যস্ত হইয়া, আর পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া নির্ব্বিবাদে চালান যাইত—ত বড় সুবিধা হইত, তাহা হইলে খাটে শুইয়া শুইয়া আমি প্রয়াগ যাত্রাও করিতে পারিতাম—কিন্তু একেবারে গঙ্গাযাত্রার বন্দবস্তে রাজি না হইলে নাকি খাট তুলিবার কোন লোক মেলে না, কাজেই বিকাল বেলাটা কষ্টেশ্রষ্ঠে উঠিয়া দু একটা ডাক হাঁকে আর দু একবার এঘর ওঘর পায়চালির ধমকে, যাইবার শেষ বন্দবস্তটা সারিয়া ফেলিয়া বন্ধুবান্ধবদিগকে লইয়া বিদায় পর্ব্ব ফাঁদিয়া বসিলাম। বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে, ছেলেবেলাতেই ইঁচড়ে পাকিয়াছি, প্রথম ভাগ শেষ না হইতে দু'চারিখানা ছন্দোপুস্তকের পাতা উল্টাইয়া ছেলেবেলা হইতেই মনে একটা বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে অশ্রুজল নহিলে বিদায়ের মাহাত্ম্য থাকে না, সুতরাং বিস্তর আশা করিয়া, গম্ভীর মুখে—"জন্মের মতো বিদায়," "এই দেখা শেষ দেখা" ইত্যাদি নানা কথা কহিতে আরম্ভ করিয়া দিলাম। দুঃখের কথা বলিব কি, হিতে বিপরীত হইয়া উঠিল, ইতিপূর্ব্বে যাহার চোখে জল 'পড় পড়' হইয়া উঠিয়াছিল—আমার কথায় তাহা পর্য্যন্ত মিলাইয়া গেল। আমার সমস্ত আশা ভরসা লোপ পাইল। আমি আর একরকম ভাবিতাম—আমি জানিতাম, বাঙালীর হৃদয়ে আর্য্যশোণিতের অভাব হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার স্থলে বাঙ্গালিনীর ধমনীতে ধমনীতে আর্য্যা-অশ্রু এত বাড়িয়া উঠিয়াছে — যে এখন ফুলের ঘায়ে তাহা যেমন উথলিয়া উঠে, আগে কঠিন অস্ত্র-স্পর্শেও তেমন হইত না। অনেক ভুক্তভোগী লোক এরূপও বলিয়া থাকেন যে একবার কেহ ইহার জোর-বেগ তোড়ের মুখে পড়িলে হাড়ে হাড়ে সেই লোনা-জলে

মজিয়া এমন চাটনি বণিয়া যায় যে তখন আব তাহাতে স্বাতন্ত্র্য বলিয়া কোন পদার্থ থাকে না। সুতরাং সমুদ্রের মধ্যে বসাইয়া বিধাতা আমার অদৃষ্টে এক ফোঁটা জল মিলাইলেন না, কাঁদাইব কি--সেই দুঃখ ভাবিয়া আপনিই আজ কাঁদিয়া মরিতেছি,--- (সে দিন জানিতাম না যে জাতীয় মানটা শেষে আমা হইতেই আজ বজায় থাকিয়া যাইবে) কিন্তু সে দিন আর এ কথাটা ঠিক এমন করিয়া মনে আসে নাই, সে দিন তাঁহারাও হাসিতে হাসিতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, আমিও আমার ভবিষ্যতের যষ্টি-স্বরূপ-স্বরূপিণী পুত্র কন্যা দুইটিকে লইয়া হাসিতে হাসিতে ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিলাম। আন্দাজ রাত ৯টার সময় আমাদের গাড়ীখানা হাবড়া ষ্টেসনের সম্মুখে আসিয়া লাগিল, কি একটা ভীষণ অট্টগোলের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম, যাত্রীদিগের দৌড়াদৌড়ি, মুটেদের ছুটাছুটি--জিনিসপত্র বোঝাই হাতগাড়ীর ঠেলাঠেলি, লোকজনের চীৎকার কোলাহল অট্টরবের একটা অকুল পাথারের মধ্যে যেন পড়িয়া গেলাম। সঙ্গে দু একজন যাঁহারা আসিয়াছিলেন---তাঁহারা গাড়ি হইতে নামিয়া জিনিসপত্র নামাইতে লাগিলেন, আমি ভাবিতে লাগিলাম—প্ল্যাটফর্ম্মরূপ ভবসাগর পার হইয়া কি করিয়া প্রাণে প্রাণে তিনটি নিরীহ প্রাণী রেলগাড়ীর কামরায় গিয়া উঠি , ভাবনাটা এমন বলবৎ হইয়া দাঁড়াইল যে শেষ উইলের বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত মনের মধ্যে আসিয়া গেল। এমন সময় একজন সাহেবকে আমাদের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিলাম,—কিন্তু সাহেবটি নিকটে আসিবামাত্র তাহার হ্যাটকোটের খোলষের মধ্য হইতে সক্রেটিস দাদার পরিচিত বাঙ্গালী মুখটি, এবং সে মুখের নীরব আস্ফালনটা পর্য্যন্ত যেই চোখে পড়িয়া গেল—অমনি মনে মনে অনেকটা ভরষার উদয় হইল, তাহার পর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বিঘ্নে যখন গাড়ীর কামরায় গিয়া উঠিয়া বসিলাম—তখন মনে হইল—আমি ত আর্য্য নারী ; একবার ছাড়া একশবার ঐ প্ল্যাটফর্ম্মটা প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে পারি। তখন আগেকার সঙ্কোচটা মনে করিয়া আর হাসিয়া বাঁচি না।

এইখানে আপাততঃ অন্য কথা রাখিয়া সক্রেটিস দাদার একটু পরিচয় দিয়া লই,--কেননা ইহাঁকে ছাড়িয়া এখানে আর যাহা বলিতে যাইব---তাহা অন্য সব হইতে পারে, কেবল যাত্রার কথা হইবে না,— ইনি আমাদের সঙ্গে করিয়া প্রয়াগ পৌঁছাইয়া দিতে সম্মত না হইলে এ যাত্রা আমাদের ভাগ্যে অযাত্রা বই আর কিছু ঘটিত কিনা সন্দেহ।

এখন পরিচয়টা আরম্ভ করি কোথা হইতে? নামেই লোকের প্রধান পরিচয়, সেটা ত আগেই বলিয়া সারিয়াছি। তবে একটা বিষয় চুক করিয়াছি এই, ইচ্ছা ছিল—নামটা বলিবার আগে নামের সৃষ্টিকর্ত্তার পরিচয়টা আগে দিয়া লইব—সেইটিই ভুল করিয়া বসিয়াছি। কেন-না—নামটি ভারত ছাড়াই হউক—আর স্বদেশ বৎসলতার অভাব প্রভৃতি অন্য যে দোষই প্রকাশ করুক—নামধারীর পক্ষে যে ইহা কি রূপ উপযুক্ত হইয়াছে তাহা যাঁহারা তাঁহাকে জানেন—তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। তাই বলিতেছিলাম—সে প্রশংসাটা শুনিবার আগে বলিয়া রাখিলেই হইত—নামটি অন্নপ্রাশনের নহে—আমার দেওয়া। যাক্, তাহাতে বড় ক্ষতি দেখিতেছি না, জ্ঞানী ব্যক্তিরা আত্মপ্রশংসা হেয় জ্ঞান করেন।

এখন বাজে কথা ছাড়িয়া,—সত্য সত্যই ইহাঁর মত নিঃক্রোধ প্রসন্নচিত্ত মানুষ আমি

আর কখনো দেখি নাই, আমি কেন,—কেহ মারিতে কাটিতে আসিলেও হাসিমুখে হাত ধরা ছাড়া কেহ ইহাঁকে রাগ করিতে দেখে নাই। আমি কখনো ইহাঁর ক্রুদ্ধ মুখ কল্পনাতে পর্য্যন্ত আনিতে পারিলাম না—তাই আমি ইহাঁকে বাঙ্গলার সক্রেটিস বলি। কিন্তু এই এক নামেই ইহাঁর পরিচয় শেষ হয় না, ইহাঁর এমন অনেক নাম আছে। আর একজন ইহাঁর নাম রাখিয়াছেন—ব্যস্তবাগীশ। কেননা ইনি যেখানে যান—গিয়াই ঘড়ি খুলিয়া যাই যাই আরম্ভ করেন—আর অগাধ কাজের হিসাব খুলিয়া রেলগাড়ীর সহিত নিজের জীবনের তুলনা করিতে বসেন। সময়ের মূল্য তাঁহার মত আর কেহ বোঝে না—তাই তিনি একবাব যেখানে গিয়া বসেন—সেইখানেই দিনটা কাটাইয়া আসেন।

তাঁহার ব্যস্ততা সম্বন্ধে যাহা বলিলাম—তাঁহার কাজ সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। তিনি কাজ করেন অনেক, অথচ সচরাচর যাহাকে কাজের লোক বলে তিনি তাহা নহেন। কেননা পরের জন্য মাথা ব্যথা করিতে তিনি যত সময় দেন নিজের জন্য তাহার সিকি দিতে পারিলে পৃথিবীতে একটা নাম রাখিয়া যাইতে পারিতেন। কাহারো ব্যামো হইয়াছে দেখ—সক্রেটিস দাদা সেইখানেই পড়িয়া আছেন— কাহারো চাকরী নাই—তাঁহাকে আসিয়া ধরিয়াছে—তিনি এ-সাহেবের কাছে ও-সাহেবের কাছে তাহার উমেদাবীতে ঘুরিতেছেন, কাহারো মকদ্দমা হয় না—তাঁহাকে জানাইয়াছে—তিনি না খাইয়া দাইয়া তাহার তদবিরে বেড়াইতেছেন। কোন একটা মিটিং করিতে হইবে—কিম্বা কাহাকেও সম্মান দিতে হইবে, সে ভার সক্রেটিস দাদার উপর ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাক, তিনি রাতকে দিন করিয়া তাহা সম্পন্ন করিবেন। ইহা ছাড়া—তাঁহার হাতে নিত্য নিয়মিত সাধারণের কাজ—হুজুকে ব্যাপারের ভারের ত অভাব নাই। সুতরাং ১৬ আনার মধ্যে তাঁহার জীবনের ১৫ আনা তিন পয়সা—পরের দখলে। কেবল তিনি নহেন—তাঁহার জিনিষপত্র বাড়ি ঘরও তাঁহার মত সাধারণের অবৈতনিক কর্ম্মচারী। তিনি নিজে যেমন সদাই পরের কাজে ঘুরিয়া বেড়ান, তাঁহার গাড়ী ঘোড়াগুলিও সেইরূপ অপরকে বহন করিয়াই প্রায় ঘোরে। তাঁহার যে জিনিসে অন্যের একবার চোখ পড়ে—তাহা আর তাঁহার নিজের থাকে না—আর একটি মজা এই—তাঁহার জিনিসপত্র মুক্তহস্তে গ্রহণ করিয়া— সকলে তাঁহাকেই বাধিত করে, এ পর্য্যন্ত এজন্য তাঁহার নিকট কেহ বাধিত জ্ঞান করে নাই। এমন কি—তাঁহার নিজের বাড়ী-ঘরও তাঁহার কি না বলিয়া এক এক সময়ে সন্দেহ জন্মে, কেননা সেখানে অন্যদের হুকুম, ইচ্ছা যত দূর চলে—তাঁহার নিজের হুকুম— নিজের ইচ্ছা সেরূপ চলিতে প্রায় দেখা যায় না।

ইহাঁর সম্বন্ধে এমন আরো অনেক কথা বলা যাইতে পারে, কিন্তু আপাততঃ এইখানেই থামা যাউক, তবে এইমাত্র এখানে বলিয়া লই যে—যতটুকু উপরে বলিলাম—তাহার একটুও বাড়ান নহে, সকলি খাঁটি সত্য কথা।

ইহাঁর কাজের লোক বলিয়া একটা নাম আছে বটে কিন্তু কেহ কেহ ইহাঁকে বলে হুজুকে। আমিও তাহাই বলি—এরূপ লোককে কাজের লোক বলিলে কথাটার অর্থই যে লোপ পায়। কিন্তু এজন্য যে তিনি বড় একটা অসন্তুষ্ট তাহা নহেন, নিজেই তিনি দিনের মধ্যে দশবার

করিয়া আপনাকে হুজুকে বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এ নামের সার্থকতা আমরা এবার বিলক্ষণ দেখিতে পাইলাম। আমার অপরাধের মধ্যে যাত্রার আগের দিন আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম—"এবার পূজার ভিড়ের সময় যাইতেছি—আমরা চারজন হইলেও এ সময় এবার অন্য লোকে গাড়ীতে উঠিতে পারে—এবার কি রিজার্ভ করিতে হইবে"— তিনি ত শুনিয়া খড়গহস্ত, — বলিয়া বসিলেন—"আমি থাকিতে গাড়ীতে অন্য লোক উঠিবে—বল না কেন আমি বাঁদর।" আমি ভাবিলাম—"সর্ব্বশুদ্ধ বাঁদর না হইতে হইলেই বাঁচি।" কিন্তু ষ্টেসনে আসিয়া দেখিলাম কথাটা ওজন না করিয়া তিনি বলেন নাই। আমরা আসিবার আগেই তিনি ত ষ্টেসনে আসিয়াছিলেন,— এখানে আসিয়া ষ্টেসন মাষ্টারের সঙ্গে আপ্যায়িত করিয়া লইয়া আগে হইতেই কাজ অনেকটা গোছাইয়া রাখিয়াছিলেন,— আমরা আসিবামাত্র তাড়াতাড়ি গাড়ীর একটা কামরায় জিনিসপত্র বোঝাই করিয়া আমাদের সঙ্গে—আমাদের যাঁহারা পৌঁছাইয়া দিতে আসিয়াছিলেন—তাহাদের শুদ্ধ গাড়ীতে উঠাইয়া—এমন একটা হুজুক করিয়া তুলিলেন যে অন্য কেহ আর সে গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল না,—ষ্টেসন মাস্টার পর্য্যন্ত সেই আড়ম্বরে এমন কানা হইয়া গেলেন যে অন্য কাহাকেও তিনি আমাদের গাড়ীর দিকে কটাক্ষপাত পর্য্যন্ত করিতে দিলেন না। যখন প্রথম ঘন্টা পড়িল, আমাদের আর সকলে নামিয়া গেল—ষ্টেসন মাষ্টার দূরে চলিয়া গেলেন, কেবল আমরা চারজন মাত্র রহিলাম, তখন সক্রেটিস দাদাকে বলিলাম— "এই ষ্টেসনে যেন রক্ষা পাওয়া গেল—অন্য ষ্টেসনে যদি কেহ আসে ?"

তিনি লাঠিগাছা দেখাইয়া হাসিয়া বলিলেন—"আসিবে বই কি, একবার হাবড়া ছাড়াইলে হয়, তারপর আমার এই লাঠি আছে।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল—আমরা তখনকার মত হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম, সক্রেটিস দাদা জিনিসপত্র থিতাইয়া রাখিতে আরম্ভ করিলেন—আমরা তিনজনে আঁকু পাঁকু করিয়া চারিদিকের জানালাগুলি খুলিয়া দিয়া জানালার ধারে আসিয়া বসিলাম।

অন্ধকার রাত, উপরে অনন্ত আকাশে অনন্ত নক্ষত্র, নীচে আশেপাশে একটা গাঢ় অন্ধকার—আর সে অন্ধকারের বুকে মাঝে মাঝে জোনাকীদের লুকোচুরী খেলা, ইহা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না, আর যা দেখা যায়—সে কেবল চারিদিকের একটা ছুটাছুটি ভাব। আকাশে আলোকের ছোট ছোট মুখগুলি ফুটাইয়া নক্ষত্রেরা ছুটিয়া চলিয়াছে, গাড়ীর দুই পাশ দিয়া দুইটা ভীম অন্ধকার নিঃশব্দ হুঙ্কারে ছুটিয়া চলিয়াছে—ক্ষুদ্র জোনাকীর দল সে অন্ধকারের সহিত যুদ্ধ করিতে একবার কোমর বাঁধিয়া অগ্রসর হইতেছে, আবার সভয়ে হটিয়া পড়িতেছে—কাহারো বিরাম নাই,—কাহারো বিশ্রাম নাই, চারিদিকে জীবন সংগ্রাম, চারিদিকে পাল্লা পাল্লি। অথচ আমাদের মত, আমাদের এই রেলের গাড়ীর মত উহাদের ডাক হাঁক গর্জ্জন নাই, মুখে একটা পরিশ্রমের চিহ্নও নাই, নিঃস্তব্ধে নিঃশব্দে উহারা কাজ করিয়া চলিতেছে, তাই ঐ অবিশ্রান্ত গতির মধ্যেও কি সুগভীর স্তব্ধতার ভাব, শান্তির ভাব বিরাজমান।

হঠাৎ পূর্ব্বদিকে দিগন্তের সীমানার একধারে একটুখানি শাদা আলোক দেখিতে পাইলাম, ভাল করিয়া দেখিলাম চাঁদ উঠিতেছে। গাছপালার মধ্য দিয়া একটু একটু করিয়া মুক্ত নীলাকাশে

চাঁদ ফুটিয়া উঠিল—অন্ধকার গাছপালার অবয়ব ক্রমে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, গাছের তলায় তলায় ছায়া পড়িল, প্রসারিত ক্ষেত্র-প্রান্তর জ্যোৎস্নাময় হইয়া উঠিল। একটা জলাশয়ে জ্যোৎস্না পড়িয়া চিকচিক করিতে লাগিল, তাহার একপার্শ্বে চাঁদের প্রতিবিম্ব নৃত্য করিতে লাগিল—আমাদের গাড়ীর একখানা আয়নায় সেই প্রতিবিম্বিত আলোক পড়িয়া চোখ ঝলসিয়া দিবার উপক্রম করিল—আয়নাখানা আমরা নামাইয়া দিলাম। সেই জ্যোৎস্না-দীপ্ত মুক্ত সৌন্দর্য্য সংস্পর্শে আমার হৃদয় কপাট আস্তে আস্তে মুক্ত হইয়া গেল—প্রকৃতির সেই সর্ব্বগ্রাসী সৌন্দর্য্যের মধ্যে আমি আস্তে আস্তে হারাইয়া গেলাম, কত দিনের পুরাণ কথা, পুরাণ গান আমার মনের ভিতর সুখের তান তুলিল।

আর একদিন এইরূপ রেলের গাড়ীর জানালার ধারে বসিয়া কি আনন্দ হইয়াছিল, সেই কথা মনে পড়িয়া গেল, সে আজ কতদিনের কথা ? তাহার আগে আর কখনো বাড়ীর বার হই নাই—কথাটা ঠিক হইল না, দু'এক বাড়ীতে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণে যাইতাম—আর একবার দিন কতক গঙ্গার ধারের একটা বাগানে গিয়া বাস করিয়াছিলাম। সুতরাং তখন আমার কাছে ভূগোলের সীমা ঐ পর্য্যন্ত। তাহার পর যেদিন প্রথম, আমার কান্নামুক্ত চক্ষের সামনে বিশ্বের অনন্ত প্রসারিত মূর্ত্তি বিভাসিত হইল, প্রভাতের মুক্ত আকাশে যে দিন প্রথম সূর্য্য উঠিতে দেখিতে পাইলাম, উদার বিস্তৃত শ্যামল দিগন্ত পার্শ্বে মেঘের ন্যায় ছোট ছোট পাহাড় শ্রেণীর উপর যে দিন প্রথম সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইতে দেখিলাম, সে দিন কি আনন্দ ! আমার সে আহ্লাদ দেখিয়া—যিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন—তাঁহার প্রশান্ত দেবোপম মুখখানি যখন জ্বলিয়া উঠিল তখন যে আমার আনন্দ শতগুণ বেগে উথলিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি কি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন ? তিনি হয়ত ভাবিয়াছিলেন—সে কেবল বাহিরেরই সৌন্দর্য্য দেখিয়া। তাহার পর কতদিন গিয়াছে—কিন্তু এখনো তাঁহার সে মুখচ্ছবি মনে পড়িলে হৃদয়ে একটা সুখের তরঙ্গ উঠে। তারপর কতবার রেলে চড়িয়াছি, কত নূতন দৃশ্য দেখিয়াছি—কিন্তু তেমন আনন্দ আর কখনো হয় নাই।

সে দিনের প্রতি কথা আমার মনে অঙ্কিত আছে, সেদিন বৃহস্পতিবার, মা সেজন্য কতই ভাবিয়াছিলেন, একেলে ছেলেমেয়েরা কিছুই মানে না বলিয়া কত কথাই বলিয়াছিলেন—সহস্র বিপদের সম্ভাবনা দেখিলেও এখন কেহ আর তেমন করিয়া ভাবে না—তাঁহার স্নেহ তাঁহার সঙ্গেই চলিয়া গিয়াছে।

আর,—আর একজন—আপনার বোন হইতেও আপনার যে একজন—বুকফাটা চোখের জলে বুক ভিজাইয়া বিদায় দিয়াছিল—কোথায় গেল সে ? তার আপনার ঘর চিরদিনের জন্য অন্ধকার করিয়া—কোথায় কোন ঘর সে উজ্জ্বল করিতে গিয়াছে। যে কান্না সে সেদিন কাঁদিয়াছিল তখন জানিতাম না সারাজীবন সেই কান্না কাঁদাইয়া সে নিষ্ঠুরের মত চলিয়া যাইবে।

কি কথা বলিতে কি কথা আসিয়া পড়ে, স্মৃতির আলোক সহসা মেঘে ঢাকিয়া যায়—আনন্দের গীত শোকাশ্রু হইয়া পড়ে—গীত গান আপনা হইতেই থামিয়া

আসে, তবে থাক, পুরাণ গান এইখানেই ভুলিয়া যাই।

গাড়ী একটা বড় ষ্টেসনে আসিয়া লাগিল, এতক্ষণ আমরা একটা কামরায় নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিতেছিলাম, এইখানে দুইজন সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীকে গাড়ীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে দেখা গেল, ভাবিলাম, যাঃ! এইবার আমাদের রাজত্ব যায় বুঝি—আমরা তিনজনে মহা জড়সড় হইয়া পড়িলাম—কিন্তু সক্রেটিস দাদার সে ভাব দেখিলাম না, তিনি আমাদের দিকের জানালা-গুলা ফেলিয়া দিতে ইঙ্গিত করিয়া, নিষ্পরোয়াভাবে মুখ টিপিয়া একবার হাসিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি ইংরাজি কোট ও হ্যাটটা পরিয়া লইলেন—অমনি সে সোনার কাটির স্পর্শে তাঁহার বাঙ্গালীত্ব যেন ঘুচিয়া গেল, তিনি দশ হাত শরীব আরো দশ হাত ফুলাইয়া দু একটা গম্ভীর হুঙ্কার ছাড়িয়া গাড়ীর দরজায় মুখ বাহির করিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সে সাহেবি বেশভূষা আর অদ্ভুত ভাবভঙ্গী দেখিয়া ছেলেগুলা হাসিয়া আকুল হইল, আমিও যে বড় বাদ পড়িয়াছিলাম এমন বলিতে পারি না। ভদ্রলোক দুইটি কামরার মধ্যে একবার চাহিয়া না দেখিয়া মেমসাব মেমসাব করিয়া নিকট দিয়া চলিয়া গেলেন—সাহেবের আড়ম্বর দেখিয়াই আর কি তাঁহাদের চক্ষুস্থির।

ষ্টেসন ছাড়াইয়া তিনি সে পোষাক ছাড়িলেন। কিন্তু দু একটা ষ্টেসনের পর আবার তাঁহার সাজসজ্জা করিতে হইল—এবার হ্যাট কোট নয়—চাপকান টুপী পরিয়া বাঙ্গালী বাবু সাজিয়া লইলেন—কেননা এবার দুইজন ইংরাজ স্ত্রী পুরুষ এইদিকে আসিতেছিল। সক্রেটিস দাদার বিশ্বাস বাঙ্গালীর গাড়ীতে পারতপক্ষে ইংরাজ উঠিতে চাহে না। এ বিশ্বাসের মূল্য কত-দূর জানি না, তবে সে ইংরাজেরা আমাদের গাড়ীতে উঠিল না বটে, জেনানা জেনানা করিয়া অন্য কামরা দেখিতে চলিয়া গেল। ইহার পর সমস্ত রাত আর কেহ আমাদের গাড়ীর দিকে আসে নাই, কিন্তু তাই বলিয়া যে সক্রেটিস দাদার অশোয়াস্তি কিছু কমিয়াছিল তাহা নহে, পরদিন শুনিলাম তিনি প্রায় সারারাত ধরিয়া জাগিয়া পাহারায় ছিলেন—শেষরাতে শুইয়া পড়িয়াছেন।

আমরা আর সকলেই সকাল সকাল শুইয়া পড়িয়াছিলাম, আর একেবারে সকাল হইলে উঠিলাম। মাঝের সময়টা যে একেবারে এক ঘুমে কাটিয়া গিয়াছিল এমন বলিতে পারি না। প্রথমতঃ, গাড়ীর ঘুমকে কিছু আর ঘুম বলা যায় না। রেলগাড়ীর ঘড়ঘড়ানীর অবিশ্রান্ত সমতান শব্দে মাথার মধ্যে ভাবনাগুলা স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়, স্বপ্নগুলা ভাবনার আকার ধারণ করে, শেষে উভয়ে মিশিয়া একরকম জড়ভরত করিয়া ফেলে, সে অনেকটা ঘুমের মত বটে, কিন্তু যতক্ষণ কোন মুনি এরূপ অবস্থাকে ঘুম বলিয়াছেন বলিয়া কোন নজীর না পাইতেছি, ততক্ষণ আমি অন্ততঃ ইহাকে ঘুম বলিতে পারি না। যাহোক্, ঘুমাইয়া না পড়ি—রাতের মধ্যে বেশীবার জাগিয়া উঠি নাই। ষ্টেসনে আসিয়া গাড়ী থামিলে চারিদিকের ডাক হাঁক গণ্ডগোলে প্রায় এক একবার জাগিয়া উঠিতে হয়—তাহার পর গাড়ী ছাড়িয়া দিলেই আবার যে কে সেই। একবার বেশী রাতে একটা ষ্টেসনে গাড়ী থামিলে এক অদ্ভুত আওয়াজ শুনিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—কিন্তু কথাটা কি ঠিক ধরিতে পারিলাম না—চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিলাম সক্রেটিস দাদা

তখনো শোন নাই—আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি বলিতেছে ?" তিনি বলিলেন—"পানি পাড়ে।" জিজ্ঞাসা করিলাম, " মানে কি ?" তিনি আমার এই অজ্ঞতায় এতদূর শোকান্বিত হইয়া পড়িলেন যে খানিকক্ষণ তাঁহার মুখে কোনই কথা ফুটিল না। শেষে অনেক সাধ্য সাধনার পর বলিয়া দিলেন—"পানি পাড়ে অর্থাৎ বামুনের জল।"

রাত্রের মধ্যে এই যা এক ঘটনা হইয়াছিল—তারপর যখন চোখ মেলিলাম, তখন একেবারে সকাল। প্রভাতের আলোকে বাহিরের পরিস্ফুট শ্যামল দৃশ্য যখন চোখে পড়িল—তখন কি মধুর বলিয়া মনে হইল, চতুষ্কোণ ক্ষেত্রে সবুজ শষ্য, প্রকাণ্ড প্রান্তরে সবুজ ঘাস, সবুজ গাছপালা, সবুজ লতাপাতা, আশেপাশে যে পাহাড়গুলি দেখা যাইতেছে—তাহাও সবুজ গাছে গাছে আগাগোড়া ঢাকা,—ঠিক যেন তাহা গাছেরি পাহাড়—পাহাড়গুলি এত কাছে যে তাহার প্রত্যেক পাতাটি পর্য্যন্ত চোখে পড়ে, কিন্তু তাহার নীচে যে কঠিন জমি আছে তাহার একটুও দেখা যায় না। যেখানে গাছপালা কিছুই নাই, যে চষা জমীটুকুতে এখনো একটি শষ্য অঙ্কুরিত হয় নাই, সে স্থানটিও কি তকতক ঝরঝর করিতেছে—তাহারো কি একটা কাঁচা কাঁচা—কি একটা নবীন ভাব। গাছপালার মধ্য হইতে যে বাতাসটুকু মুখে চোখে ঝাপটা দিয়া যাইতেছে—তাহারও যেন কি একটা নূতনতর নবীনত্ব আছে। এই নবীন, শ্যামল দৃশ্যের মধ্যে অধিকক্ষণ থাকিলে কলিকাতার সেই কঠিন শুষ্ক ভাব ক্রমে যেন ভুলিয়া যাইতে হয়। প্রাতঃকাল আন্দাজ ৬টার সময় আমরা লক্ষ্মীসরাই পৌঁছিলাম, এইখানে হঠাৎ দৃশ্যটা পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, স্থলের পরিবর্ত্তে চারিদিক জলে জলময় দেখিতে পাইলাম। গাড়ীটা আমাদের একটা উচ্চ রাস্তা দিয়া চলিতেছে, তাহা ছাড়া চারিদিকে অকূল-সমুদ্র। যত দূর দেখা যায়, আর কিছু না, কেবল জল কেবল জল, জলের সীমানা দিগন্তে গিয়া এক হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ দেখিলাম সেই অগাধ জলের এক স্থলে একটা শকুনি পাখা ছড়াইয়া বসিয়া আছে, সে যেন তাহার সেই ক্ষুদ্র পাখার মধ্যে সেই প্রকাণ্ড জলরাশিটা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে চায়। দেখিয়া আমার প্রলয়ের দৃশ্য মনে হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে শকুনি অদৃশ্য হইয়া গেল। মাঝে মাঝে জলে ডোবা গাছের এক একটা আগা চোখে আসিয়া পড়িতে লাগিল। দূর হইতে তাহা স্থল বলিয়া ভ্রম হয়, আবার গাড়ী নিকটে আসিবামাত্র সে ভ্রম দূর হইয়া যায়। দু এক জায়গায় সত্য সত্যই জল সরিয়া একটা দ্বীপের মত হইয়াছে। কি ভয়ানক বন্যা ! দেখিয়া হাসি খুসী সব দূর হইয়া গেল। আন্দাজ ৭।।০ টার সময় মোকামা ছাড়াইয়া আমরা উচ্চভূমিতে উঠিলাম—আর জল দেখিতে পাইলাম না। আবার সেই পুরাতন দৃশ্য,—গাছপালা—পাহাড় মাঠ ক্ষেত্র, ঢেউ খেলিতে খেলিতে চোখের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। একটা কথা বলা হয় নাই, পাহাড় দেখিয়া ছেলে দুইটির আনন্দ ধরে না—বড়টি আগেই পাহাড় দেখিয়াছিলেন—ছোটটির এই প্রথম হাতে খড়ি,—সুতরাং পাহাড় দেখিয়াই তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ওকি ওকি"—আমি বলিলাম—"ঐ পাহাড়।" আমি ভাবিয়াছিলাম—এইখানেই তাঁহার জিজ্ঞাসা-তৃষ্ণাটা নিবৃত্তি হইবে—কিন্তু তিনি বলিলেন—"এই পাহাড়। তা পর্ব্বতও কি এই রকম?" কি উত্তর দিই, মুস্কিলে পড়িলাম, আমার ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়িল, তখন

পাহাড় পর্ব্বত কল্পনা করিতে গেলেই—আমাদের বাগানের সেই ছোট মাটির ঢিবিটা মনে পড়িত—আর চিরকাল কাব্যে আকাশের সহিত সমুদ্রের তুলনা করিতে দেখিয়াছি—সুতরাং সমুদ্র ভাবিতে গেলেই আকাশ ভাবিয়া বসিতাম— অথচ আকাশটা মাটিতে কি করিয়া আসিবে—সে সম্বন্ধে মনের মধ্যে মহা গণ্ডগোল বাধিয়া যাইত, শেষ কালে বিরক্ত হইয়া খুকু রানুটিকে কোলে লইয়া জিজ্ঞাসা করিতাম—"সমুদ্র কেমন বল দেখি—" সে ছোট ছোট কচি আঙ্গুলগুলি গোল করিয়া দেখাইত—"এমনি।" তখন তাহাকে চুমো খাইয়া খাইয়া আমার সমুদ্র দেখিবার আশ মিটিয়া যাইত। যাইহোক, অনেক দিন হইতে সেরূপ বুঝাবুঝির দায় এড়াইয়াছি—তাহার পর পাহাড় পর্ব্বত সমুদ্রের সঙ্গে আমার পরিচয় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু নিজের আনাড়ীত্ব যদিবা ঘুচিল—আবার আর এক আনাড়ীর হাতে পড়িয়া গেলাম; আমার পাহাড় দেখা ঘুচিয়া গেল—আমি বিছানায় শুইয়া পড়িয়া চোখ বুজিয়া বলিলাম—"দাঁড়া, একটু ভাবিতে দে"—কি জানি এত হাসির কথা কি বলিলাম, মেয়েটি ত ইহাতে হাসিয়া অনর্থ করিয়া দিলেন। পাশেই তাঁহার বিজ্ঞ দাদাটি বসিয়াছিলেন—তাঁহার এ উচ্ছ্বাসটা নিতান্তই বাড়াবাড়ি মনে হইল। এ সম্বন্ধে ছোট বোনের সহিত বড় ভাইয়ের মতের সম্পূর্ণ অনৈক্য, কেননা তাঁহার সকল সময় সকল কথায় এরূপ হাসি আসে না, তাঁহার উচ্ছ্বাসের প্রকৃতিটাই কিছু স্বতন্ত্র ;—তিনি পুকুরের ডোবা নৌকাখানা জলে ডুবিয়া তুলিবেন, বেসুরো হারমোনিয়ামটাকে সারিতে গিয়া একেবারেই সারিয়া ফেলিবেন—ঘড়িটা খারাব হইলে তাহাকে ভাল করিবার সম্পূর্ণ শুভ ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে ভাঙ্গিয়া বসিবেন, গ্যানোর ফিজিকস্খানা দিনের মধ্যে দশবার নাড়াচাড়া করিয়া—নানা রূপ কল করিবার ফন্দীতে আমাকে বিব্রত করিয়া তুলিবেন—তবে তাঁহার আমোদ হইবে।[২] বলিব কি তাঁহার কলের ফ্যাসাদে—বাড়ীটার বাড়ীত্ব ঘুচিয়া গিয়াছে (ঘরের ঘন্টা কলের দড়িদড়া চারিদিকে পড়িয়া বাড়ীটা যেন জাহাজের মত দেখিতে হইয়াছে) আর আমার যত কিছু অসুবিধা তাহাও একেবারে এমন দেশ ছাড়া হইয়া পড়িয়াছে যে তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আবশ্যক হইলেও (নূতন সৃষ্টি না করিলে) আর তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

ইহারি মত সৃষ্টিছাড়া রকমের ইহাঁর যে দু একটি বন্ধু আছেন—তাঁহাদের পাইলে আবার সোনায় সোহাগা, সে দিন উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে— পুকুরের জল বাগানে আসে, বাগানের মাটি পুকুরে যায়, আর আমার যে সকল অসুবিধা আমি কখনো জানিতাম না—তাহা পর্য্যন্ত সে দিন রাশি রাশি আবিষ্কার হইয়া পড়ে। যাইহৌক, উপরের মত কোন একটা কাণ্ডকারখানা হেঙ্গাম হুজ্জুত কিম্বা দু চারিটা বন্ধু বান্ধব না পাইলে—তাঁহার উচ্ছ্বাসটা বড় জমে না,— সুতরাং নিরীহ ছোট্টখাট্ট একটা ব্যাপারে—কি কথায় তাঁহার বোনটিকে হাসিতে দেখিলেই তিনি বলিয়া বসেন—"তোর সকল তাতেই হাসি—"

বাস্তবিক মেয়েটির এই অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসটা কমাইতে পারিলে আমিও পীরের কাছে সিন্নি দিয়া আসি। মেয়ের জন্য দিদিমাদের কাছে তিরস্কার খাইতে খাইতে মায়ের পর্য্যন্ত প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। কেননা—তিনি শত্রু মুখে ছাই দিয়া (কথাটা ঠিক সার্ব্বভৌমিক ভালবাসার

কথা নহে—বলা উচিত ছিল মিত্রের মুখে ফুল চন্দন দিয়া। পাঠকেরা কথাটা বদলাইয়া লইবেন) এখন আর ঠিক খাঁটি দুই চারি বৎসরের মেয়েটি নাই; তবু এখনো তাহার বয়সোচিত দেশোচিত বিজ্ঞতা হইল না! (আমি বলিতেছি 'হইল না' কিন্তু দিদিমারা বলেন—মায়ের শিক্ষার দোষে হইল না। মেকলেও নেটিভদের এমন বৃথা অপবাদ দেন নাই)। তাঁহার বিজ্ঞতা যে একেবারে নাই—তাহা বলিতেছি না,—তবে তাঁহার যেরূপ বিজ্ঞতা দেখা যায় সেও এমন নূতনতর যে সে ফ্যাসানটা বিজ্ঞতার বাজারে এখনো চলে নাই। সুতরাং সে বিজ্ঞতাটুকু কাহারো চোখে পড়ে না—তাহার অভাবটাই সকলে দেখিতে পান। তিন চার বছরের ছোট ছেলে মেয়ে পাইলে তিনি এখনো তাহাদের সহিত খেলা করিতে বসেন—পরিচিত অপরিচিত সকল লোকের কাছেই, কোনদিন ঘরে বেগুণপোড়া দিয়া ভাত খাইয়াছি—এবং তাহার কোনটা বা কানা ছিল, তাহা অসঙ্কোচে প্রকাশ করেন। আর হাসির কথা ত আগেই বলিয়াছি, এমন কি—ভদোচন্দ্রকে কথা কহিতে শুনিলে আর হাঁদারামকে হাঁটিয়া যাইতে দেখিলে পর্য্যন্ত তিনি হাসিয়া কুটিকুটি হন। কেবল ইহা হইলেও রক্ষা ছিল, বিশ্বের কাহারো যাহাতে হাসি আসে না—এমন অনেক বিষয় তাঁহার মহা হাস্যকর বলিয়া মনে হয়। ঝকমারী করিয়া একবার আমি গল্প করিয়াছিলাম যে "প্রথম যখন আমি রেলের গাড়ীতে উঠি তখন পাল্কী গাড়ীর কাছে নামাইয়াছিল—আমি পালকি হইতে গাড়ীতে চড়িলাম"—এই গল্পটা তাঁহার এতদূর অদ্ভুত ঠেকিয়াছে যে সে কথা মনে পড়িলে এখনো তিনি হাসিয়া বাঁচেন না। তাঁহার মতে এমন হাসির কথা, এমন লজ্জার কথা ভূ-ভারতে নাই।

প্ল্যাটফর্ম্মে পালকীখানার প্রতি রাজ্যের লোকের চোখ পড়িয়া যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হইয়াছিল—তাহাতে যে আমি লজ্জায় মরিয়া যাই নাই—ইহাতেই তিনি আশ্চর্য্য হন। এ বড় নূতনতর লজ্জা! আমরা ত এরূপ লজ্জার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি। আমরা ত জানি লোকের মধ্যেই লজ্জা করে। আমার মনে আছে প্রথম যে রাত্রে লোকজন জনতার মধ্যে আমি ষ্টেসনে নামি, আমার কিরূপ লজ্জা কিরূপ হৃৎকম্প হইয়াছিল, বেড়াইবার সমস্ত সুখটা যেন এক মুহূর্ত্তে একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছিল। তাহার পর এতবার গাড়ী উঠিয়াছি, এখনো ষ্টেসন দিয়া গাড়ীতে উঠিবার সময় কেমন যে একটা অশোয়াস্তি উপস্থিত হয়—তাহা কোনক্রমেই কাটাইয়া উঠিতে পারি না। দেখিতে দেখিতে সমাজে কি পরিবর্ত্তন! কে জানে দিনকতক পরে আরো কি হইবে!

এখন বাজে কথা ছাড়িয়া আসলে আসি। মেয়েটির হাসি শুনিয়া সক্রেটিস দাদা—কি ব্যাপার বলিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। কি ভাবিয়াছিলেন তিনিই জানেন, চারিদিকে চাহিয়া আশ্বস্ত হইয়া ছেলেদের কাছে আসিয়া বসিলেন, তারপর নানারূপ ভণিতা করিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন, তাঁহার রঙ্গ ভঙ্গ দেখিয়া মেয়েটির ত কথাই নাই, ছেলেটি শুদ্ধ হাসিয়া অস্থির হইল, হাসির এই অট্টগোলে আগেকার কথাটা একেবারেই চাপা পড়িয়া গেল, আমি নিশ্চিন্ত হইয়া উঠিয়া বসিলাম। দেখিলাম চারিদিকে বেশ রোদ হইয়াছে। দূরে গাছপালার ভিতর পাতার কুটিরগুলি গায় গায় ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া রোদ পোহাইতেছে; বাতাসের শৈত্যটা

ইহার মধ্যেই এত মৃদুতর—এত কোমলতর হইয়া পড়িয়াছে যে ঠিক যেন বসন্তের বাতাস বলিয়া মনে হইতেছে। বামে মাঠের মধ্যে পাশাপাশি চতুষ্কোণ তিন চারিটি ক্ষেত্র জমীতে দুইজন করিয়া কৃষক হাতে গোল গোল ছোট ছোট দাণ্ডা ধরিয়া এক এক জোড়া বলদকে লাঙ্গল চষাইতেছে। মাঝে মাঝে তাহাদের লাঙ্গুল মলিতে মলিতে গান ধরিতেছে। ডাইনে ঠিক গাড়ীর রাস্তার পাশে একজন কৃষক বালক একপাল গরু পশ্চাতে রাখিয়া গাড়ীর পানে চাহিয়া আছে, বুঝি গাড়ীটা চলিয়া গেলেই সে এই রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইবে। স্থানে স্থানে কেমন ঐ তাল গাছের কুঞ্জ, সরু সরু লম্বা ডালের আগায় বড় বড় পাতার মুকুট—কি সুন্দর দেখিতে। সুবিস্তৃত মাঠে কোথায় বা বড় বড় গাছের দলে দলে আলিঙ্গন, কোথায় বা এক একটি বড় গাছ সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্র সমুদ্রের মধ্যে দিশাহারা একাকী দাঁড়াইয়া।

দেখিতে দেখিতে একটা ছোট পাহাড়কাটা রাস্তা দিয়া ট্রেন চলিয়া গেল, একটা নদী ছাড়াইয়া আসিলাম, সম্মুখে ঐ একটা জলাশয় রৌদ্রকিরণে চিকচিক করিতেছে। ময়লা কাপড় পরা মোটাসোটা নথ নাকে একজন ধোপানি জলে হাঁটু ডুবাইয়া একখানা কাঠের উপর ধপাস ধপাস করিয়া কাপড় কাচিতেছে। পরের দোষ ধরা লোকের মত সে পরের ময়লা পরিষ্কার করিয়াই জীবন কাটায়, নিজের ময়লা ধুইবার আর আবশ্যক দেখে না। পুকুরটাকে দেখিয়া মনে হইতে লাগিল ক্ষপ করিয়া একটা ডুব দিয়া আসি—তবু এখনো গাড়ীটা কিছুই গরম হয় নাই—কিন্তু গরমের সময় রেলগাড়ীতে বসিয়া নদী পুকুর দেখিলে কি ভয়ানকই স্নান করিতে ইচ্ছা যায়।

এই সকল দেখিতে দেখিতে আমরা ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছি, গাছপালা জলাশয় প্রান্তর সমস্ত লইয়া দিগন্ত চক্রাকারে যেন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিতেছে।

১১টার সময় আমরা দানাপুরে পৌঁছিলাম। দানাপুরে আগে হইতেই আমাদের জন্য ভাত ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া রাখিতে বলা হইয়াছিল, গাড়ি ষ্টেসনে লাগিতেই হাঁড়ি হাঁড়ি অন্ন ব্যঞ্জন আসিয়া উপস্থিত। সক্রেটিস দাদা হাঁড়িগুলি দরজার ধারে গুছাইয়া রাখিয়া ছেলেটিকে সঙ্গে লইয়া ষ্টেসনে স্নান করিতে নামিলেন—এখানে আধঘন্টা আন্দাজ গাড়ী থাকে। যদিও চারিদিকের জানালা দরজা আমাদের বন্ধ ছিল, তবু ভয় হইতে লাগিল, কেহ পাছে আসিয়া পড়ে। ঘরের হাঁড়ি কলসিগুলা যে আমাদের রক্ষকের কাজ করিতেছে তাহা তখন জানিতাম না। একটু পরে একজন ইংরাজ দরজাটা আধখোলা করিয়াই দরজাটা আবার দুম করিয়া ফেলিয়া দিল। ঘরের ভিতর কে আছে বা কি আছে তাহা দেখা পর্য্যন্ত সে আবশ্যক বোধ না করিয়া জেনানা জেনানা করিয়া চলিয়া গেল। আর কিছু নহে, সমুখের হাঁড়ি কলসিগুলা তাহার নজরে পড়িয়াছিল। দানাপুর ছাড়াইয়া দুপুরের পর আমরা ভাত খাইতে বসিলাম—কিন্তু রেলের ঝনঝনানি আর কয়লার গুঁড়া ও গরম বাতাস খাইয়া পেট এমন ভরিয়া গিয়াছিল, যে আর কিছু খাইবার বড় আবশ্যক ছিল না, ইহা ছাড়া সকালবেলা আমরা অল্পস্বল্প দুধ রুটিও খাইয়া লইয়াছিলাম। দানাপুরের পর বকসার, এইখানেই আমাদের লেপ্টেনেন্ট গভর্ণরের বাঙ্গালার সীমা, কিন্তু আসল বাঙ্গলা অনেক আগে ছাড়াইয়াছি। এখানে আমাদের বামে বহুদূর

বিস্তৃত শ্যামল ঘাসপূর্ণ প্রান্তর দেখা যায়—এইখানে আগে গভর্ণমেন্টের ষ্টাড-ব্রেড ঘোড়ার কারখানা ছিল। যাই হৌক, দুপুরটা ত কাটিয়াছে—সক্রেটিস দাদার ষ্টেসনে ষ্টেসনে বহুরূপী সাজা দেখিয়া আর ছেলেদের সঙ্গে ছেলে হইয়া বিকালটাও একরকমে কাট কাট হইল। মৃজাপুরে পৌঁছিয়া আমরা এলাহাবাদে নামিবার জন্য প্রস্তুত হইব ভাবিলাম, কিন্তু অতটা সবুর সহিল না, চুনারে গাড়ী থামিবামাত্র আমরা নামিবার উদ্যোগ আরম্ভ করিলাম; চুনারের আসল নাম চণ্ডালগড়। চণ্ডালগড় পাহাড়ের উপর একটি চমৎকার দুর্গ, এই দুর্গে দিলীপ সিংহের মাকে ইংরাজরা বন্দী করিয়া রাখেন।[৩] চুনারে বড় সুন্দর মাটির পুতুল—মাটির জিনিসপত্র পাওয়া যায়। চুনারের পর মৃজাপুর। মৃজাপুরে একটি ছোট পাহাড়ের উপর একখানি ধবধবে কি সুন্দর বাড়ি! ক্রমে যতই বোদ পড়িয়া আসিতে লাগিল যতই এলাহাবাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, আমাদের কথাবার্ত্তাও তত কমিয়া আসিতে লাগিল, শেষাশেষি সকলেই নিঃঝুম নিস্তব্ধভাবে ঔৎসুক্যপূর্ণ হৃদয়ে বসিয়া কেবল ষ্টেসন গুণিতে লাগিলাম। গাড়ীতে ষ্টেসনই ঘড়ির কাজ করে।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল, গাড়ী নইনি ছাড়াইয়া আসিল, হঠাৎ একটা নূতন রকম গম্ভীর গুম গুম শব্দ আমাদের কাণে গেল, বুঝিলাম যমুনা পুলের উপরে গাড়ী আসিয়া পড়িয়াছে—দেখিলাম নীচে যমুনার কাল জল থই থই করিতেছে—আবার সে শব্দ থামিয়া গেল—সে জল অদৃশ্য হইল, আমরা এলাহাবাদ ষ্টেসনে আসিয়া পঁহুছিলাম।

২

আমাদের বাঙ্গালার কাছাকাছি একটি মন্দির আছে, সেদিন ভোরের বেলায় সেই মন্দিরের রসানচৌকিতে প্রভাতরাগিণী বাজিয়া উঠিয়াছিল, এখনো বাজে, কিন্তু সেদিন সেই গানে হৃদয় যেমন পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, এখন আর তেমন হয় না।

সেদিন সে রাগিণীতে ছোট তিনটি ভাই বোনের মধুর কণ্ঠতান শুনিতে পাইয়াছিলাম, তাহাদের হৃদয়ের আনন্দপ্রবাহ সেদিন সঙ্গীত হইয়া ঐ গানের প্রাণে তরঙ্গ তুলিয়াছিল—তাই সেদিনকার প্রভাতরাগিণী তেমন মধুর লাগিয়াছিল,—অন্তর বাহির পূর্ণ করিয়া তেমন উথলিয়া উঠিয়াছিল; —তাহারা চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের সঙ্গের সে হাসি, গান, আমোদ আহ্লাদ—যাহাতে এখানকার সকলি মধুর হইয়া, আলো হইয়াছিল—তাহা সঙ্গে লইয়া তাহারা চলিয়া গিয়াছে, তাই ঐ বাঁশি আর এখন তেমন সুরে বাজে না, প্রভাতে এখন আর তেমন সৌন্দর্য্য নাই।

তাহারা আর যাহা সঙ্গে আনিয়াছিল—সব লইয়া গেল, কেবল আমাকে একাকী ফেলিয়া গেল। সময়ের আজ্ঞা বড় নিদারুণ, তাহার কাছে স্নেহ মমতা নাই। তাহাদের সময় হইয়াছিল—তাই তাহারা আমার জন্য অপেক্ষা করিতে পারিল না; আমার সময় হয় নাই—আমি এখনো

পিছনে পড়িয়া আছি; উৎসুক প্রাণে সময়ের মুখপানে চাহিয়া সেই সুখের মিলনের দিনের জন্য অপেক্ষা করিতেছি, আর সেইরূপ আর একটা দিন যে চলিয়া গিয়াছে তাহার কথা মনে করিতেছি।

সেদিনকাব প্রভাত কি মধুর প্রভাত, সেদিন স্নেহ প্রেম ভক্তি একত্র মিলিয়া বাগানের রাশি রাশি গোলাপ ফুল হইয়া উঠিয়াছিল, সেদিন প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের আনন্দ কিরণ তরুণ সূর্য্যরশ্মিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া, বাগানেব লতা পাতার ফুল ফলের শিশিরকণার উপর ঝলমল করিয়া উঠিয়াছিল, সে শিশিরকণাও যেমন আর কিছু নহে বহুদিন পরে প্রিয়জন মিলনের বিমল প্রেমাশ্রু। সেইদিনকার সেই সৌন্দর্য্যময়, লাবণ্যময়, প্রেমময় প্রভাতে ফুলের পরিমলের সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়ও অনন্ত পরিমলেব বাষ্পে উত্থিত হইয়াছিল, তাই সেদিন এত মধুর বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

সেই এক প্রভাত, আর আজ এই এক প্রভাত। আজও প্রভাত হইয়াছে, কিন্তু যাদের লইয়া প্রভাতের সৌন্দর্য্য, এ প্রভাতে তাদের কিছুই নাই, প্রভাতের সে ফুল নাই, সে মধুর বাতাস নাই, সে উষার হাসি নাই। প্রভাতের আলো—প্রভাতের প্রাণ যে সূর্য্য—সে আজ মেঘের মধ্যে লুকাইয়া, অথচ প্রভাত হইয়াছে। প্রভাতের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া আমার শুদ্ধ প্রাণ কেমন করিয়া উঠিতেছে। আজ বলিয়া নহে, ক্রমাগত আজ ৮।১০ দিন হইতে এইরূপ মেঘের মধ্যে সূর্য্য উঠিয়া মেঘের মধ্যেই অস্ত যাইতেছে। সাধারণতঃ উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে মেঘ বৃষ্টি বাদল বাঙ্গলাদেশ অপেক্ষা একেই অনেক কম, তাহার পর শীতকালে ক্রমাগত এতদিন ধরিয়া এরূপ বৃষ্টি হওয়া এদেশের পক্ষে নিতান্তই নূতন ব্যাপার, গরীব দুঃখী গরু বাছুরের কি ভয়ানক কষ্ট! সারাদিনই প্রায় বৃষ্টি হইতেছে, দুপুর বেলা বৃষ্টি একটু ধরে, আকাশটা একটু পরিষ্কার দেখায়, নিরাশ হৃদয়ের আশার মতন চারিদিকটা একটু প্রসন্ন দেখায়, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার যে কে সেই হইয়া পড়ে। এই হাসিহীন, আলোহীন অন্ধকার প্রভাতের মুখের পানে ত আর চাওয়া যায় না, এই মলিন দিনগুলার দিকে চাহিয়া আমরাও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, প্রতিদিন সূর্য্যের মুখ দেখিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিতেছি, প্রতিদিনই নিরাশ হইয়া পরদিনের জন্য আবার আশায় থাকিতেছি। আশার এই অনিশ্চিততার মধ্যে পড়িয়া আশাটাও এমন কষ্টকর বোধ হইতেছে যে—'আশাতেই মানুষের সুখ' এই যে পুরাতন জ্ঞানী বচনটি, ইহার প্রতিও আর আস্থা রাখিতে পারিতেছি না, বরঞ্চ বিপরীতই মনে হইতেছে, এরূপ আশা অপেক্ষা একেবারে নিরাশাও ভাল। আমি যদি বৃষ্টির প্রথমেই জানিতে পারিতাম যে এক আধ দিন নয়, এমন গোটা দশ দশ দিন—কি আরো বেশী—এই অন্ধকারের মধ্যেই বাস আমার অদৃষ্ট লিখন, তাহা হইলে আর কিছু না হউক প্রতিদিনকার এই আশার সুখ ভোগ হইতে রেহাই পাইয়া বাঁচিতাম। আমি ত বলি নিশ্চিৎ কষ্ট যাহা সহিতে হইবেই জানি—তাহা অপেক্ষা অনিশ্চিতের কষ্ট আরো ভয়ানক, মৃত্যুভয় আর কি সেইজন্যই শ্রেষ্ঠ ভয়।

তবে আমার এইরূপ মনে হইতেছে—বলিয়া সকলেরই যে এইরূপ মনে হইবে তাহা নাও হইতে পারে। এমনও লোক থাকিতে পারেন—যিনি অনবরত দশ দিন এই অন্ধকারের

মধ্যে থাকিতে হইবে আগে থাকিতে জানিলে একেবারেই চারিদিক অন্ধকার দেখিতেন। তিনি বলিতে পারেন— "আশা আছে বলিয়াই নিরাশার বিরক্তি সহা যায়—অদৃষ্টের অন্ধকার জানা হইতে না জানাই ভাল। ইত্যাদি"

কিন্তু তিনি বলিলেও আমি যে কথাটা মানিয়া লইব এমন হইতেই পারে না। হ্যাঁ পক্ষে কথাটা সত্য হইতে পারে, লোকেও একথাটা যুক্তির আকারে দেখিতে পারে—কিন্তু যতক্ষণ আমি ইহা সত্য বলিয়া না মানি ততক্ষণ ইহা সত্যই হইতে পারে না। বরঞ্চ আমি ইহা হইতে এইরূপ স্বীকার করিব—যে, একই জিনিস ভিন্ন ভিন্ন ইচ্ছার সাজে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ভিন্ন একথার অন্য কোনরূপ গুরুত্ব আছে ইহা আমি আদপেই মানি না। লোকে আমার এই দৃঢ়তাকে একগুঁয়েমি, কুতর্ক, স্ত্রীলোকের যুক্তি, প্রভৃতি নানারূপ নামে অভিহিত করিয়া থাকে, কিন্তু আমি ইহাকে মনুষ্যত্ব বলি, আর যাহারা এই উচ্চ মনুষ্যত্ব হইতে বঞ্চিত তাহারা যে কেবল হিংসার জ্বালাতেই এইরূপ করিয়া বলে, সে বিষয়েও আমার সংশয় মাত্র নাই, বুদ্ধিমান মাত্রেরই সংশয় থাকিতে পারে না। কিন্তু আমার একটি ঝগড়াটে যে বন্ধু আছেন তিনি বুদ্ধিমান—ঠিক হইল না—বুদ্ধিমতী হইয়াও আমার একথা মানিতে চাহেন না, (ইহাতে এই প্রমাণ হইতেছে—আমার কথায় যাঁহারা সংশয় করেন—-তাঁহারা নির্ব্বোধ শুধু নন্—আবার ঝগড়াটে)। আমার এই কথা শুনিলেই তিনি এমন অধৈর্য্য হইয়া উঠেন, তাঁর তর্কের বস্পটা এমন উত্তেজিত হইয়া উঠে—যে তখন তাঁহার ছোট ছোট ঠোঁট দুখানির ভিতর দিয়া অনবরত খই ফুটিতে থাকে, আর বড় বড় চোখ দুটি উত্তরোত্তর লাল হইয়া উঠে। কিন্তু তাহাতে ডরাইয়া আমি যে আমার মতের তিল-চুল তফাতে গিয়া পড়ি এমন নয়। তবে সে চোখ রাঙ্গানির একটা ফল হয় এই, তাহা দেখিলে আমার কলিকাতার রৌদ্রময় দিনগুলা মনে পড়িয়া যায়, এই বাদলার দিনেও তাহাতে আমাকে একটু গরম করিয়া তোলে, সুতরাং অবকাশ পাইলেই মাঝে মাঝে আমি তাঁহার সহিত তর্ক করিতে বসি।

আজ এখনো বৃষ্টি আরম্ভ হয় নাই কিন্তু আকাশে মেঘ, আর নীচে চারিদিকে কুয়াসা, এ বড় বিশ্রী অন্ধকার, অন্ধকারের ঠিক এ রকম একগুঁয়ে গুমসা মূর্ত্তি কলিকাতায় দেখিয়াছি মনে হয় না। রৌদ্রের দিনে আমাদের বাঙ্গালার মাঠের সীমান্তে বড় বড় গাছগুলি কেমন চক্রাকারে সুন্দর সাজিয়া থাকে—আজ তাদের চিহ্নও নাই। ক্ষেত্রের অড়হর, ভ্যারেণ্ডা, যওয়ারির বিস্তীর্ণ বন একেবারে ধূমাচ্ছন্ন; এই ধূম-সমুদ্রের মধ্যে আমাদের বাঙ্গলাটা যেন একটা জাহাজ বলিয়া মনে হইতেছে। সম্মুখের পাতকুয়াটা হইতে চাকরদের কপিকলে জল তুলিবার অবিশ্রান্ত ঘড়ঘড়ানি, আর নিকট দিয়া ট্রেন যাইবার ধকধকানিতে এই জাহাজিভাবটা যেন মনে আরো ভাল করিয়া বসিতেছে। জানালা দিয়া বাঙ্গলার আশে পাশের যে দুই একটা আম পেয়ারার গাছ চোখে পড়িতেছে—মনে হইতেছে, উহারা যেন এক একটা দ্বীপ, আর বাগানের ধারের ঐ যে কাশবনের মাথার সাদা সাদা শিষগুলি কুয়াসা মাখা হইয়া অস্পষ্টরূপে মাঝে মাঝে ঈষৎ দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে, উহা যেন অদৃশ্য নৌকার পাল, উহার ওদিকে আর কিছুতেই দৃষ্টি চলে না।

দিনটা এমনি বিশ্রী, পাখীপাখালিগুলাও আজ ঘরের বাহিরে হইতে চায় না, পরিষ্কার দিনে রোজ এ সময় সমুখের ঐ আম গাছে একটি কেমন রংচঙ্গে পাখী লম্বা পুচ্ছ নাচাইয়া শিষ দিত, কদিন হইতে তাহাকে আর মোটেই দেখিতেছি না। আমি রোজ সকালে জানালার সম্মুখে ছোলা ছড়াইয়া দিই, রাজ্যের পাখী আসিয়া খাইতে আরম্ভ করে, আজ অনেকক্ষণ হইতে যেখানকার ছোলা সেইখানেই পড়িয়া আছে, একটি কাকও তাহা খাইতে আসে নাই, কেবল দু একটা কাঠবিড়ালি মাঝে মাঝে ঐখানে আসিয়া চকিত দৃষ্টিতে চারিদিক পানে চাহিয়া দুই একটা ছোলা মুখে লইয়া পলাইতেছে।

এই আবার বৃষ্টি আরম্ভ হইল, পূর্ব্বে কি পশ্চিমে বলিতে পারি না—একটা কনকনে বাতাসের ঝাপটাও বহিতে আরম্ভ হইল, বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে কুয়াসাগুলা মেঘের মত কেমন উড়িয়া উড়িয়া যাইতেছে, বাতাসে আমার হাত এমনি কনকন করিয়া অবশ হইয়া পড়িতেছে, যে মাঝে মাঝে লেখা অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে,—হাত খানিকক্ষণ গবম না করিয়া আর লেখা যায় না,—মনে হইতেছে ঘরে আগুণ থাকিলে ভাল হইত, কিম্বা মুড়ি সুড়ি দিয়া বিছানায় পড়িয়া যদি দিনটা কাটাইতে পারিতাম তাহা হইলেও মন্দ হইত না। আমি আর কখনো এরূপ শীত ভোগ করিয়াছি এমন মনে পড়ে না, রাত্রে একটা লেপ—একটা বালাপোষ, দুই জোড়া কম্বল—(আসলে চারখান হইল) গায়ে দিয়াও আমার শীত ভাঙ্গে না—আবার খানিক রাতে তার উপব আর কিছু চাপাইতে হয়। কলিকাতায় বসিয়া এ শীত ঠিক বুঝা যায় না, তরল হৃদয় সুখী ব্যক্তিরা সুখের রাজ্যে বসিয়া যতটুক পরের দুঃখ অনুভব করিতে পারে—আমার মনে হয়—কলিকাতায় বসিয়া এ শীত ততটুকুর বেশী আর বুঝা যায় না। যাঁহারা ইংলণ্ডে গিয়াছেন তাঁহারা বলেন, ইংলণ্ডের শীতকাল অনেকটা এই রকম। এই কথাটা শুনিয়া অবধি এত ঠাণ্ডার মধ্যেও প্রাণটা আরো একটু বেশী রকম ঠাণ্ডা হইয়াছে, হইলই বা বৃষ্টি বাদল কুয়াশা শীত,—ইংলণ্ডে না গিয়াও ইংলণ্ড ভোগ করিতেছি—এ কি কম সৌভাগ্যের কথা!

কিন্তু এখানকার শীতে আমার যত কষ্ট হয় এ-দেশের লোকের তা হয় না—তাহারা আমার শীত দেখিয়া অবাক হয়। এই শীতে এদেশে অনেকে একেবারে বাহিরে পড়িয়া থাকে। দেখিয়া আমাব অত্যন্ত কষ্ট হয়, কিন্তু যাঁহারা অনেক দিন এদেশে আছেন তাঁহারা বলেন, এদেশের ছোট লোক বলিয়া নহে, বড় লোকেরাও ঘরের ভিতর শোয় না। মোটা মোটা লেপ মুড়ি দিয়া খোলা বারান্দায় শোওয়া এখানকার একটা দস্তুর, ছেলেবেলা হইতে এদেশের সকলের এইরূপ অভ্যাস। তবে যাহারা গরীব তাহারা অনেক সময় গাছতলায় থাকে, বড় লোকেরা বারাণ্ডায় থাকে এই মাত্র নাকি তফাৎ।

এই শীতের উপর রাতে আর এক উৎপাৎ—চোরের ভয়। এদেশের লোকের বাঁচিয়া কি সুখ আমি ত ভাবিয়া পাই না। তবে আমি ভাবিয়া পাই আর নাই পাই তাহাতে যে তাহাদের কিছু আসে যায় না, তাহাতে যে তাহাদের বাঁচিবার কোন ব্যাঘাত জন্মে না, বা তাহাদের জীবনের মূল্য ধনীদিগের অপেক্ষা একতিলও কমিয়া যায় না, এমন প্রমাণ প্রত্যহ অজস্র পাইতেছি, আর ইহা হইতে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছি—যে, সুখই জীবন

অর্থাৎ সুখের জন্যই জীবন—এ কথাটা ঠিক কথা নহে, জীবনের জন্যই জীবন অর্থাৎ বাঁচাতেই সুখ—ইহাই খাঁটি কথা, নহিলে এত দীন দুঃখী আতুর এত দিনে মরিয়া যাইত।

আমাদের বাঙ্গলাটা আবার যেরূপ মাঠের মধ্যে তাহাতে এখানে চোরের ভয়টা আরো কিছু জবর রকম। শুনিতে পাই চারিদিক হইতে চুরি করিয়া আনিয়া আমাদের বাঙ্গলার পূর্ব্বদিকের মাঠে আসিয়া চোরেরা ভাগ বাটরা করিত, এ-স্থানটা তাদের একটী আড্ডাস্থান। আর পুলিস ইহা জানিয়াও তাহাদের কিছু বলে না। সেই জন্য প্রথম প্রথম এই বাঙ্গালায় লোক আসিলেই চোরেরা উৎপাৎ করিয়া তাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিত। তবে বন্দুকের ভয়ে ও গৃহ-স্বামীর সতর্কতায় এবারটা তাহারা কিছু জব্দে পড়িয়াছে, তবু নাকি আমরা আসিবার আগে খোদ চৌকিদারকে লাঠি মারিয়া তাহার ঘর হইতে চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছে। যাই হৌক, আমরা আসিয়া অবধি এ পর্য্যন্ত আমাদের বাঙ্গলায় চুরী হয় নাই, তবে ভয়টা যে ছাড়িতেছে তাহা নহে, কেননা চাকরদের কাছে চোর আসিয়া পলাইবার কথা আর তাহা ছাড়া আমাদের বাড়ীর কাছের অন্ধখানার বেচারী গরীবদের ঘর হইতে চুরী যাইবার কথা প্রায়ই ত শুনিতে পাই। এইরূপ চুরীর কথা শুনিলেই আমার মনে হয় যে চোরগুলা নিতান্তই বোকা চোর, যদি চুরীই করিতে হয় ত তাহারা লাট সাহেবদের ঘরে চুরী না করিয়া—বেচারা গরীবদের ঘরে চুরী করে কেন? শুনিলাম তাও নাকি চোরেরা বাকী রাখে নাই, একবার নাকি এখানকার লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের ক্যাম্পে বড় আশ্চর্য্য রকম চুরী হইয়াছিল।

মফস্বলের এক বিস্তীর্ণ মাঠে ছোটলাটের ক্যাম্প পড়িয়াছে, মেলাই তাম্বু, উট, ঘোড়া, গরু, গাড়ী, সিপাই শান্তিরি—লোকজনে ক্যাম্প ভরপুর। ক্যাম্পের বাবুদের সালরুমাল সাহেবদের ঘড়ি চেন, চাঁদির বাসন, ভাল ভাল কাপড়, জিনিসপত্র, নগদ টাকা—এই সব দেখিয়া চোরেদের মহা লোভ পড়িয়া গেল। কিন্তু খোদ লাট সাহেবের ঘরে চুরি করা ত সহজ কথা নয়, অষ্টপ্রহর শস্ত্রধারী প্রহরীরা চারিদিক চৌকি দিতেছে, তাম্বুর কাছাকাছি এমন জঙ্গল-টুকও নাই যাহাতে লুকাইয়া ক্ষণকালের জন্যও প্রহরীদের দৃষ্টি এড়ান যাইতে পারে—সুতরাং চোরেরা মহা মুস্কিলে পড়িল, কিন্তু তবুও হতাশ হইল না। দু'চার দিন ধরিয়া ক্যাম্পের বাহিরে দূরে দূরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সন্ধান ও উপায় বাহির করিতে লাগিল—তাহার পর একদিন অন্ধকার রাতে এক একটা মস্ত মস্ত গাছের ডাল কাটিয়া, তাহা হাতে লইল, এবং এক এক জনে স্বতন্ত্র হইয়া সেই বিস্তীর্ণ মাঠে এক একটা ছোট গাছের মত একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু তাহারা পাহারার মধ্যে আসিয়া পড়িবার আগেই ক্যাম্পের কুকুরেরা চীৎকার করিতে করিতে তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইল, কুকুরের হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য আগে হইতেই চোরেরা উপায় ভাবিয়া আসিয়াছিল, যেই কোন কুকুরকে তাহাদের কাছাকাছি আসিতে দেখে তাহারা বিষমাখান মিষ্টান্ন ফেলিয়া দেয়, কুকুর তাহা খাইতে আরম্ভ করিয়া চুপ করে, তাহার পর একেবারেই চুপ হইয়া পড়ে। সিপাইরা কুকুরদের প্রথম চীৎকারে একবার এদিক ওদিক দেখে, গাছ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পায় না, বিশেষ কুকুরদেরও পরে চুপ করিতে দেখিয়া তাহাদের আর সন্দেহও থাকে না। এইরূপে তাহারা কুকুরদের হাত

ছাড়াইয়া ক্রমে ক্রমে প্রহরীদেরও হাত ছাড়াইল। প্রহরীরা পায়চালি করিয়া পাহারা দিতে দিতে যখন চোরেদের সম্মুখীন হইয়া চলে তখন চোরেরা নিস্তব্ধে গাছের মত দাঁড়াইয়া থাকে, আর যেই প্রহরীরা মুখ ফিরাইয়া চলিতে থাকে তাহারা অমনি অগ্রসর হয়। এইরূপে তাহারা কলে-কৌশলে প্রহরীদের নিরস্ত করিয়া খোদ লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের তাম্বু হইতে চুরি করিয়া স্বচ্ছন্দে নাকি পলায়ন করিল। শোনা যায়, একবার এখানে মিউনিসিপালিটির আফিস হইতেও এইরূপ একটা ভয়ানক চুরি হইয়া যায়। মিউনিসিপাল আফিসের নিকটেই মেজিষ্ট্রেট কালেক্টর প্রভৃতির আফিস, পুলিস পাহারার স্থান,—তবু স্বচ্ছন্দে চোরেরা আফিসের ভিতর হইতে—আট দশ জন লোকের তুলিতে কষ্ট হয়, এমন একটা লোহার সিন্ধুক তুলিয়া দূর মাঠে আনিয়া ফেলিয়া রাখিয়া যায়।

এই চোরের হেঙ্গামে এখানে রীতিমত চৌকিদার চাকর না রাখিলে চলে না। পাশি বলিয়া একরকম ছোট জাত আছে, তাহারাই নাকি বেশীর ভাগ চোর ডাকাতি করে, আর তাহারাই আবার চৌকিদার। যাদের ঘরে তাহারা চাকর থাকে তাদের ঘরে নাকি চোরের উৎপাৎ হয় না, এইরূপ ত লোকেদের একটা বিশ্বাস। আমাদের দুইটা চৌকিদারই পাশি। তাহাদের মধ্যে একজন চৌকিদারের জীবনটা নিতান্ত নভেলি রকম।

একদিন ঘরে বসিয়া আছি, জানালার কাছ দিয়া একটি যুবতী স্ত্রীলোক করুণ স্বরে কাঁদিয়া চলিয়া গেল। তাহাকে আগে কখনো দেখি নাই, তাহার কান্নার স্বরে তাহার প্রতি বড় মায়া উপস্থিত হইল, মনে হইল, সে কান্না যেন কোন একটা বিশেষ কষ্টের কান্না, আমি আমাদের সর্দার চাকরকে (জাতিতে ক্ষত্রিয়) ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"ও কে? কেন কাঁদিতেছে"—সে বলিল, "ও মাধব চৌকিদারের ছোট স্ত্রী, দুই এক দিন হইল দেশ হইতে আসিয়াছে। স্বামী উহাকে রাখিতে চাহিতেছে না, তাই কাঁদিয়া যাইতেছে"—এই উপলক্ষে চৌকিদারের দুই স্ত্রী হইবার ঘটনা শুনিলাম। চৌকিদার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ফাঁদে পড়িয়া মরিসসে কুলি হইয়া যায়। অনেকদিন ধরিয়া বাড়ীতে তাহার আর কোন খোঁজ খবর রহিল না, স্ত্রী অন্নাভাবে মহা কষ্টে পড়িল। শেষ ৫ বৎসর পরে স্বামীর আশা ছাড়িয়া স্বামীর বড় ভাইকে আবার সে বিবাহ করিল। তাহাদের সন্তান সন্ততি হইল। এদিকে ইহার কিছুদিন পরে মাধব অনেক ধন কড়ি লইয়া দেশে আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু তখন আর তাহার ধন ভোগ করিবার কোন লোক নাই, তাহার স্ত্রী আর তাহার স্ত্রী নাই। মাধব চারিদিক শূন্য দেখিল, তাহার স্ত্রীরও কষ্টের সীমা রহিল না। কিন্তু তখন আর উপায় কি, মাধব কিছু দিন পরে আবার বিবাহ করিয়া ঘর কন্না করিতে লাগিল। ইহার অল্প দিন পরে মাধবের ভাই মরিয়া গেল। তাহার স্ত্রী (মাধবের বড় স্ত্রী) নিতান্ত দুর্দ্দশায় পড়িয়া মাধবের কাছে কাঁদিয়া পড়িল। তাহার কষ্ট দেখিয়া মাধব আর সমস্ত কথা ভুলিয়া তাহাকে আবার স্ত্রী রূপে গ্রহণ করিয়াছে। শুনিয়া বড় আশ্চর্য্য হইলাম। এতখানি উদারতা—এতখানি অকৃত্রিম মমতা একজন ভদ্র নামধারী ব্যক্তিতেও ত দুষ্প্রাপ্য। এই কথা শুনিয়া আমি ছোট স্ত্রীকে আমার কাছে জানালায় ডাকিতে বলিলাম, সে আসিয়া তাহার দুঃখ জানাইতে লাগিল, তাহার স্বামী দেখিল বেগতিক, সেও আসিয়া তাহার যন্ত্রণা নিবেদন করিতে

আরম্ভ করিল, অবশেষে দুজনেই গৃহস্বামীকে সালিসি মানিয়া বসিল। তিনি খাঁটি বিচার করিয়া দিলেন, বলিলেন—"যদি দেশে পাঠাইতে হয়—ত দু স্ত্রীকেই দেশে পাঠাও—একজনকে এখানে রাখিবে—একজনকে দেশে পাঠাইবে, সে হইতে পারে না। আর দেশে পাঠাইলেও উহাদের ভরণপোষণের জন্য তোমার অর্দ্ধেক মাহিনা প্রতিমাসে উহাদের দুজনের মধ্যে ভাগ করিয়া দাও।"

এই বিচারে সকল পক্ষই এমন সন্তুষ্ট হইল, ঝগড়াটা এমন মিটমাট হইয়া গেল,—যে দুই স্ত্রী বাড়ী যাইবে ঠিক করিয়া কেহই বাড়ী গেল না, দুজনেই স্বামীর ঘর করিতে লাগিল।

দু একদিন তাহাদের বেশ চলিল, তাহার পর আবার সেই চুলাচুলি ঝগড়াঝাঁটি, স্বামীর সঙ্গে গণ্ডগোল। মাধব সেবার দুইজনকে বিদায় না করিয়া আর নিষ্কৃতি পাইল না।

দুই স্ত্রী লইয়া মাধবের ত এইরূপ দুর্দ্দশা, ভাগের স্বামী হইয়া সে গঙ্গাযাত্রারও উপায় পাইতেছে না। স্ত্রীদেরও কষ্টের সীমা নাই, স্ত্রীরা ঝড়ের মত একবার করিয়া আসিতেছে—আবার তাড়া খাইয়া দুই দিকে দুজনে সরিয়া পড়িতেছে, অনবরত এইরূপই ঘটিতেছে। তাহাদের এই যাতায়াতের মধ্যে একটুখানি এই মজা আছে,—দুই স্ত্রীর বাপের বাড়ী এক জায়গায় নহে, অথচ একজন যদি স্বামীর কাছে আসে—অন্যজনও যেন তারে খবর পায়, দু এক দিনের মধ্যে সেও আসিয়া পড়ে। এখানে আসিবার পর প্রথম দু চারদিন দেখি সতীনে সতীনে বড় ভাব, বড় ছোটর চুল বাঁধিয়া দিতেছে, দুই জনে হাসিয়া গল্প স্বল্প করিতেছে, ছোট সারাদিনই বড়র ছেলেকে কোলে করিয়া আছে—এইরকম। কিন্তু একবার যখন ঝগড়া করিতে আরম্ভ করে তখন আর রক্ষা নাই, স্বামী মারিয়াও তাহাদের—বিশেষ বড় স্ত্রীকে থামাইতে পারে না। ছোট স্ত্রী বেচারী ভাল মানুষ,—সে জানে যে সে তাহার স্বামীর দুয়ারাণী—কাজেই অল্পেতেই চুপচাপ করিয়া যায়, বড় মনে জানে যে স্বামী তাহার, সুতরাং মনের জোরে গলাটা তাহার কাজেই দ্বিগুণ হইয়া পড়ে। তাহাদের এই ঝগড়াঝাঁটি আমাদের শুদ্ধ এমন বিরক্ত করিয়া তোলে যে ইচ্ছা করে বঙ্কিমবাবুর দেবী চৌধুরাণীর আদর্শটা তাহাদের চোখের সম্মুখে ধরিয়া সতীনে সতীনে কিরূপ ভাব করিতে হয় শিখাই। দুঃখের মধ্যে তাহা তাহারা বুঝিবে না। চৌকিদারের এই কষ্টে সকলেরই তাহার উপর সহানুভূতি, কিন্তু ইহাতে যে তাহার কষ্ট কতদূর নিবারিত হয় তাহা বলিতে পারি না।

ছোট জাত বলিয়া নহে, ক্ষত্রিয়ের মধ্যেও এ দেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। কেবল বিধবা বিবাহ নয়, বিধবারা স্বামীর ভাইকে অনায়াসে বিবাহ করিতে পারে। আমাদের যে ক্ষত্রিয় চাকর আছে তাহার বড় ছেলে মরিয়া গেলে তাহার সেই বিধবা পুত্রবধূকে তাহার মেঝ ছেলে বিবাহ করিতে চাহিল। কিন্তু বধূ তাহাতে কোনমতেই সম্মত হইল না, পুত্র তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিতে গেল। কিন্তু শ্বশুর ন্যায়ের পক্ষ হইয়া বধূকে তাড়াইতে দিল না, তখন পুত্র রাগ করিয়া নিজেই বাপের বাড়ী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। সেই বধূ কিছুদিন পরে অন্য একজনকে বিবাহ করিল, তাহার সন্তানাদি হইল, তাহার পর আবার বিধবা হইয়া কষ্টে পড়িয়া পূর্ব্ব শ্বশুরের নিকট আসিয়া আশ্রয় প্রার্থনা

করিল। বৃদ্ধের ছেলেরা সকলেই তাহাতে নারাজ কিন্তু বৃদ্ধ নিরাশ্রয় পুত্রবধূকে আবার আশ্রয় দান করিয়াছে। ক্ষত্রিয় জাতির এত অবনতি সত্ত্বেও উহাদের মধ্যে এখনো কতদূর উদারতা আছে তাহা এই ঘটনাটি হইতে দেখা যায়। ক্ষত্রিয়দের আরও দুই একটি বিশেষ গুণ দেখিলাম, তাহারা বড় বিশ্বাসী, আর তাহারা মদ আদপে স্পর্শ করে না, মাছ মাংসের ত কথাই নাই। ক্ষত্রিয়দের যে মদ্যপান করিতে নাই, তাহা জানিতাম না, বামুনরা এ দেশে নাকি আবার তামাক পর্য্যন্ত খায় না। কিন্তু ইহা শুনিয়া আমার একটু গোল বাধিয়াছে। কলিকাতায় পশ্চিম হইতে যে ব্রাহ্মণেরা আসিয়া দ্বারবান হয়—তাহারা ত খুব তামাক খায়। বামুনদের ভিতর এদেশেও বিধবা বিবাহ নাই। বোধ করি ক্ষত্রিয় ছাড়া—এদেশের অন্য উচ্চ জাতির মধ্যেও বিধবা বিবাহ নাই।

এ দেশের ভদ্রলোকের পরিবারের মধ্যে জানানা নিয়ম বড় কড়াক্কড় —বঙ্গের মত নয়। এই সকল দেশই কি না মুসলমানদের প্রধান আড্ডাস্থান ছিল। এখানকার একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি—কুমার সিংহের স্ত্রী আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, আমিও প্রতি-সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। কুমার বিলাত প্রত্যাগত একজন ব্যারিষ্টার। তিনি তাঁর স্ত্রীকে শিক্ষিত করিয়া সমাজে (ইংরাজ সমাজে) মিশাইতে চাহেন, তাই একজন মেম রাখিয়া তাহাকে শিক্ষা দিতেছেন। শিক্ষাটা শেষ হইলেই সমাজে আনিবেন বলেন,—কিন্তু কবে শেষ হইবে—তাহাই কিছু সমস্যা; এখনো তিনি এত দূর পরদানশীন যে ব্যাম হইলে ডাক্তারও তাঁহার মুখ দেখিতে পায় না। পরদার ভিতর হইতে তিনি ডাক্তারকে হাত বাড়াইয়া দেন, তবে ইংরাজ ডাক্তার হইলে তাহার সহিত দেখা করেন। কুমারিণীর নিকট তাহাদের সামাজিক আচার ব্যবহারের অনেক কথা শুনিলাম। অনেকটা আমাদেরই মতন, দু এক স্থলে কিছু বিভিন্ন। তাঁহাদের বিবাহ যদিও বাল্যকালে হয়, কিন্তু আমাদের কলিকাতার পদ্ধতি অপেক্ষা এ সম্বন্ধে তাঁহাদের নিয়ম অনেক ভাল। বয়স্থা না হইলে বিবাহিত হইয়াও কন্যা শ্বশুরগৃহে আসে না।

এ দেশের কি ভদ্র—কি ছোটলোক সর্ব্বসাধারণের মধ্যে—স্ত্রীলোকদের নৃত্যগীতটা বিশেষ প্রচলিত, সকলের ঘরে ঘরে ঢোলক থাকিবেই, আমাদের একজন বন্ধুর বাড়ী একজন ব্রাহ্মণ ভৃত্য আছে, তাহার নব বিবাহিত পুত্রবধূ নাচিতে জানে শুনিয়া শ্বশুর মহা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে ঘুঙ্গুর গড়াইয়া দিয়াছে। আমাদের দেশে একথাটা কিরূপ শোনায়? কেবল এ দেশ বলিয়া নয়—ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই প্রায়—মেয়েদের গান বাজনাটা একটা দস্তুরের মধ্যে দেখিতে পাই--কেবল বঙ্গদেশেই ইহা দোষের মধ্যে পরিগণিত। কেন যে আর্য্য দেশে—এরূপ অনার্য্য অস্বাভাবিক প্রথা চলিত হইল তাহা ত বুঝিতে পারি না।—কেহ কি বলিতে পারেন?

শুনিতে পাই, এ দেশে ৩/৪শ ঘর পরিবারওয়ালা ভদ্র বাঙ্গালী বাসেন্দা আছে। কিন্তু আমার সহিত এদেশে বেশী মেয়ের যে আলাপ হইয়াছে তাহা নহে। এখানে আমার যে একটি পুরাতন বন্ধু আছেন—তাঁদের বাড়ীতে নূতন দু একজনের সঙ্গে আলাপ হইয়াছে—তাহা ছাড়া আর একটিমাত্র পরিবারের সঙ্গে আমার এবার বিশেষ সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছে। আমি যে পুরাতন বন্ধুর কথা বলিতেছি—তাঁহার সহিত আমার অনেক দিনের বন্ধুতা, যখন প্রথম- বার

এদেশে আসি—তখনই তাঁহাকে প্রথম দেখি, সেই প্রথম দেখাতেই (তাঁহার কথা জানি না) আমি ভালবাসিতে আরম্ভ করি। প্রথম হইতেই তাঁহার সেই মিষ্টি মুখখানির মিষ্টি হাসি—আর দুষ্টুমি পোরা—আরো মিষ্টি কথাগুলি আমাকে বশ করিয়াছিল। তিনি বলিয়া নহেন, আমার যত বন্ধু হইয়াছে প্রায়ই প্রথম সাক্ষাতে। এবার যাঁহার কথা বলিতেছি তাঁহার সম্বন্ধেও ঐরূপ। ইনি একজন সুশিক্ষিত মহিলা, ইহাঁর পিতা স্ত্রীলোকের লেখাপড়া শিক্ষার দিকে বিশেষ মনোযোগী (তাই বলিয়া ইনি ব্রাহ্ম বা বিলাত ফেরত নহেন), শিক্ষায় ইহাঁর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য কিরূপ ফুটিয়াছে, ইহাঁর স্বাভাবিক বিনয়ী ভাব—অমায়িকতা প্রভৃতি গুণ কিরূপ মধুরতর রূপ ধরিয়াছে তাহা ইহাঁকে না দেখিলে বুঝা যায় না। আমার ইচ্ছা করে স্ত্রীশিক্ষার বিপক্ষ লোকদিগকে একবার ইহাঁকে দেখাই। ক্ষেত্র ভাল হইলে কর্ষণে কিরূপ উৎকর্ষ লাভ করে তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিতে পারেন।

এক এক বিষয়ে আমাদের দেশের লোকদিগের এক একটা অদ্ভুত রকম কথা শুনিলে অবাক হইতে হয়। লেখাপড়া জানেন, এমন মহিলাগণের যদি তাঁহারা কোনরূপ একটু আদটু দোষ দেখিতে পান ত সে দোষটা সবই লেখাপড়ার ঘাড়ে চাপাইয়া বসেন। এরূপ যুক্তি দেখিলে হাসি আসে।

যদি লেখাপড়া শিখিলেই লোকে নির্দ্দোষ হইত তাহা হইলে আজকালকার ইয়ুনিভর্সিটির বিএ এমেরা সকলেই ত দেবতা হইয়া যাইত। আসল কথা স্বভাব। যদি স্বভাব ভাল হয়—ত তাহার উপর শিক্ষা সুফল দিতে পারে, লেখাপড়া না শিখিয়াও যে শত সহস্র দোষ রহিয়াছে, সেটা কি কেহ দেখিতেছেন না? বরঞ্চ তেমন তেমন শিক্ষা হইলে স্বভাবও কিছু ভাল হইতে পারে। আমার বন্ধুর বাপের মত যদি সকলেই মেয়েদের এইরূপ শিক্ষা দিতেন কি ভাল হইত। ইহাঁদের বাড়ীতে ইহাঁর একটি সমবয়সী ভাজ আর ইহাঁর মা ও মাসী আছেন। ভাজটি যদিও ননদের মত লেখাপড়া জানেন না তবু স্বভাব ইহাঁরও বড় সুন্দর। ইহাঁরা সকলেই বড় অমায়িক। সেইজন্য ইহাঁদের পরিবার একটি সুখী পরিবার। ইহাঁদের মত সুখী পরিবার ত আমি বাঙ্গালী ঘরে কম দেখিয়াছি। যেদিন তাঁহারা এখানে আসেন—সেদিন বাঙ্গলাটা আনন্দে যেন ভরপূর হইয়া উঠে। গৃহিণীদের সেই সরল স্নেহপূর্ণ ভাব, আর বৌটি ও মেয়েটির আনন্দপূর্ণ হাসি, ভালবাসার উচ্ছ্বাস, বিশেষ মেয়েটির প্রাণ ঢালা বিশ্বাস ও বন্ধুত্ব আমার স্মৃতিটা পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, যখন এখান হইতে চলিয়া যাইব—তখন হয়ত এখানে আর যাহা দেখিলাম কালে তাহা মন হইতে মুছিয়া যাইবে—কিন্তু আমার পুরাতন বন্ধু ও নূতন বন্ধুগুলির ভালবাসার যে স্মৃতি লইয়া যাইতেছি তাহা আর মুছিবে না।

৩

মুসলমানদের এলাহাবাদ অর্থাৎ আল্লার স্থান আর আমাদের পুণ্যতীর্থ প্রয়াগ—এখানে আসিয়া পবিত্র গঙ্গা যমুনার সঙ্গমে স্নান করিয়া কত পাপী তাপী তরিয়া গেল, অধম আমার কিছুই

হইল না, আমি যে পাপের বোঝা সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলাম—তাহা যেমন তেমনি রহিয়া গেল, এখানে আসিয়া অবধি আমার একদিন গঙ্গাস্নান হয় নাই। এই শীতের দেশ, ভোরে উঠিয়া গঙ্গাস্নানের কথা মনে করিতে গেলেও গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে,—তবু না হয় একদিন কষ্টেশ্রেষ্ঠে তাহাও করিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু শুনিলাম পাণ্ডাদের কিছু কিছু দিয়া মাথা না মুড়াইতে পারিলে শুধু গঙ্গাস্নানের ফল হয় না। তা প্রথমটিতে আমার আপত্তি ছিল না, দ্বিতীয় কথাটি শুনিয়া অবধি এমনি আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে যে সেইদিন হইতে এই সহজ পুণ্যলাভের আশাটা একেবারেই ছাড়িয়া বিজ্ঞ দার্শনিক হইয়া মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছি—এত সহজে পাপমুক্ত হইয়া তৃপ্তি নাই। কর্ম্ম দ্বারাই কর্ম্মকে জয় করা উচিত। যা হউক, তাই বলিয়া পুণ্যসঞ্চয়ের অন্য কোন সহজ উপায় পাইলে আমি যে ছাড়িয়া কথা কই তা নয়,—মাথা না মুড়াইয়া আর এই শীতের সময় গঙ্গাস্নান না করিয়া শুধু স্থানদর্শন দ্বারা যতদূর পুণ্যলাভ করা যাইতে পারে তাহার বড় বাকী রাখি নাই, এখানে দেখিবার মত যাহা আছে সকলি প্রায়দেখিয়া লইয়াছি।

প্রয়াগের প্রধান মাহাত্ম্য ত্রিবেণী-সঙ্গমে, গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর পুণ্য মিলন-স্থলে। এখান হইতে সরস্বতী যদিও অনেকদিন অন্তর্ধান করিয়াছেন (পাণ্ডারা বলে অন্তঃশীলা বহিতেছেন) কিন্তু গঙ্গা যমুনার যুগলরূপ এখানে আসিয়া যিনি না দেখেন তাঁর আসাই মিথ্যা। আমরা নৌকা করিয়া একদিন এই সঙ্গম দেখিতে গিয়াছিলাম। যমুনার কালজলে নৌকা ভাসিল, —যমুনাপুলের জল-প্রোথিত প্রকাণ্ড স্তম্ভের মধ্য দিয়া তরতর বেগে নৌকা দুর্গ প্রাকারের নিকটে আসিয়া পড়িল। এই দুর্গ আকবর সাহ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, ইংরাজেরা এখন ভোগ দখল করিতেছেন। একদিন দুর্গের সিংহাসন-আকারে গঠিত বারাণ্ডার উপর বসিয়া মোগল সম্রাট যখন গর্ব্বভরে চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন—তখন তিনি জানিতেন না পেন্টুলুনের মধ্যে কামিজ কসা, রাঙ্গামুখওয়ালা, সমুদ্রপারের সামান্য সৈনিক বাচ্ছারা একদিন সেই বারান্দায় দাঁড়াইয়া সমান দর্পভরে দূরবীনের ভিতর দিয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করিবে। এ জ্ঞানটা সেদিন আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল।

কি প্রকাণ্ড দুর্গ! ইহার গঠনই বা কি মজবুত! দুর্গের পশ্চিম দিকের প্রাকারভিত্তি ঠিক জলের উপর হইতে উঠিয়াছে, কত শতাব্দীর বর্ষার ভীম তোড় ইহার উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে, তবু দুর্গ এখনো অটল-পাষাণের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে, ভবিষ্যতের শত সহস্র বৎসরের অত্যাচারকে পায়ে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিবার জন্য ভীমদর্পে অপেক্ষা করিতেছে। কি মসলায় গঠিত হইয়া দুর্গের গাঁথনি এত কঠিন হইয়াছে, অনেক চেষ্টা করিয়াও ইংরাজেরা তাহা এখনো আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। নদীর ধারে দুর্গ প্রাকারের এক স্থানে ইহাঁদের আমলে একটু ফাঁটিয়া যায়, ইহাঁরা তাহা যতবার মেরামত করিতেছেন, ততবারই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, কিছুতেই ঠিক দুর্গের অন্য স্থানের মত ইহা মজবুত করিতে পারিতেছেন না। যমুনার তীরে দুর্গের ঠিক নীচে একটি ধ্বজা পোঁতা দেখিলাম, এই ধ্বজা-নিম্নস্থ কূপেই নাকি এখন সরস্বতী বিরাজিত—তাই ইহার নাম সরস্বতী কূপ। মাঝিরা বলিল উপর হইতে দাঁড়াইয়া দেখিলে কূপের জল

দুধের মত শাদা দেখায়। এই কূপে পাণ্ডাদের বিলক্ষণ উপায় হয়। দেখিতে দেখিতে গঙ্গায় আসিয়া পড়িলাম। পূর্ব্বে যমুনার মত গঙ্গাও দুর্গের গা ঘেঁসিয়া বহিত। এদেশের একটা প্রবাদই আছে,

দরিয়াবাদ দরিয়া কিনারে, ফরিয়াবাদ নিশানী,
আকবর যো কিল্লা বানায়া, ত্রিবেণীকা পাণী।

এখন গঙ্গা একটু সরিয়া পড়িয়াছে, তবে বর্ষাকালে অবশ্য এখনো গঙ্গা দুর্গের ভিত্তিতে আসিয়া লাগে। গঙ্গা যমুনার মিলনস্থানে জলের কি তোড়! দুইটা প্রকাণ্ড জলরাশি একটার উপরে একটা ঝাঁপাই ঝুড়িতে ঝুড়িতে অবশেষে এক হইয়া প্রশান্ত ভাবে সরিয়া পড়িয়া সমুদ্রপানে চলিয়াছে, দুই সতীনে কে স্বামীর কাছে আগে পৌঁছিবে—এই বিবাদে উন্মত্ত হইয়া যেন একজনকে একজন ভীমবেগে ছাড়াইয়া চলিতে চাহিতেছে। ঠিক, সঙ্গমস্থানটি দেখিলে কৃষ্ণের মোহিনী মূর্ত্তি মনে পড়ে। আধো কাল আধো শাদা আধো জটা আধো চিকুর, এই আধ আধ রূপে যেন দিক ভরিয়া গিয়াছে। আধো আধো মিশিয়া এক হইয়া গিয়াও দাম্পত্য প্রেমের মিলনের মত গঙ্গা যমুনার স্বাতন্ত্র্য লোপ হয় নাই।

এখানে নৌকার উপর হইতে গঙ্গার দুই পারের দৃশ্য সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। আমাদের ডানদিকে (এলাহাবাদের পরপারে) গঙ্গার উপরে খানিকটা লইয়া এবড়ো খেবড়ো উঁচুনীচু পাহাড়ময় স্থান, ইহার নাম ঝুসি—ইহার কোন অংশে কোন কেল্লার ভগ্নাংশ (শোনা যায় এপারে ৪টা কেল্লা ছিল), কোন স্থানে বা কয়েকটা কুঁড়েঘর—কোথায় বা গাছপালার মধ্যে একটা সামান্য মন্দির, আর পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চশিখরে তীরোত্থিত সিঁড়ি সংযুক্ত একটি ক্ষুদ্র ইটের দোতালা বাড়ী অতি দূর হইতে লোকের নজরে পড়িতেছে। (এখানে একজন পরমহংস বাস করেন—এখানকার লোকেদের তাঁহার প্রতি পরম ভক্তি, আমরা তাঁহার কাছে দুই তিনবার গিয়াছিলাম।) এই পাহাড়ময় স্থান খানিকদূর গিয়া সমতল হরিৎক্ষেত্রে শেষ হইয়াছে, শ্যামশস্যপূর্ণ এই সমক্ষেত্রতীর আবার আমাদের পশ্চাতে যমুনার তীরের সহিত গিয়া মিশিয়াছে।প্রকৃতির সৌন্দর্য্যপূর্ণ গঙ্গার এই তীরদেশ দেখিলে সুখ দুঃখে উদাসীন নিষ্কাম সন্ন্যাসীর গম্ভীর মূর্ত্তি মনে পড়ে, আর আমাদের বামদিকের বেণীঘাটের প্রতি চাহিলে তাহাতে লোভ কলহময় একটি সংসার মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।এই বৃহৎ ঘাটতীর লোকে লোকে নিশানে নিশানে একাকার। (ভিন্ন ভিন্ন নিশান দেখিয়া লোকে নিজের নিজের পাণ্ডা ঠিক করিয়া লয়) সেই নিশানের মাঝে মাঝে ও গঙ্গার জলময় কূলে কূলে,—সারি সারি তক্তাপাতা। গঙ্গাস্নান করিয়া কেহ বা তক্তার উপর বসিয়া ফোঁটা কাটিতেছে, কেহ কাপড় ছাড়িতেছে, কেহ পূজা আহ্নিক করিতেছে, কেহ বা তক্তাতে বসিয়া নীচের জল তুলিয়া তুলিয়া স্নান করিতেছে, আর গঙ্গার জলে ত সারবন্দী লোকের কথাই নাই। গঙ্গার ঠিক ধারে—এমন কি ঠিক বা জলের উপরও মাঝে মাঝে এক একখানা অস্থায়ী বন্দবস্তের সামান্য রকম আটচালা দেখা যাইতেছে, শোনা গেল তাহার একখানিতে সেরাজপুরের রাণী মকদ্দমা করিতে আসিয়া কল্পবাস করিতেছেন।

তীরে নানা রকমের দোকান। নিশানের মাঝে মাঝে এক একটা বড় বড় তালপাতার ছাতির নীচে পাণ্ডারা এক একটা মাটির ঢিবি, পাথরের ঢিবিকে রংচঙ্গে কাপড় পড়াইয়া ঠাকুর সাজাইয়া দোকান পাতিয়া বসিয়াছে। যাত্রীদের এই সকল মূর্ত্তিকেই দক্ষিণা দিয়া যাইতে হয়। ইহা ছাড়া সত্যকার দোকানঘর দেবদেবীর মূর্ত্তিরও এখানে অভাব নাই। যখন বর্ষাকালে এই তীর ডুবিয়া যায় তখন পাণ্ডারা উপরে ফোর্টে যাইবার উঁচু রাস্তার ধারে সমস্ত দোকান তুলিয়া আনে। বর্ষাকালে ঠিক এই রাস্তার নীচে পর্য্যন্ত জল আসে। এখন গঙ্গা এই রাস্তা হইতে কত দূরে পড়িয়াছে। এখন এই রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া দেখ, তোমার সম্মুখে নীচে সুদূর প্রসারিত বালির চড়া ধূ ধূ করিতেছে, সেই বিশাল চড়ার এক পাশে অতি দূরে একটা সূক্ষ্ম রেখার মত গঙ্গা আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়া যমুনার সহিত মিশিয়াছে। এই সরু গঙ্গা দেখিলে তাহাকে গঙ্গা মনে হয় না, সে যেন গঙ্গার একখানি ছায়া, আর তাহার চারিদিকের সমস্ত দৃশ্যটা যেন একটা স্বপ্ন-দৃশ্য। কে জানে নৌকার উপর অপেক্ষা এই উঁচু রাস্তার উপর হইতে গঙ্গার এই দৃশ্যটা যেন আমার বেশী ভাল লাগে।

এই রাস্তার ধারে একটা গাছের তলায় একজন বৃদ্ধ জৈন বসিয়া আছেন। এইখানে বেড়াইতে আসিয়া আমরা দুই দিন তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। তিনি অন্ধ, গাত্রে কোন বস্ত্র নাই, পরণে নেংটিমাত্র, তাঁহার দাড়ি বুকে আসিয়া পড়িয়াছে। দুই দিনই দেখিলাম —তিনি বিজির বিজির করিয়া মালা জপিতেছেন। আমরা কথা কহিলাম —তিনি বুঝিতে পারিলেন না, চেলাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেহ আসিয়াছে কি?" তাহারা বলিল, "হাঁ।" আমরা চেলাদের দিয়া তাঁহাকে দু-এক কথা কি প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু বৃদ্ধের তাহা ইন্দ্রিয়গম্য হইল না, তিনি অন্যরূপ উত্তর দিতে লাগিলেন, চেলারা হাসিতে লাগিল। বৃদ্ধের নাম সুরদাস—শুনিলাম অনেকদিন হইতে দিন রাত্র নাই, শীত রৌদ্র নাই, সমানে এই স্থানে বসিয়া আছেন। গবর্ণমেন্টের রেকর্ডেই পাওয়া যায়—তিনি ৫৫ বৎসর কাল এইরূপে বসিয়া আছেন, অনেকে বলেন —আরো বেশী দিন হইতে তিনি এইখানে বসিয়া আছেন। কি অসীম ধৈর্য্য! আগে আগে নাকি রাত্র দুইটার সময় একবার করিয়া তিনি হাঁটিয়া গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন—এখন এমন শক্তিহীন—যে চেলারা তুলিয়া না লইয়া গেলে তিনি আর নড়িতে পারেন না। ইনি কাহারো নিকট ভিক্ষা করেন না, ইচ্ছা করিয়া যে যাহা দেয়। শুনিলাম এখন ইহাঁর এত টাকা জমিয়াছে—যে ইহাঁর নামে এলাহাবাদে একটী ব্যাঙ্ক চলিতেছে, পরে তাঁহার চেলারাই তাঁহার বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবে।

ত্রিবেণীসঙ্গম দেখিয়া আমরা অক্ষয়বট দেখিতে এই রাস্তা দিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলাম। দুর্গ-সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিয়া যখন শস্ত্রধারী প্রহরীদের নিকট দিয়া দুর্গদ্বার অতিক্রম করিতে লাগিলাম—গা'টা যেন ঝমঝম করিয়া উঠিতে লাগিল।

এই দুর্গ নির্ম্মাণ কৌশল—আর কলিকাতার দুর্গ নির্ম্মাণ কৌশল শুনিলাম এক, এই দুর্গ দেখিয়াই নাকি ইংরাজেরা সেই ধরণে কলিকাতার দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। দুর্গের একেবারে ভিতরে প্রবেশ করিতে হইলে একে একে চারিটি প্রকাণ্ড দ্বার অতিক্রম করিতে হয়। প্রতি

দ্বারেই শস্ত্রধারী প্রহরী, এক দ্বার অতিক্রম করিয়া আর একটি দ্বার পর্য্যন্ত স্থান যেন সৈনিকপূর্ণ গোলা-কামানপূর্ণ এক একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। দুর্গের পয়ঃপ্রণালীর এমনি বন্দবস্ত যে ইচ্ছামাত্র দুর্গদ্বারের নিম্নের দুই পার্শ্বের স্থান একেবারে জলময় করিয়া তোলা যায়, —শত্রু আসিতে হইলে প্রথমতঃ সেই জল পার হইয়া দুর্গবাসীদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তবে দ্বারে প্রবেশ করিতে পাইবে। সচরাচর সকলে দুর্গের তৃতীয় দ্বারের ভিতর পর্য্যন্ত যাইতে পারে —আমরাও তিনটি দ্বার পার হইলাম, দেখিলাম—প্রথম দ্বিতীয় দ্বারে দেশী সৈন্য, তৃতীয় দ্বারে ইংরাজ সৈন্য পাহারায় নিযুক্ত। যদি মরিতে হয় আগে আমাদের দেশের লোকগুলা—যা শত্রু পরে পরে। পাশ না থাকিলে চতুর্থ দ্বার অতিক্রম করিয়া কেহ আসল দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। এখানে আর কি অস্ত্রাগার প্রভৃতি আছে। আমাদের পাশ ছিল না—আমাদেরও ইহার মধ্যে যাওয়া হইল না। কিন্তু এবার না হউক—আর একবার আমরা পাশ লইয়া অস্ত্রাগার দেখিতে গিয়াছিলাম। সে কি কাণ্ড ! ঘরের চারিদিকে কতরকম করিয়া বন্দুক সাজান, দেয়ালে দেয়ালে বর্শা তরবার সঙ্গীন ঝকঝক করিতেছে—যেদিকে চাই —চোক যেন ঝলসিয়া যায়। যাক —আমরা তৃতীয় দ্বার পার হইয়াই সম্মুখের বাগানে অশোক স্তম্ভ দেখিলাম। স্তম্ভ প্রতিষ্ঠার সময় প্রভৃতি পালিভাষায় স্তম্ভের গায়ে লেখা আছে। এদেশে ছোটলোকেরা ইহাকে ভীমের গদা বলে। এ গদা দেখিয়া ভীমকে কল্পনা করা সহজ কথা নহে। এই স্তম্ভ ছাড়াইয়া কিছু দূরেই অক্ষয়বটের সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গের কাছে আমাদের গাড়ী আসিয়া থামিল—আমরা কয়জনে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিলাম। নামিবামাত্র অন্ধকারে চ'খে যেন ধাঁদাঁ লাগিয়া গেল— একজন পাণ্ডা আলো হাতে লইয়া আমাদের পথ দেখাইয়া চলিল। সিঁড়ি হইতে নামিয়াই সুড়ঙ্গের এক পাশে—আমাদের সম্মুখে একটি প্রস্তর মূর্ত্তি, তাহা দেখাইয়া পাণ্ডা বলিল—'ইহা প্রয়াগের ত্রিবেণীমাধবের মূর্ত্তি।" যেখানে এখন এই দুর্গ দেখিতেছ, এই দুর্গ নির্ম্মাণের আগে এ স্থান গঙ্গার জলে পূর্ণ ছিল, আকবর তাহা দেখিয়া ত্রিবেণীমাধবের কাছে আসিয়া এই বর প্রার্থনা করিলেন—যে ৫০০ বৎসরের জন্য গঙ্গা কিছু সরিয়া যাউন"—বেণীমাধবজি তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "৫০০ বৎসর কেন, আমি গঙ্গা লইয়া হাজার হাজার বৎসরের জন্য এখান হইতে হটিয়া যাইতেছি—তুমি এই স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ কর।"

গল্প শুনিতে শুনিতে সুড়ঙ্গটা দেখিয়া লইলাম, সুড়ঙ্গটা উচ্চে দেড় মানুষ আন্দাজ, প্রস্থে পাশাপাশি বোধ হয়—২।৩ জন লোক একসঙ্গে চলিতে পারে আর দৈর্ঘ্যে আন্দাজ ২৫।৩০ হাত মনে হইল। সুড়ঙ্গের দুই পাশের দুই দেয়ালে অনেক কোলঙ্গা, এক এক কোলঙ্গায় এক এক দেবতামূর্ত্তি; মূর্ত্তিগুলি সবই প্রায় পাথরের—তাহার কোনটারই না আছে ছাদ, না আছে শ্রী, সবই নিতান্ত অদ্ভুত রকমের। কোলঙ্গাস্থিত দেবতাগুলির নাম বলিতে বলিতে পাণ্ডা আমাদের পথ দেখাইয়া চলিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে একটি কোলঙ্গায় রাম লক্ষ্মণের মূর্ত্তির কাছে প্রস্তর খোদিত আলাদা একখানি পা দেখিলাম। শুনিলাম, উহা ভগবানের শ্রীচরণ —বিনা আয়াসে আশার অতীত ফল-লাভ করিলাম—ভগবানের চরণ দর্শন ঘটিল—দুঃখের মধ্যে তাহাতে সশরীরে স্বর্গলাভ ঘটিল না। পাণ্ডা বলিল, রামচন্দ্র বনে যাইবার সময় যখন

প্রয়াগ হইয়া যান, তখন এই পদাঙ্ক রাখিয়া গিয়াছেন। পাণ্ডার সে কথা শুনিয়া আমাদের সঙ্গের একজন এ দেশী হিন্দু চাকরের মনে এতটা ভাবোদয় হইল—যে, সে ওহো ওহো করিয়া উঠিল—চোখে জল আসিয়াছিল কি না সেটা ঠিক দেখিতে পাই নাই। অক্ষয়বটের কাছাকাছি আসিয়া সুড়ঙ্গের মেজেতে কয়েকটি শিব স্থাপনা দেখিলাম—একটা শিবের পাথর খানিকটা ভাঙ্গিয়া গেছে। পাণ্ডা বলিল, আরঞ্জীব ইহা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন—ভাঙ্গিবামাত্র রক্তে সুড়ঙ্গ ভাসিয়া গিয়াছিল। আরঞ্জীব কি রূপ অত্যাচারী ছিলেন, কত হিন্দু দেব-দেবী নষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাও সে গল্প করিতে লাগিল। কথা কহিতে কহিতে আমরা সুড়ঙ্গের প্রায় শেষভাগে আসিয়া বটবৃক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইলাম। যাহা দেখিলাম, আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। সেই রৌদ্রহীন বায়ুহীন নিরালোক বদ্ধ প্রদেশে দু একটি নবীন পাতা মুঞ্জরিত একটি ছিন্নমস্তা জীবন্ত বৃক্ষ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম।

গাছের প্রধান যে গুঁড়ি তাহা মাটি হইতে আন্দাজ আধ হাত ঊর্দ্ধে উঠিয়া সেখান হইতে অপেক্ষাকৃত দুইটা ছোট গুঁড়িতে ভাগ হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। অর্থাৎ প্রধান গুঁড়ির দুইদিক হইতে দুইটা মোটা মোটা গুঁড়ির মত ডাল উঠিয়া গুহার ছাতের কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে। গাছ সুড়ঙ্গের মাথা স্পর্শ করিবে ভয়ে—গুঁড়ির ছাদমুখী আগা দুইটি একেবারে কাটা। সুতরাং এই গাছের চেহারা মাটিতে পোঁতা একগাছা মাথা কাটা খোলা রান্নার বেড়ীর মত। প্রধান গুঁড়ির দুই পাশে দুই জায়গায় এক একটি নিতান্ত ছোট সরু ডাল বাহির হইয়াছে, সেই ডালে কাঁচা কাঁচা দুই চারিটি পাতা, তাহা ছাড়া সমস্ত গাছে একটি ডাল নাই, একটি পাতা নাই, বেড়ীর ডাণ্ডার মত সেই মোটা মোটা গুঁড়ি দুইটিই এই গাছের সর্ব্বস্ব। এই গুঁড়ি দুইটি গাঁটে গাঁটে ভরা—সেই গাঁটগুলি দেখিতে কাঁচা কাঁচা, মনে হয় উহা হইতে যেন কিছুদিন পরে নূতন পাতা বাহির হইবে। কিন্তু শুনিলাম—নূতন পাতা এ-গাছে কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক দিনের পর এবার নূতন পাতা দুই একটি বাহির হইয়াছে, আবার অল্পদিনের মধ্যে শুকাইয়া যাইবে। ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, বিনা বাতাসে বিনা আলোকে গাছটি বাঁচিয়া আছে ইহাই আশ্চর্য্য। এই গুহা অক্ষয়বটের জীবন্ত সমাধি। পৃথিবীতে শুনিয়াছি সাতটি আশ্চর্য্য সামগ্রী আছে, আমার ত মনে হইল এই অক্ষয়বটকে আর একটি আশ্চর্য্য বলিয়া গণ্য করা উচিত।

এ গাছটি কতকালের কেহ বলিতে পারিল না—আমাদের পথ প্রদর্শক পাণ্ডা বলিল, ‘ইহা সৃষ্টির প্রথমে জন্মিয়াছে। আবার যখন প্রলয়কালে পৃথিবী জলমগ্ন হইবে তখন এই গাছ হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তিনটি পাতা উৎপন্ন হইয়া সেই জল ঢাকিয়া দিবে—আর সেই তিনটি পাতাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আবার জন্মগ্রহণ করিয়া পুনসৃষ্টি করিবেন।” পাণ্ডাটি দেখিলাম গল্পের ভাণ্ডার, যা জিজ্ঞাসা কর উত্তর মুখে লাগিয়া আছে, তা সে উত্তর তুমি ঠিক-অঠিক যা মনে করিয়া লও তাহাতে তার কিছুই আপত্তি নাই। অক্ষয়বটের পর অল্পদূর গিয়া সুড়ঙ্গের শেষ, শেষটা একেবারে বন্ধ নহে, একজন মানুষ যাইতে পারে এইরূপ ফাঁক আছে। পাণ্ডা বলিল এই সুড়ঙ্গ বরাবর কাশী পর্য্যন্ত গিয়াছে। পাণ্ডার কাছে আকবরের জন্মের একটি বড়

মজার গল্প শুনিলাম। অক্ষয়বটের কাছাকাছি সুড়ঙ্গের মেজের এক জায়গায় একটু খোঁড়া খোঁড়া গর্তের মত আছে, পাণ্ডা তাহা দেখাইয়া বলিলেন, "এইখানে বালমুকুন্দ নামে একজন ব্রহ্মচারী বসিয়া ধ্যান করিতেন, একদিন তাঁর শিষ্যেরা তাঁহাকে যে দুধ পান করিতে দিয়াছিল তাহাতে একগাছি গরুর লোম ছিল, সেই লোম মুখে পড়িবামাত্র ব্রহ্মচারী বলিলেন—হা শিষ্যগণ কি করিলে—আমাকে এমন পাপলিপ্ত করিলে! এই বলিয়াই তিনি তখনি তনুত্যাগ করিলেন, আর সেই পাপে মুসলমানের ঘরে আকবর বাদশারূপে জন্মগ্রহণ করিলেন।" আকবরের প্রতি দেশের লোক কিরূপ সন্তুষ্ট ইহা হইতে বুঝা যায়। আকববের এবং তাঁহার মন্ত্রী বীরবলের প্রশংসা এদেশের লোকের মুখে ধরে না। পাণ্ডা বলিল আকবরই অক্ষয়বটের এই সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া দেন, আর মন্ত্রী বীরবল এই সুড়ঙ্গ স্বর্ণনির্ম্মিত করিতে গিয়াছিলেন—শেষে তাহাতে দস্যু উপদ্রব হইবে ভাবিয়া তাহা করেন নাই। এত গল্প করিয়াও তবু সেদিন পাণ্ডার অনেক গল্প বাকী রহিয়া গেল, তাই পরদিন তাহাকে আমাদের বাড়ী আসিতে বলিলাম। সেদিন আসিয়া ইংরাজ গবর্ণমেন্টের হাতে পড়িয়া তাহাদের আয়-পসার কিরূপ কমিয়াছে সেই দুঃখই সে বেশী করিল; যাহা বলিল তাহার মর্ম্ম এই,—

ইংরাজদের ইচ্ছা নয় যে পাণ্ডারা ফোর্টে থাকিতে পায়, তাহাদের উঠাইবার জন্য তাহারা কত চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু আকবরের পরোয়ানার জোরে তাহারা বাঁচিয়া গেছে, আকবর দুর্গ নির্ম্মাণের সময় পাণ্ডাদের এইরূপ পরোয়ানা দিয়াছেন যে "তাহারা বংশানুক্রমে এই দুর্গ-মধ্যে থাকিয়া এই বৃক্ষের আয় ভোগ দখল করিবে—এখান হইতে অন্য কোন রাজা তাহাদিগকে উঠাইতে পারিবে না।" ইংরাজেরা এ মকদ্দমায় পরাজিত হইল বটে কিন্তু রবিবার দিন যাত্রীদের এখানে আসা বন্ধ করিল, পাণ্ডাদের তাহাতে বিলক্ষণ ক্ষতি, তাহারা অনেক হেঙ্গাম করিয়া প্রয়াগবাসী বরদার ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী দিনকর রাওকে ধরিয়া গভর্ণর জেনেরেলের কাছ হইতে ২/৩ বৎসব মাত্র সে নিয়ম রহিত করিবার হুকুম আনাইয়াছে।[৪] কিন্তু তাহাদের সম্পূর্ণ অসুবিধা যে এখনো দূর হইয়াছে তাহা নহে, দিনের মধ্যে সকল সময় যাত্রী অক্ষয়বট দেখিতে আসিতে পায় না, সকালে বিকালে কয়েক ঘন্টা করিয়া অক্ষয়বট দেখিবার একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। ইহার উপর (পাণ্ডারা প্রতিদিন যত লাভ করুক না করুক) গোরা প্রহরীদের প্রতিদিন নাকি পাঁচসিকা করিয়া ঘুষ দিতে হয়, নহিলে তাহারা যাত্রী ভাগাইয়া দেয়। আমরা যেদিন গিয়াছিলাম, দেখিলাম—অনেকে ফুল দিয়া গাছ পূজা করিতেছে, তাহার মধ্যে একজন সন্তান কামনায় আসিয়াছে।

খসরুবাগ এখানকার দেখিবার আর একটি প্রধান স্থান।[৫] জাহাঙ্গীরের পুত্র খসরু যখন এ অঞ্চলের শাসনকর্ত্তা ছিলেন তখন তিনি এ বাগান প্রস্তুত করেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার এই সাধের বাগানেই তাঁহার সমাধি হইয়াছে। এখন এ বাগান গভর্ণমেন্টের হাতে। ৩/৪শত টাকা বেতনে একজন নাকি এ বাগানের ইংরাজ তত্ত্বাবধায়কই আছে। বাগানের দুইটি গেট। প্রথম গেটের ভিতরকার কমপাউণ্ড এখন বাগানের সামিল নহে, সেখানকার দোকান রাস্তা এখন গবর্ণমেন্টের। আগে এইখানে বাগানের খাস দোকান বসিত। ইহার কাছে একটি কূপ-

বাটিকা আছে। দোতালা বাড়ীর মধ্যে কূপ, কূপের ভিতর পর্য্যন্ত সিঁড়ি, গরমিকালে বেগমেরা আর কি এইখানে বাস করিতেন। প্রথম গেটের কমপাউণ্ডের সীমায় দ্বিতীয় আর একটি প্রকাণ্ড গেট— ইহা উচ্চে ৫০ হাতেরও হয়ত অধিক হইবে; এই গেটের শিল্প-কার্য্যও বড় চমৎকার। গেটের মধ্যে ঢুকিয়া বাগানের রাস্তার দুই পাশে চাহিয়া দেখ, চিত্র বিচিত্র মখমল শয্যা বিছান রহিয়াছে, সে মখমল পশমের মখমল নহে, ঘাসের মাঝে মাঝে নানা বর্ণের বিলাতি ফুল ফুটাইয়া ঠিক মখমলের মত সাজান হইয়াছে। তারপর ফুল বাগান, হাজার হাজার নানা রঙ্গের নানা আয়তনের গোলাপ একসঙ্গে ফুটিয়া সৌরভে চারিদিক আকুল করিয়া রাখিয়াছে, গোলাপফুলের এমন কারখানা আর কখনো দেখি নাই। অন্য ফুল যে একেবারে নাই তাহা নহে, তবে খসরুবাগ গোলাপের জন্যই প্রসিদ্ধ।

বাগানের মধ্যে এক লাইনে তিনটি সমাধি মন্দির। প্রথমটি খসরুর মাতার, দ্বিতীয়টি শূন্য। খসরুর এক স্ত্রীর জন্য ইহা নির্ম্মিত হয়, কিন্তু তিনি রুগ্নাবস্থায় দিল্লিতে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে গমন করিয়া সেইখানেই প্রাণত্যাগ করেন এবং সেইখানেই তাঁর দেহ প্রোথিত হয়— সুতরাং এখানকার মন্দিরটি শূন্যই রহিয়া গেছে। তৃতীয় মন্দিরটিতে স্বয়ং খসরু ও তাঁহার দুই বালক পুত্র শয়ান আছেন। হতভাগ্য খসরু সাজাহানের প্ররোচনায় তাঁহার দুইটি বালক পুত্রের সহিত একই দিনে একজন হাবসি ক্রীতদাস কর্ত্তৃক নিহত হন। খসরু ও সাজাহান দুই সহোদর ভ্রাতা, ইহাঁদের মাতা মানসিংহের ভগিনী। পিতা জাহাঙ্গীর বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতেই রাজ্য-লোভে দুই ভাইয়ে বিবাদ আরম্ভ হয়। এই বিবাদ নিবৃত্তির জন্য দুই ভাইকে স্বতন্ত্র রাখিবার ইচ্ছায় জাহাঙ্গীর খসরুকে এলাহাবাদের শাসনভার দিয়া এইখানে প্রেরণ করেন। সাজাহান ও খসরুর বিবাদে খসরুর মাতা সাজাহানকেই দোষী দেখিতে পান ও তাহাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তিনি তাঁহার মুখ দর্শন করিবেন না স্থির করিয়া পুত্র খসরুর সহিত এলাহাবাদে আগমন করেন। খসরু এখানে আসিয়াও নিস্তার পাইলেন না।একদিন তিনি ও তাঁহার দুইটি পুত্র আহার করিতেছেন, মুহূর্ত্তের জন্য অন্য ভৃত্যবর্গ সরিয়া গিয়াছে—এই সময় খসরুর একজন ভৃত্যবেশী সাজাহানের লোক তিনজনকে একসঙ্গে হত্যা করে। কিন্তু পরে সাজাহান নিজে দোষমুক্ত হইবার জন্য ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া মারিয়া ফেলিতে আজ্ঞা দেন। পুত্রশোকে রাজ্ঞীও কিছুদিন পরে প্রাণত্যাগ করেন।

যে ফকীরের উপর এই তিনটি সমাধি মন্দির দেখিবার ভার, আর যে আমাদের সঙ্গে লইয়া মন্দিরগুলি দেখাইয়া বেড়াইতেছিল, তাহার কাছেই আমরা এই সব কথা শুনিলাম। ফকির পারস্য ভাষা বেশ জানে। সমাধি মন্দির খোদিত কথা পড়িয়া সে আমাদের তাহার মর্ম্ম বুঝাইয়া দিতে লাগিল। খসরুর সমাধি মন্দিরের ভিতর দিকের দেয়ালে অনেকগুলি এই মর্ম্মের কবিতা লেখা আছে—ধনের জন্য কি-না হয়—পুত্র পিতার অবাধ্য হইয়া পড়ে, ভাইকে ভাই নিধন করে—ইত্যাদি। একস্থলের অন্যরূপ অর্থের দুই ছত্র কবিতা বড় ভাল লাগিল—তাহার অর্থ এই, “এই যে নবাব খসরু—ইনি অতি সূক্ষ্মবস্ত্রের ভার সহ্য করিতে পারিতেন না, অঙ্গে ব্যথা লাগিত, এখন কত মণ পাষাণভারের নীচে স্বচ্ছন্দে শুইয়া আছেন।”

খসরুর গোরের পাথরের উপর কতকগুলি ফুল ছড়ান দেখিলাম। শুনিলাম, মুসলমানেরা অনেকে অনেক কামনা করিয়া খসরু ও তাঁহার পুত্রদিগকে পূজা করিয়া যায়, বিনা-অপরাধে হত হইয়া আর-কি ইহাঁরা "সহিদ" অর্থাৎ দেবতা হইয়াছেন।

এইসব দেখিয়া শুনিয়া একটা ঔদাস্যময় কষ্টের ভাব সঙ্গে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। সমাধিস্থল দেখিলে মনে কি যে একটা কিছুই কিছু নয় ভাব আসিয়া পড়ে, সহজে সে ভাব মন হইতে তাড়ান যায় না। অথচ এই কষ্টেরও এমন একটা আকর্ষণ আছে—সমাধি-ক্ষেত্রে আসিলে আর ফিরিতে ইচ্ছা করে না,—কে জানে মৃত্যুর মধ্যে কি মায়া নিহিত, মৃত্যুকে সকলে দূরে রাখিতে চায়, মৃত কেহ দেখিতে চায় না—তবু শব দেখিলে তাহার দিকে না চাহিয়া যেন কেহ থাকিতে পারে না। একদিন এখানকার ইংরাজদের গোরস্থান দেখিতে গিয়াছিলাম। কত সাধের স্ত্রী মরিযাছে—স্বামী সেই মৃতদেহের উপর উচ্চ স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কত স্ত্রী মৃত স্বামীর গোরের উপর অশ্রুমাখা কাতরোক্তি লিখিয়াছেন। একজন ধনীর একটিমাত্র পুত্র একুশ বৎসর বয়সে ঘোঁড়া হইতে পড়িয়া মরিয়া গিয়াছে, একজন একে একে চারিটি পুত্রকন্যা ও স্ত্রীকে এইখানে শুয়াইয়া রাখিয়া গেছেন, সংসারে বুঝি আর তাঁহার কেহ নাই। কত পুত্র কন্যা পিতামাতা ভাই ভগিনী স্বামী স্ত্রী অশ্রুজল ও হৃদয় বেদনা মাখাইয়া প্রিয় মৃতের মাটি শয্যার উপর ফুল-শয্যা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছে। কিন্তু যে শুইয়া আছে তাহার কাছে মাটী-শয্যা আর ফুল-শয্যা দুইই সমান। এ যে স্থল এখানে অশ্রু বেদনা স্নেহ প্রেম কিছুই পৌঁছে না। সমাধি-ক্ষেত্রে আসিলে স্নেহ-প্রেমের অশ্রু-বেদনার এই উপেক্ষা দেখিয়া মর্ম্ম বিদ্ধ হয়, সংসারের অনিত্যতা প্রাণের ভিতরে ভিতরে প্রবেশ করে, অহঙ্কার ভুলাইয়া দেয়,—ক্রমে সেই কষ্টের মধ্যে একটা পবিত্র প্রশান্ত ভাব অন্তঃশীলা বহিতে আরম্ভ হইয়া সেই কষ্টটাকে উপভোগ্য করিয়া তুলে, তখন সমাধি মন্দির হইতে আর ফিরিতে ইচ্ছা হয় না, তাহার মধ্যে একটি সত্য দেখিতে পাওয়া যায়।

৪

গঙ্গার যেমন বেণীঘাট প্রধান, যমুনার তেমনি বড়ুয়াঘাট প্রধান। কিন্তু বেণীঘাট সঙ্গমঘাট বলিয়া ইহা একটি প্রধান তীর্থস্থান, কাজেই এ-ঘাটে যেমন লোকের ভিড়, নিশানের কারখানা, বড়ুয়াঘাটে তাহার কিছুই নাই।

আমরা দুই দিন নৌকা করিয়া যমুনায় বেড়াইতে গিয়াছিলাম। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি—এখানকার নদীতে স্রোতের তেমন জোর নাই, কেননা সমুদ্র নিকটে নহে বলিয়া গঙ্গা যমুনায় এখানে জোয়ার ভাঁটা খেলে না, সুতরাং নৌকা যেদিকে ইচ্ছা অতি সহজে চালান যায়। এখানে নৌকার চলাচল যে বেশী আছে তাহাও নয়, যমুনার পুলের কাছে—নৌকার আড্ডাস্থলেই মোট ৪/৫ খানি মাত্র নৌকা সর্ব্বদা বাঁধা থাকে, আর নদীর বুকে মাঝে মাঝে দু-একখানি নৌকা চলিতে দেখা যায়। ধোপারাই এখানকার নদীর শোভা। যমুনার ধারে ধারে

সারাদিনই প্রায় সার গাঁথিয়া ধোপারা আহা ওহো শব্দ করিতে করিতে তালে তালে কাপড় কাচে—কোথায় যমুনা পুলিনে শ্যামের বংশীধ্বনি আর কোথায় ধোপাদের এই চীৎকার সঙ্গীত! বড়ুয়াঘাটের কাছে যমুনার ধারেই দুইটি বড় বড় অট্টালিকা, আর ঘাট হইতে কিছুদূরে সুন্দর একখানি বাঙ্গলা। বাঙ্গলাখানি মিশনারীদের, আর অট্টালিকা দুইটির একটি কাশীর রাজার, একটি একজন ফকীরের। ফকীর সম্প্রতি মরিয়াছে। কাশীর রাজার বাড়ীটির প্রস্তর-গেট চন্দন কাঠের বাক্সের মত বড় সুন্দর লতাপাতা ফুলকাটা। এদেশের লোকে পাথরের উপর বড় সুন্দর কাজ করিতে পারে,—এখানকার ধনী মাত্রেরই প্রায় পাথরের বাড়ী।

প্রথম দিন আমরা নৌকা করিয়া বড়ুয়াঘাট হইতে আন্দাজ এক ক্রোশ চলিয়া আসিয়া দেখিলাম গহনাগাঁটী ও রঙ্গিন কাপড় পরা স্ত্রীলোকেরা ঝমঝম করিয়া ও ফিটফাট পুরুষেরা সার গাঁথিয়া তীর দিয়া চলিয়াছে। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় মাঝিরা বলিল—নিকটে শ্যামা মাজির গাছতলায় সকালে মেলা ছিল—সেখান হইতে লোকেরা ফিরিয়া যাইতেছে। শুনিলাম সে বৃক্ষটি নিকটেই নদীর তীরে। আমরা সেইখানে নৌকা লাগাইতে হুকুম দিলাম। খানিক পরে একটা পাহাড়ের মত উঁচু জায়গার নীচে নৌকা থামিল—আমরা নৌকা হইতে তীরে নামিয়া সেইখানে উঠিলাম, দেখিলাম সেই উচ্চস্থানে একটা বাঁধান গাছতলায় কতকগুলা ভাঙ্গাচোরা মূর্ত্তি, তাহাই শ্যামামায়িজি। সকালে এইখানে মেলা হইয়া গিয়াছে, পুতুলগুলো সব সিঁদুর মাখান, আর নিকটে অনেক ভাঁড় কোড় পড়িয়া আছে—তাহাই মেলার অবশেষ। সেই উচ্চ পাড়ের নিম্নদেশ দিয়া যমুনার একটা শাখানদী বর্ষাকালে কানপুর পর্য্যন্ত চলিয়া যায়, এখন তাহার শুষ্ক চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। এই উচ্চস্থান হইতে যমুনা দেখিতে কি সুন্দর—নীল আকাশ প্রতিবিম্বিত যমুনার জল এত ঘোর নীল যে সমুদ্রও যেন অত নীল নহে। সেই কাল জলে—তীরের বৃক্ষচ্ছায়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে—সূর্য্যের কিরণ চিকচিক করিতেছে, সমস্ত আকাশটা তাহার মধ্যে ঢেউএর মত উঠিতেছে পড়িতেছে, একটা ছোট্ট হৃদয়ের মধ্যে একটা অসীম জগৎ-সংসারের যেন লীলাখেলা চলিয়াছে।

সেদিন আর বেশীদূর যাওয়া হইল না, সেইখান হইতেই বাড়ী ফিরিলাম। পরদিন খুব ভোরে নৌকায় উঠিয়া সে-স্থান ছাড়াইয়া আরো অনেক দূরে যমুনার বক্ষে একটি পাহাড় দ্বীপ উঠিয়াছে, দুইটার সময় সেইখানে পৌঁছিলাম। দ্বীপটির নাম সুজান দ্বীপ।[৬] দ্বীপটি স্তরে স্তরে দীর্ণ বিদীর্ণ একটি প্রকাণ্ড পাষাণ মূর্ত্তি। তাহার পদতলে নদীর জলে বড় বড় ভাঙ্গা পাথর গড়াগড়ি যাইতেছে—তাহার গায়ে এক একটা বড় বড় চাঙ্গড়া এমনিভাবে ঝুঁকিয়া আছে—যেন এখনি পড়িয়া যাইবে। যমুনার জলের মধ্যে স্তরে স্তরে মর্ম্মে মর্ম্মে বিদারিত সেই উচ্চ পাহাড়ের মাথায় একটি শিবমন্দির। মন্দিরে উঠিবার জন্য নীচে হইতে মন্দির পর্য্যন্ত বরাবর পাহাড় কাটা সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়া আমরা মন্দিরে উঠিলাম। মন্দিরটিতে জন-মানব নাই, মন্দিরের নিকটে একটিমাত্র নিম গাছ—আর আশেপাশে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া দুএকটা আগাছার জঙ্গল ছাড়া তাহার চারিপাশের অসমান জমি মাজা পাথরের মত ঝরঝরে। মন্দিরের ভিতরের দেয়ালে দেয়ালে ফার্সি লেখা, শিবমন্দিরে ফার্সি লেখা কেন বুঝিতে পারিলাম না।

এই দ্বীপের সম্মুখে যমুনার তীরে আর একটি উঁচু পাহাড়—মধ্যে একটা জলের ব্যবধান; দেখিলে মনে হয়—এই দুই পাহাড় আগে একটিমাত্র সংলগ্ন পাহাড় ছিল, পরে কোন কারণে ইহাদের মধ্যস্থিত পাহাড়-অংশ ভাঙ্গিয়া ইহারা এমন বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। সুজান দ্বীপ দেখা হইলে আমরা আবার নৌকা করিয়া তীরে নামিয়া ঐ পাহাড়ের উপর উঠিলাম। ঐ পাহাড়ের উপর সমুখা-সমুখি দুইটি মন্দির—একটি কৃষ্ণ-রাধার, একটি শিবের। কৃষ্ণ-রাধার মন্দিরটি বেশ সুসজ্জিত। এ পাহাড় জনশূন্য নহে, এখানে মন্দিরের কাছে লোকজনের বসতি আছে, মন্দিরের উদ্যানভূমির মধ্যেই একজন পুরোহিত বাস করেন। এই পুরোহিতের কাছে শুনিলাম নবাব সাসুজা তাঁহার একজন প্রিয় হিন্দু কর্ম্মচারীর অনুরোধে—যমুনাবক্ষস্থ ঐ দ্বীপের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া, তাঁহার নিজের নামে ঐ মন্দির ও দ্বীপের নামকরণ করেন, তখন বুঝিলাম শিবের মন্দিরে ফার্সি লেখা কেন।

এইসব দেখিয়া শুনিয়া নৌকা ছাড়িতে প্রায় ৪টা হইয়া গেল। বিকালে যমুনার দৃশ্য কি চমৎকার! পশ্চিম আকাশের লাল আভায় নৌকার পশ্চিমদিকের নদীর জল লালে লাল হইয়া উঠিয়াছে—সে দিকে নদীর বুকের ভিতর যেন সহস্র সহস্র রাঙ্গাজবা ফুটিয়া উঠিয়াছে—আর তাহার কূলে উঁচু উঁচু সোজা সোজা পাড়ের উপরে ছোট ছোট কুটীর ও বড় ছোট গাছপালার গায়ে গায়ে সে লালের স্নিগ্ধ লাবণ্য পড়িয়াছে। সেই সোজা পাড়ের ঐ কুটীরগুলি দেখিলে কেমন ভয় ভয় করে—মনে হয় তাহারা যেন নদীর শোভাময় লাল জলে জীবন বিসর্জ্জন করিতে উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। এই ভাঙ্গন-ধরা তীরের উপর আর এক বর্ষা পর্য্যন্ত কুটীরগুলি যে রক্ষা পাইবে এমন মনে হয় না।

পশ্চিমের এই আলো পথ দিয়া আমরা পূর্ব্বদিকে অন্ধকারের রাজ্যে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, সন্ধ্যা হইল, পশ্চিম এখনো স্নিগ্ধ লাল-লাবণ্যময়, কিন্তু পূর্ব্বদিক একেবারে অন্ধকার—কুয়াসায় আচ্ছন্ন। সেই কুয়াসার প্রাণের মধ্যে এক একবার কেবল পুলের দিকের একটা আলো জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে—আর পাশের জানালা দিয়া আকাশের এক একটা তারা চোখের সমুখে আসিয়া পড়িতেছে—দুই একটা তারা নদীর জলে মাঝে মাঝে নৃত্য করিয়া উঠিতেছে। একদিকে আলোক একদিকে অন্ধকার—আমরা মধ্যখানে সন্ধিস্থলে বসিয়া আলোকের রাজ্য ছাড়িয়া ক্রমাগত অন্ধকার কুয়াসার দিকে ছুটিয়া চলিয়াছি—সেখানে আশ্রয় ফেলিয়া আসিয়াছি, মানুষ—মানুষ আমরা।

এখানে রাস্তাঘাটে সহরে মাঠে যেখানে সেখানে মন্দির; এত মন্দিরেও তবু এখানকার লোকেদের আশ মিটে নাই, যে স্থানটি একটু নির্জ্জন, সুদৃশ্য, সেইখানেই একটি বাঁধান গাছতলায় একটা কোন না কোনরূপ মূর্ত্তি খাড়া করিয়াছে, বলিতে কি এখানে এমন একটা বড় গাছতলা বা উঁচু ভালরকম জায়গা দেখিলাম না, যেখানে একটা সৃষ্টিছাড়া মূর্ত্তি পড়িয়া নাই। আর যেখানেই এইরূপ মূর্ত্তি সেইখানেই এক একটা নিশান পোতা,—নিশান দেখিলেই বুঝা যায় ইহা একটি দেব আড্ডা। এইরূপ মূর্ত্তিপূজার এক একটা বিশেষ দিন থাকে, অনেক দূর হইতে সেদিন সেখানে লোক জমে, দোকান পসারি বসে—একটা মেলা হয়। তারপর যে যেখানে

চলিয়া যায়---মূর্ত্তি একাকী পড়িয়া থাকে।

সৌন্দর্য্য পূজার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতে যে প্রথমতঃ এইরূপ স্থলে দেশ কল্পনা করা হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। বলিতে কি আমাদের দেশের লোকের মত প্রকৃতি পূজা করিতে, স্বভাব-সৌন্দর্য্যে জীবন্ত কবিত্ব অনুভব করিতে আর দ্বিতীয় জাতি নাই।

আমরা সর্ব্বপ্রথমে এখানে ভরদ্বাজের আশ্রম মন্দির দেখিতে যাই। রামচন্দ্র বনে যাইবার সময় আর কি এখানে তিনদিন বাস করিয়া গিয়াছিলেন। যাইবার সময় মনে করিলাম কি একটি নির্জ্জন পবিত্র স্থান দেখিতে যাইতেছি—কিন্তু লোকালয়ের ভিতর দিয়া ধূলায় হাবুডুবু খাইতে খাইতে একটা গণ্ডগোল, চিকরা চিকরি—অপরিষ্কার ও ধূলার কারাগার মধ্যে প্রবেশ করিয়া শুনিলাম এই ভরদ্বাজের মন্দির। যত মন্দির দেখিয়াছি এমন অপরিষ্কার ধূলিময় কোনটি দেখি নাই। এখানে দুইটি মন্দির ঘর—এক ঘরে রাম লক্ষ্মণ সীতার মূর্ত্তি, এক ঘরে একটি শিবের মূর্ত্তি। দুইটি ঘরের মধ্যে দুইটি সিঁড়িপথ আছে, সেইখান দিয়া নীচের অন্ধকার গহ্বরে নামা যায়। ইহার একটি গহ্বর বশিষ্ঠ মুনির, একটি ভরদ্বাজের তপঃস্থান বলিয়া কথিত। আমরা মন্দিরে প্রবেশ না করিতে করিতে জনকতক পুরুষমূর্ত্তি-স্ত্রী-পাণ্ডা আমাদের ঘেরিয়া ফেলিয়া ডাক-হাঁক আরম্ভ করিয়া দিল; মন্দির দেখিব কি আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত; মনে হইল আজ বুঝি এইখানেই কয়েদী হইয়া পড়ি। কমপাউণ্ডের মধ্যে কাছাকাছি আরো অনেক মন্দির, সকল মন্দিরের লোকেরা একসঙ্গে জুটিয়া নিজের নিজের দেবতার জন্য পয়সা চাহে, নিজের নিজের মন্দিরে লইয়া যাইবার জন্য চীৎকার করে, ঘন ঘন হাত নাড়িতে নাড়িতে কাছে আসে, অতিকষ্টে আমাদের দরোয়ানেরা তাহাদের সরাইয়া রাখে। যাই হৌক, খানিকক্ষণ তাহাদের চীৎকারের বড়ষিতে নাকানি চোবানি খাইয়া অবশেষে অনেক কষ্টে ছিপ কাটিয়া তাহাদের হাত এড়াইয়া গাড়িতে গিয়া উঠিলাম, তাহাতেও নিস্তার নাই, গাড়ীর অর্দ্ধেক পথ আবাল, বৃদ্ধ, বনিতারা চীৎকার করিতে করিতে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল। এমন বিপদে আর কখনো পড়ি নাই। যদি ভরদ্বাজ মুনি জানিতেন তাঁহার শান্তির আশ্রম এমন অশান্তির আলয় হইয়া উঠিবে তাহা হইলে বোধ করি ইহার চিহ্নমাত্র তিনি রাখিয়া যাইতেন না।

সহরের মধ্যে রাজার মন্দির নামে আর একটি মন্দির আমরা দেখিতে গিয়াছিলাম। ইহা একটি প্রস্তর নির্ম্মিত লালবর্ণের নূতন মন্দির। মন্দিরটি সবে ১৬ বৎসর মাত্র একজন রাজা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মন্দিরটি বেশ দেখিতে, ইহার চূড়াগুলি সব স্বর্ণ-মণ্ডিত। যে দ্বার দিয়া মন্দিরের কমপাউণ্ডে প্রবেশ করিতে হয়—তাহা সুবৃহৎ। এই দ্বারদেশে একটি মজার ঘড়ি, একটা নল দিয়া ফোঁটা ফোঁটা করিয়া একটা জলপাত্রে জল পড়িতেছে, জলে বাটীটির কতখানি পুরিয়া উঠিতেছে তাহা দেখিয়াই সময় ঠিক হইতেছে। বাটীটি একেবারে জলপূর্ণ হইলে তখন তাহা ফেলিয়া আবার খালি করিয়া লইতে হয়। মন্দিরটি শিব মন্দির, মন্দিরের চারিধারের বারান্দার ভিতরে বাহিরে দেব-দেবীর মূর্ত্তি খোদিত, মন্দিরের মধ্যে দেয়ালে অনেক দেব-দেবীর চিত্র। শিব মন্দিরের সমুখাসমুখি কমপাউণ্ডের মধ্যে একটি একতালা গৃহে কৃষ্ণ-রাধার মূর্ত্তি। সেই গৃহের ছাতে কৃষ্ণ-রাধার মাথার উপর কয়েকটি বিলাতি মূর্ত্তি (statue)।

এই মূর্ত্তিগুলি বেশীর ভাগ স্ত্রী-মূর্ত্তি, পুরুষও আছে, একজন নাইট একটা হরিণ পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান। দেবমন্দিরে এইরূপ বিলাতি দৃশ্য দেখিয়া ভাবিলাম—বুঝি বা বাল্মীকি, লক্ষ্মী, সরস্বতী আজ এইরূপ বেশে শিবের সম্মুখে বিরাজ করিতেছেন। আশ্চর্য্যই বা কি! শুনা যায় আজকাল কোন কোন গৃহদেবতার পাউরুটি বিস্কুটের ভোগ নহিলে চলে না!

এখানে আর দুইটি যে মন্দির দেখিয়াছি তাহা দেখিতে এমন জমকাল নহে, কিন্তু তাহার সম্মুখের দৃশ্য বড় চমৎকার। দুইটিই গঙ্গার ধারের মন্দির। একটি দারাগঞ্জে, অন্যটি সহরের বাহিরে শিবকোটি নামক স্থানে। দারাগঞ্জ নদীর ধারের একটি স্থান, বড় বড় বাড়ী ইমারত মন্দিরে মন্দিরে ইহা ভরা। নদীর উপর হইতে এই স্থানটি দেখিতে ঠিক যেন ছবির মতন, বড় সুন্দর! এখানে আমরা যে মন্দিরটি দেখিতে গিয়াছিলাম তাহা বাসুকীর মন্দির—ইহা একটি উচ্চ ভূমির উপর অবস্থিত। পাথরের সুবিস্তৃত সিঁড়ি দিয়া আমরা মন্দিরের বারান্দায় উঠিয়া ঘুরিয়া সর্পরাজের সম্মুখের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম, এই বারান্দা হইতে নীচে গঙ্গা পর্য্যন্ত দুই পাশে দেয়ালওয়ালা একটি বাঁধান ঘাট, বর্ষাকালে সম্মুখের প্রসারিত মাঠ ঢাকিয়া এই ঘাটে জল আসে, কিন্তু এখন গঙ্গা শুকনো হলদে মাঠের আকাশের একপাশে একটা ক্ষীণ বিদ্যুৎ-রেখার মত শুইয়া আছে। তাহার মাথার উপর অনন্ত প্রসারিত আকাশ আর চারিপাশে অনন্ত প্রসারিত মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। মাঠের সীমান্তে যে বড় বড় গাছ, মন্দিরের উচ্চ ভূমির কাছে তাহাও ঈষৎ উচ্চ সমান সবুজ জমির মত হইয়া পড়িয়াছে, বিকালের প্রশান্ত কনক আভা—হরিদ্রাবর্ণের এই ক্ষেত্রাকাশে শয়ন করিয়া চারিদিকে একটা গম্ভীর নিরাশার ভাব, একটা বৈরাগ্যের তান তুলিতেছে—বাসুকী সহস্র ফনা তুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া সেই বৈরাগ্য সঙ্গীত শুনিতে কাণ পাতিয়া আছে।

শিবকোটির মন্দির ("শিউকোট" অর্থাৎ শিব মন্দির। ইহা হইতে সমস্ত স্থানটার নামই শিউকোটি হইয়া পড়িয়াছে) আমরা রাত্রকালে দেখিতে গিয়াছিলাম। স্থানটি একেবারে সহরের বাহিরে, বড় নির্জ্জন। মন্দিরের পুরোহিতগণ ছাড়া এখানে আর কেহই বাস করে না। সেদিন পূর্ণিমা, সাদা ধবধবে গম্বুজওয়ালা ছোট্ট মন্দিরের উপর, কাল পাথরের ঘাটের উপর, মন্দিরের নীচের ধূ ধূ কারী বালির চড়ার উপর, দূরে অস্পষ্ট গঙ্গার কাল একটা রেখার উপর জ্যোৎস্না ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সেই ঘুমন্ত জ্যোৎস্নাকে কম্পিত করিয়া পুরোহিতদিগের স্তবগান মন্দিরের মধ্য হইতে স্তব্ধ আকাশে উথলিয়া উঠিতেছে, চারিদিক গমগম করিতেছে, চারিদিক পবিত্র হইয়া উঠিতেছে—আমার মনে হইতে লাগিল আমি ঋষি আশ্রমে সামগান শুনিতেছি। সেই স্তব শুনিতে শুনিতে পূতঃ হইয়া আমরা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া বালির চড়া ভাঙ্গিয়া নদীর ধারের দিকে চলিতে লাগিলাম। পুরোহিতদের স্তুতিগান ধীরে ধীরে মিলাইয়া আসিতে লাগিল, যখন নদীতীরে আসিয়া দাঁড়াইলাম কেবল একটা গুণগুনানি মাত্র অবশিষ্ট রহিল। এখানে কি গভীর নিস্তব্ধ ভাব! নিজের নিশ্বাস শব্দ পর্য্যন্ত যেন এখানে শোনা যায়। এই জ্যোৎস্নাময় স্তব্ধ রজনীতে আমরা পরস্পরের দিকে চাহিয়া চাহিয়াই যেন বিস্মিত হইতে লাগিলাম, মনে হইতে লাগিল যে, আমরা এখানে কেন আসিলাম। আমরা বিস্ময়ে স্তব্ধ ভাবে তীরে বালির

উপর বসিয়া গঙ্গার পানে চাহিয়া রহিলাম। গঙ্গার উপরে যেখানে পূর্ণচাঁদ তলতল ঢলঢল করিতেছে—তাহার কাছেই—আকাশের একখানা কালমেঘ পড়িয়া ঘন ঘোর করিয়া তুলিয়াছে—মানুষের হৃদয়ের মত গঙ্গার হৃদয়েও যেন একই সঙ্গে হাসি কান্না গাঁথা রহিয়াছে, আর গঙ্গা-হৃদয়ের হাসির সেই ছোট ছোট তরঙ্গগুলিই যেন কুলকুল শব্দে আমাদের পায়ের কাছের তটদেশ আঘাত করিতে লাগিল, আর মাঝে মাঝে ওপারের পাড় ভাঙ্গিবার শব্দ মৃদুতর হইয়া গঙ্গার শোকসঙ্গীত যেন আমাদের কাণে পশিতে লাগিল। ওপারে মেঘের মত আবছা আবছা গাছপালার ভিতর একটিমাত্র আলো টিপটিপ করিতেছে—এদিকে গাছপালার ভিতর সন্ধ্যার তারা জ্বলজ্বল করিতেছে—আমার তীরে বসিয়া একটি কথা মনে হইতে লাগিল—একদিন এইরূপ জ্যোৎস্না রাত্রে নদীর শোভা দেখিয়া একজন যে বলিয়া উঠিয়া ছিল—"যদি মরিতে হয় ত এই সময় গঙ্গার বুকে—" আমার সেই কথাটি মনে পড়িতে লাগিল। ক্রমে আমাদের স্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া গেল,—আমরা অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই জ্যোৎস্না-ধৌত চড়ার উপর বসিয়া বেড়াইয়া গল্প করিয়া কাটাইলাম,—অবশেষে বাড়ী ফিরিলাম। এই খানেই আমাদের মন্দির দেখা শেষ নহে। আমরা এই মন্দির দেখার গল্প করিতেছি—একজন বলিলেন—গঙ্গার ওপারে পাড়িলা গ্রামে যে একটি শিবমন্দির আছে—বড় চমৎকার। শুনিয়া ত আমার বন্ধুটি ক্ষেপিয়া উঠিলেন—যাইবার সব ঠিকঠাক হইল—এবার যাত্রী আমরা ৪ জন স্ত্রীলোক—সঙ্গে দরোয়ান চাকর বাকর। ঘরের গাড়ী গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত গেল,—তাহার পর গঙ্গার কাঁচা পুল ভাঙ্গিয়া উবড়ো খাবড়ো গ্রাম্য রাস্তা দিয়া যাইতে হইবে, সে পথে কিছু আর ঘরের গাড়ী চলে না,—কাজেই এ দেশে খাঁচার মত ছোট ছোট যে একরূপ ঘোঁড়ার গাড়ী আছে, আমরা তাহার এক একখানিতে দুইজন করিয়া চড়িলাম। একখানিতে আমি ও আমার তন্বাঙ্গী বন্ধুটি, আর একখানি কিছু অতিরিক্ত রকম জুড়িয়া গেল। মন্দির দেখার প্রসাদে আমাদের এক্কা চড়া পর্য্যন্ত হইয়া গেল, এক্কা চড়িয়া আমাদের আনন্দ দেখে কে। আমাদের দুইজনকে ঝাঁকাইতে ঝাঁকাইতে—দোল দিতে দিতে যখন পুল দিয়া এক্কাখানি আয়েষে হেলিয়া দুলিয়া চলিল—আমার ত বড় মজার লাগিতে লাগিল,—আমরা দুজনে তখন প্রাণের যত সুখের গল্প করিতে বসিলাম, মনে হইতে লাগিল—সঙ্গীর গুণেই স্বর্গ নরক, স্থানের গুণে নহে।

এইরূপ হাঁসিতে খুসিতে অর্দ্ধ ক্রোশ পুলটা পার হইয়া গ্রাম্য কাঁচা রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম, সকলেরই মনে হইল—এইবার গম্য স্থানের কাছাকাছি আসা গেল—অল্পক্ষণের মধ্যেই মন্দিরে পৌঁছিব, ওমা—কোথায় কি? যতই যাই, শুনি আরো যাইতে হইবে—পথের যেন আর শেষ নাই। চাকররা যারা সঙ্গে ছিল তারা ঠিক পথ জানে না,—মাঝে মাঝে রাস্তার লোক ধরিয়া ধরিয়া তাহারা পথ জিজ্ঞাসা করে,—কেহ বলিয়া দেয় এ-রাস্তায় যাও, কেহ বলে ও-রাস্তায় যাও—পথের না আছে একটা ঠিক, না আছে একটা কথার ঠিক,—গাড়োয়ানেরা একবার এ রাস্তায় একবার ও রাস্তায় গাড়ীদুটাকে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত ঘুরাইতে ঘুরাইতে অবশেষে একটা মাঠের পথে আনিয়া ফেলিল—শুনিলাম এই পথে গেলে শীঘ্র যাওয়া যাইবে,—তখন বুঝিলাম—মহাদেবের মন্দিরে—কিন্তু তারপর দেখিলাম আর খানিকটা এইরূপ

পথে চলিলে শীঘ্রই শেষ স্থানে যাওয়া যাইবে। মাঠের সেই পথহীন আঁকা বাঁকা ঢিবে উঁচু নীচু পথে বার বার স্বর্গ হইতে রসাতলে দুমদাম করিয়া পড়িতে পড়িতে গাড়ী চলিতে লাগিল। এক একবার সমুখে একটা উঁচু ঢিবি দেখি, কি করিয়া পার হইব প্রাণটা আঁতকিয়া উঠে, আর গাড়ীটার দুই দিকে লোকেরা ধরিয়া মজেমে মজেমে (ধীরে ধীরে) করিতে করিতে অতি সন্তর্পণে—কিন্তু অবশেষে দুম করিয়া নামাইয়া দেয়—মনে মনে বলি, মজাটা যথেষ্ট হইয়াছে, এখন একটু কমিলে বাঁচি। এইরূপ এক একটা ঢিবি পার হওয়া কলিকালের আর কি অগ্নিপরীক্ষা, তার উপর আমাদের গাড়ীটা তবু হালকি সওয়ারি,—দ্বিতীয় গাড়ীখানি এইরূপে পার করিতেছে। এক একবার লোকদেরও প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়—যাত্রীদেরও ত্রাহী মধুসূদন হইয়া পড়ে, দুই একবার ত যাত্রী দুইটি গাড়ী হইতে নামিয়া উঁচু ঢিবি পার হইয়া লইলেন—তাঁহাদের মধ্যে একজনের ক্রমাগত মনে হইতে লাগিল—তিনি আহার করিয়া শিব দর্শনে আসাতেই যত অনর্থ উৎপত্তি হইয়াছে,—আর কখনো এরূপ করিবেন না বলিয়া তিনি মাননা করিতে লাগিলেন। কোন রকমে যখন মাঠের সে ভবনদীটা পার হইয়া মন্দিরে আসা গেল—রমণী বলিলেন—তিনি মাননা না করিলে কখনই আজ মন্দিরে আসা ঘটিত না।

যাক, এতটা সুখে রাস্তা পার হইয়া মন্দির দেখিয়া চক্ষুস্থির—একটা গলি ঘুঁজির মধ্যে একটা এঁদো পচা জায়গায় ছোট খাট একটা শিবের মন্দির,—এই ত পাড়িলা মহাদেব। যা হক দুপুরের সময় বাড়ী ছাড়িয়া ৪টের সময় আমরা এখানে আসিয়া পঁহুছিলাম,৪।।টার সময় আবার বাড়ী মুখে ফিরিলাম—অমন উঁচু নীচু পথে রাত হইলেই সর্ব্বনাশ, তাহা হইলে মাঠেই রাত কাটাইতে হইবে। সঙ্গে আবার একটা আলো জ্বালিবার বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত নাই, দুপুর রৌদ্রে বাড়ী ছাড়িয়া কার মনে অন্ধকার রাত্রের বিপদ মনে আসে? এবার সে রাস্তা না ধরিয়া অপেক্ষাকৃত ভাল রাস্তা ধরা গেল। শীতকাল, বিকাল হইতে হইতে সন্ধ্যা আসিয়া পড়ে, সন্ধ্যা না আসিতে আসিতে অন্ধকার হয়, শীঘ্রই চারিদিক ঘোর ঘোর হইয়া আসিল—দৌড়াদৌড়ি তাড়াতাড়ি করিয়া ও গাড়ী মাঠ না ছাড়াইতে ছাড়াইতে সন্ধ্যা হইয়া পড়িল, বেচারা ঘোঁড়ারাই বা কত পারে, তবু তাহারা প্রাণপণে চলিতে লাগিল, বাবলা গাছের নোয়ান ডালপালার কাঁটার আঁচড় খাইয়া, নীচে গাছগাছড়ার উপর তার প্রতিশোধ লইয়া গাড়ী দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল—আর খানিকটা গেলেই গাড়ী মোহনগঞ্জের গ্রাম্য রাস্তায় আসিয়া পড়ে—সকলের মনে এই মাত্র ভরসা; এই ভরসার উপর নির্ভর করিয়া আমরা সেই মাঠের দিকে চাহিতে চাহিতে চলিলাম, ক্ষেত্রের মাঝে আঁধার গাছপালা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না, সহরের মত এখানে হিমের ধুঁয়া নাই—তাই সন্ধ্যাতেও একটু একটু চারিদিক নজরে পড়িতেছে। শীত কনকন করিতেছে—সজোরে ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছে—যেদিকে চাই ত্রিসীমানায় একটা লোক নাই লোকালয় নাই, একটা পথ দেখা যায় না, মাঝে মাঝে কেবল এক একটা শেয়াল যা আমাদের দিকে তাকাইয়া চলিয়া যাইতেছে।—যত অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল—হৃৎকম্প হইতে লাগিল, রাত্র হইয়া গেলে আর কোন উপায় নাই—সমস্ত আমোদ প্রমোদ ফুরাইয়া গেল—সকলে নিঃঝুম হইয়া পড়িলাম। এই সময় আমার একবার মনে হইল নভেল

লেখকগণ কেমন সহজে পথিককে দিকহারা করিয়া ফেলেন, কিন্তু দিকহারা অবস্থাটা যে কি ভয়ানক তাহা তাঁহাদের একবার হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিই। যা হউক, কোন জন্মের নিতান্ত পুণ্যবলে আমরা শীঘ্রই গ্রামের রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম,— আর ভাবনা রহিল না, বুঝা গেল যত রাত্রেই হৌক বাড়ী পৌঁছান যাইবে। তাহার পর যে বাড়ী ফিরিয়াছি তাহা আর বলার আবশ্যক নাই। এখন ঘরে বসিয়া সেদিনকার কথা মনে করিতে বড়ই লাগিতেছে ভাল,—মনে হইতেছে এত মন্দির দেখিয়াছি—এমন আমোদ কোথায় হয় নাই। একটা কথা, এত কষ্ট করিয়া কোথায় গঙ্গার পাড়ে পাড়িলা মহাদেব তাহা পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিলাম আর আমাদের বাড়ীর কাছেই যে একটি ভাল মন্দির আছে তাহা এ পর্য্যন্ত কখনো দেখা হইল না, যাহা সহজে পাওয়া যায় তাহার আর কি এমনি হতাদর। এখানে আসিয়া আমরা গভর্ণমেন্ট হাউস, লাইব্রেরি, মেয়ো হল, পার্ক প্রভৃতি যাহা কিছু দেখিবার সব দেখিয়াছি, কিন্তু কলিকাতায় যে এরূপ ধরণের কত ভাল ভাল বাড়ী উদ্যান আছে—তাহা দেখিবার কথা মনেও হয় না। এ বিষয়ে ঘরের ছেলের পাণ্ডিত্য আর বাসস্থান সমান। ঘরের ছেলে অন্য লোকের কাছে যখন মহা পণ্ডিত তখনও আপনাদের কাছে সে ঘরের ছেলে বই কিছুই নয়। যাহাকে জন্মিতে দেখিয়াছি—মানুষ করিয়াছি, চিরকাল যাহাকে আবল তাবল বকিতে শুনিয়াছি, আঃ কপাল! তিনি আজ আবার পণ্ডিত! সে পাণ্ডিত্য আবার চোখে লাগে।

অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন—কলিকাতার মনুমেন্টে চড়িয়াছ? অমুকস্থানে গিয়াছ? ওমুকস্থান দেখিয়াছ? আমি ভাবি, চিরকাল যাহার রক্তমাংসের মধ্যে বাস করিয়া আসিতেছি, তাহাকে আবার নূতন আলাদা আলাদা করিয়া কি দেখিব! কলিকাতাটা নাকি আবার একটা পদার্থ!

এখানে আর কি ইংরাজি প্রবাদটা ঠিক খাটে Familiarity brings contempt— এখানকার মেয়ো হলটি মেয়োর স্মরণ চিহ্ন। ইহা বেশ সুদৃশ্য জমকালো একটি বাড়ী। কিন্তু ইহার প্রধান জিনিস ইহার স্তম্ভটি। ইহা কলিকাতার মনুমেন্টের মত উচ্চ না হউক—কিন্তু তবু বড় কম উচ্চ নহে—আমরা ত উঠিতে হিমঝিম খাইয়া গিয়াছিলাম, স্বর্গে উঠিতে গেলে যে কিরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হয়—এই মঞ্চে উঠিবার সময় তাহার কতকটা আমাদের ধারণা হইয়াছে,—শেষদিকের সোজা সোজা উঁচু উঁচু ধাপগুলা এক একটা করিয়া উঠি আর মনে হয়—বুঝি আর পারিলাম না, বুঝি এইবার নামিতে হয়। যাহক, অতদূর উঠিয়া আবার নামিয়া পড়া নেহাত অমানুষের কর্ম্ম। তাই জীবন মরণপণ করিয়াও শেষে উঠিয়া পড়িলাম, উঠিয়া সমস্ত পথ শ্রান্তি নিমেষে ভুলিয়া গেলাম, মনে হইল সত্যই স্বর্গে আসিয়াছি—চারিদিকে কি সুন্দর দৃশ্য! নীচের গাছপালার মধ্যে ঘরবাড়ী সব একসা হইয়া গিয়াছে—বড় বড় স্তম্ভ ছোট ছোট ডাণ্ডার মত হইয়া পড়িয়াছে—মানুষগুলো পোকার মত কিলকিল করিয়া চলিতেছে— চারিদিকে একটা সীমাহীন দৃশ্য; দিগন্তের সঙ্গে আকাশ মিশিয়াছে—ছোটর সহিত বড় মিলিয়াছে—এইখানে দাঁড়াইয়া দেখিলে মনে হয় সংসার যেন একটা ছেলেখেলা, যেন একটা পুতুলের রাজ্য, আকাশ গম্বুজে আসীন এক মহান পুরুষ সেই পুতুলদিগকে খেলাইয়া

বেড়াইতেছেন। উঠিতে এত কষ্ট, নামিতে কিছুই না! আমরা যখন নামিয়া আসিলাম, দেখিলাম পশ্চিমের লাল আলো না মিশাইতে চাঁদ উঠিতেছে, বিকাল না ফুরাইতে সন্ধ্যা হইয়াছে—বিকালের লাল আলো আর চন্দ্রমাশালিনী সন্ধ্যার রজত আলো একত্র মিশিয়াছে, কলিকাতায় কখনো এমন সন্ধ্যা দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না।

এখানে একটি মস্ত নূতন কালেজ নির্ম্মাণ হইতেছে, পুরান কলেজটি ছোটখাট। পুরান কলেজবাটিটির নাম লাউথার কাস্‌ল্। আগে এদেশে লেপ্টেনেন্ট গর্ভনরের স্থলে একজন করিয়া কমিসনার নিযুক্ত থাকিতেন। পুরাতন কলেজটি আগে লাউথার নামক একজন কমিসনারের বাসবাটী ছিল—তাঁহার নাম হইতে ইহার নাম লাউথার কাস্‌ল্ হইয়াছে। শোনা যায় লাউথার বড় মজার লোক ছিলেন, তিনি নবাবী আনা-চালে নহিলে চলিতেন না, সঙ্গে তাঁর আসাসোটাধারী লোক নহিলে হইত না, তিনি আপনাকে "সুবা" বলিয়া পরিচয় দিতেন,—বিলাত যাইবার সময় তিনি অনেক জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া যান, জিনিসের মধ্যে রূপার জিনিস তাঁহার অনেক ছিল, কিন্তু তাঁহার রূপার বাসন কিনিয়া যে সে লোক যে ব্যবহার করিবে—ইহা তাঁহার অসহ্য বোধ হইল—তিনি তাঁহার একজন নবাব বন্ধুকে ৪০ মন ওজনের বাসন সমস্ত দান করিয়া গেলেন, তবু তাহা ঐ কারণে বিক্রয় করিলেন না।

লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের বাড়ীও একদিন আমরা দেখিতে গিয়াছিলাম, তিনি তখন পাহাড়ে, শূন্যগৃহ, সে সময় যে কেহ ইচ্ছা করে দেখিতে পায়। আমরা যাইতেই দ্বারবানেরা দরজা খুলিয়া দিল। বাড়ীটি একতলা একটি বড় বাড়ী, কোন কর্ম্মেরই নহে, আমাদের এখানে একজন বড় মানুষের বাড়ীও তাহা অপেক্ষা অনেক ভাল! লাটসাহেব না থাকায় বাড়ীটি তেমন সাজানও নাই, জিনিসপত্র অনেকটা লণ্ডভণ্ড অবস্থায়, দেয়ালে কতকগুলি কেবল বড় সুন্দর সুন্দর তেলের ছবি দেখিলাম।

এখানকার পার্কটি যদিও কলিকাতার পার্কের মত অত ভাল নহে, তবুও বেশ সুদৃশ্য ব্যাণ্ডষ্ট্যাণ্ডের চারিদিকে ঘাসের চক্রের মধ্যে বিলাতি ফুল ফুটাইয়া যে মখমল বিছানা পাতা হইয়াছে, তাহা বড় সুন্দর। শুনিলাম গরমিকালে যখন এলাহাবাদের মাটীতে কোথায় একটা সবুজ ঘাস থাকে না—চারিদিক মরুর মত ধূ ধূ করে, তখনও এই পার্কের ঘাসগুলি বহু যত্নে বাঁচাইয়া রাখা যায়,—আর চারিদিকের শুকনো মরুময় দৃশ্যের মধ্যে এখানকার সবুজ ভাবটি তখন বড়ই রমণীয় হইয়া উঠে। এখানকার এই পাকা ব্যাণ্ডষ্ট্যাণ্ডটি—এলাহাবাদ সহরের একজন প্রধান ব্যক্তি বাবু নীলকমল মিত্র নিজের ব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন—অথচ ইহাঁর নামটি ব্যাণ্ডষ্ট্যাণ্ডের এমন স্থলে খোদিত আছে—যে তাহা সহজে নজরেই পড়ে না।[৭]

এখানে পুকুর প্রায় নাই, যেখানে সেখানে পাতকুয়া, কিন্তু এখানকার কূয়ায় আর বাঙ্গলা দেশের কূয়ায় অনেক তফাৎ। এখানকার পাতকূয়া এত গভীর, যে নীচে চাহিয়া দেখিতে কেমন গা শিহরিয়া উঠে—সেই গভীর পাতকূয়ার কোন-তলায় একটু জল পড়িয়া আছে,—জল এত নীচে যে তাহা তোলা কম জোরের কর্ম্ম নহে। বেশী জলের আবশ্যাক হইলে প্রায়ই এখানে গরুতে কপিকলে টানিয়া জল তুলে—নহিলে ছোট ছোট লৌহপাত্র করিয়া মানুষেই

কপিকলে জল উঠায়। গরমিকালে কূয়ার জল আরো নামিয়া যায়, যা অল্পস্বল্প পুকুর আছে তাহাও সবই প্রায় শুকাইয়া পড়ে—কেবল লেপ্টেনেন্ট গভর্ণরের বাড়ির কাছে আকবরের সময়কার যে একটা বড় পুকুর আছে, আর রাজাপুর পল্লীতে ভাগনের তালাউ নামে একটি যে ছোটখাট পুকুর আছে—এবং আরও হয়ত এইরূপ একটা পুকুরে গরমিকালেও জল থাকে। ভাগনের তালাও এখানকার লোকেদের একটি ছোটখাট তীর্থ। রাজাপুরে আগে দুইটি পুকুর ছিল, একটি মামার—একটি ভাগনের—এখন মামার বাঁধান বড় পুকুরটি একেবারে শুকাইয়া ঘাসপূর্ণ হইয়াছে—আর ভাগনের সামান্য পুকুরটি জলপূর্ণ রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে গল্প এই—ধনী মামার সরকারে গরীব ভাগনে চাকর ছিল, মামাকে একটা পুকুর কাটাইতে দেখিয়া ভাগনেরও একটি পুকুর কাটাইতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু তাহার ত টাকাকড়ি নাই, সে সমস্ত দিন খাটে-খোটে, রাত্রে একটু করিয়া পুকুর কাটে, এইরূপে সে যখন একটি পুকুর করিয়া তুলিল, মামার তখন মহা রাগ হইল, মামা যশের লোভে পুকুর কাটাইতেছিলেন—সুতরাং ভাগনেকে যশের ব্যাঘাত স্বরূপ মনে করিয়া রাগিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন। কিছুদিন পরে মামার পুকুরের জল শুকাইয়া গেল (লোকদের বিশ্বাস ঐ পাপে) আর ভাগনের পুকুর পুণ্যপুকুর বলিয়া খ্যাত হইল। এই পুকুরের ধারে একটা উচ্চ জমির উপর গাছের তলায় এই ভাগনের নামে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা দেখিলাম। এক একটা বিশেষ সময়ে এই পুকুরের ধারে মেলা হইয়া থাকে, লোকে এখানে মাননা করিতে আসে, মাননা সিদ্ধ হইলে পূজা দিয়া যায়। রাজাপুরে ভাগনের পুকুরের কাছাকাছি রাস্তার ওপারে কতকগুলা ভাঙ্গাচোরা মসজিদ ও পুরাতন বাঁধান কূয়া বাড়ীর ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। মসজিদের নহবদখানাটি এখনো বেশ আছে, কিন্তু তাহার লাগাও যে মস্ত বাড়ী ছিল তাহার কিছুই নাই—সেখানে এখন মাঠ, চাষ হইয়াছে। বেশীদিন এ বাড়ী ভাঙ্গা হয় নাই, মিউটিনির সময় এ সকল একজন মোল্লার ছিল—বিদ্রোহী অপরাধে তাহাকে ফাঁসি দিয়া এ সম্পত্তি গবর্ণমেন্ট গ্রহণ করেন, ৮।১০ বৎসর মাত্র গবর্ণমেন্ট একটু একটু এই বাড়ী ভাঙ্গিয়াছেন, এখনো আশেপাশে দুই একটা মসজিদ আর এই নহবদখানা যা বাকী আছে। নহবদখানায় নাকি লেখা আছে, ইহা কেহ ভাঙ্গিতে পারিবে না। তবে গবর্ণমেন্টের ভাঙ্গিতে ইচ্ছা হইলে এই লেখার জন্য যে নহবদখানা রেহাই পাইবে তাহা ত মনে হয় না। শুনিলাম এইখানে জমির নীচে অনেক টাকা ছিল—গবর্ণমেন্ট পাইয়াছেন। এইরূপ ভাঙ্গাচোরা পুরাতন জিনিসের মধ্যে কতদিনকার স্মৃতি আমরা দেখিতে পাই—কালের বিচিত্র হস্তের কারুকার্য্য ইহার মধ্যে যেমন দেখা যায়—নূতন সুদৃশ্য বাড়ীতেও তেমন দেখা যায় না। তাই নূতন বিচিত্র অট্টালিকা হইতেও এইসব পুরাতন ভাঙ্গাচোরা জিনিস দেখিতে আমার ভাল লাগে।

এলাহাবাদে জিনিসপত্র সবই শস্তা—বিশেষতঃ মাছ মাংস। এখানে খুব ভাল পেয়ারা পাওয়া যায়—এখানকার পেয়ারা একটি প্রসিদ্ধ ফল।

এদেশের লোকেরা বেশ ভদ্র ও বিনয়ী, রাজনৈতিক উন্নতি সম্বন্ধে ইহারা বাঙ্গালীদের অনেক পশ্চাতে। এখানে রাজনৈতিক বিষয়ে যখন আন্দোলন হইয়া থাকে তাহা প্রধানতঃ

বাঙ্গালীদের উদ্যোগে। ইংরাজদের ভয়ে এদেশের ধনী লোকেরা পর্য্যন্ত এরূপ আন্দোলনে স্পষ্ট ভাবে যোগ দিতে সাহস পান না। সম্প্রতি এখানে এইরূপ একটি সভা হইয়াছিল—সভা আহ্বানকারীগণ এদেশের ক্রোড়পতি প্রধান ধনীকে ইহার আসন গ্রহণ করিতে বলেন—যদিও এ সভায় গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে কিছু বলিবার ছিল না, তথাপি কি জানি মেজিষ্ট্রেট কমিসনার যদি ইহাতেও অসন্তুষ্ট হন—এই ভয়ে তিনি যে কেবল সভাপতি হইতে অসম্মত হইলেন এমন নহে, এই সভার সহিত কোন সম্পর্কই রাখিতে চাহিলেন না। এদেশের উপকারার্থে কয়েকজন বাঙ্গালী একটা কোম্পানি করিয়া ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ান নামে এখানে একখানি সংবাদপত্র বাহির করিয়াছেন। সত্য কথা বলে বলিয়া গবর্ণমেন্ট আজকাল এইরূপ সংবাদপত্রের উপর অসন্তুষ্ট, তাই এদেশের ধনীরা প্রকাশ্য ভাবে ইহার সেয়ার না কিনিয়া বাঙ্গালীদের নামে বেনামী করিয়া সেয়ার কেনেন।

তবে এসব বিষয়ে এদেশ আগের অপেক্ষা অনেক আগুয়ান হইয়াছে। আগে এদেশে রাজাদের পর্য্যন্ত বড় ইংরাজদের নিকট জুতা খুলিয়া যাইতে হইত। যেবার কলিকাতায় গবর্ণর জেনেরল নিয়ম বাহির করেন যে বুট পায়ে থাকিলে খুলিতে হইবে না, সেবার সেই নিয়মের পর একজন রাজা সাহসে নির্ভর করিয়া বুট পায়ে দিয়া এখানকার কমিসনরের সঙ্গে দেখা করিতে যান,—কমিসনরের চাকরেরা তাঁহাকে মিনতি করিয়া জুতা খুলিতে বলে, রাজা বলেন, "যে বুট থাকিলে কমিসনর কিছু বলিবেন না—যদি বলেন—বলিও বুট ত সহজে খোলা যায় না"—এই কথা চাকররা কমিসনরকে বলায় তিনি তখনি একখান ছুরি চাকরকে ফেলিয়া দিলেন—অর্থখানা—বুট খোলা না যায়—কাটিয়া ফেলুক।" শম্ভুনাথ পণ্ডিত একবার এখানে আসিয়া এই কমিসনরের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু জুতা খুলিতে হইবে, শুনিয়া তিনি ফিরিয়া আসেন।[৮]

সম্প্রতি দু এক বৎসর হইল—নূতন আইনের একজন দেশীয় সিভিলিয়ান এক ইংরাজ সিভিলিয়ানের কাছে জুতা খুলিয়া যাইতেছিলেন—ইংরাজ তাঁহাকে বারণ করিয়া বলিলেন—"তুমি এখন আমাদের দলের লোক, তুমি জুতা খুলিবে কেন, তোমার বাপ যখন আসিবেন, জুতা খুলিয়া আসিবেন।" যা হক, প্রতিদিন রাজনৈতিক সম্বন্ধেও এদেশ অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতেছে।

ভারতী ও বালক, বৈশাখ-শ্রাবণ ১২৯৩

২

সমুদ্রে

স্বর্ণকুমারী দেবী

৬ই মে বেলা দ্বিপ্রহরের পর আমরা ডুনেরা ষ্টীমারে আসিয়া উঠিলাম। যাঁহারা আমাদের ষ্টীমারে রাখিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ঘন্টাখানেক পরে চলিয়া গেলেন, জাহাজও কিছু পরে জেটি ছাড়িল।

এই আমার প্রথম সমুদ্রযাত্রা নহে। প্রায় ১২ বৎসর পুর্ব্বে প্রথম বম্বে হইতে তিনদিনের সমুদ্রপথে কারোয়ার যাই, এবার যাইব নীলগিরি।[১] ভাগ্যক্রমে উভয়ই কর্ণাট প্রদেশভুক্ত, তবে কারোয়ার উপকূলবর্ত্তী সহর, নীলগিরি মান্দ্রাজ হইতে স্থলপথে আরো দুই দিনের পথ। দেখিতে দেখিতে দিন চলিয়া যায়—এইরূপ সকলেই বলেন, কিন্তু না দেখিলে দিন আরো দ্রুত চ'লে এইরূপ আমার অভিজ্ঞতা। এই দ্বাদশ বৎসর কালের প্রতিদিন যখন দেখিয়াছি তখন তাহা সুদীর্ঘকাল বলিয়া মনে হইয়াছে, জীবনের এক একটি ঘটনা মুহূর্ত্তকে নিদারুণ দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া তাহাকে যুগের স্থায়িত্ব প্রদান করিয়াছে; আর আজ কিনা সেই ১২ বৎসরের গতির প্রতি আমার দৃষ্টি নাই, তাই যুগটাকেও মুহূর্ত্তের মুষ্টির মধ্যে বর্ত্তমান দেখিতেছি। তবে আমার মনে হয়, অনন্তের কোল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মানুষ যদি তাহার জীবনের বিশেষ মুহূর্ত্তগুলিকে চিনিয়া বাছিয়া লইতে পারে, তাহা হইলে তাহাতে যুগযুগান্তরের ছাপ তখনো প্রত্যক্ষ করে।

আমরা যে স্টীমারে কারোয়ার গিয়াছিলাম তাহা বন্দরগামী ছোট ষ্টীমার, ডুনেরা ইয়োরোপগামী প্রকাণ্ড জাহাজ। এই জাহাজে চড়িলেই ইয়োরোপের গন্ধে, নাসিকা এমন পূর্ণ হইয়া উঠে যে, তাহার প্রত্যক্ষ স্বাদগ্রহণের জন্য মনের বিশেষতর একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়—অন্ততঃ আমার ত এই জাহাজে উঠিয়া ভারী বিলাত যাইতে ইচ্ছা করিতেছিল।

এ জাহাজের একপ্রান্তে সেকেন্ড ক্লাশ, অন্য প্রান্তে খালাসিদের থাকিবার জায়গা ও মালগুদাম, মধ্যদেশে ফার্ষ্ট ক্লাশ। ফার্ষ্ট ক্লাশ হইতে সেকেন্ড ক্লাশ অনেকটা দূরে, মধ্যের সুদীর্ঘ তক্তার উপর আর গৃহান্তরাল নাই, কেবল মুক্তাকাশ ব্যবধান। যাত্রীদের গৃহগুলি—যাহাকে বলে ক্যাবিন, তাহা জাহাজের দুই পাশে। আমাদের ফার্ষ্টক্লাশের দুই সার ক্যাবিনের মধ্যস্থলে অর্দ্ধাংশ জুড়িয়া এঞ্জিনঘর, পাশ দিয়া দুদিকের ক্যাবিনে যাতায়াতের লম্বা সুঁড়িপথ চলিয়া গিয়াছে, অপরার্দ্ধে ভোজনগৃহ, গৃহ সম্মুখে ছাতে উঠিবার সিঁড়ি, এবং সিঁড়ির আশেপাশে যাত্রীদের আরাম-কুশলতত্ত্বাবধারক কর্ম্মচারী ও দাসদাসীদিগের দুই একটি ঘর। ভোজনঘরের পাশে যেসব ক্যাবিন তাহার আর স্বতন্ত্র পথ নাই, এই ঘরের মধ্য দিয়াই তাহার পথ করিতে

হয়। জাহাজের ডেক অর্থাৎ ছাতের উপরেও ঘর আছে। ডেকের মধ্যস্থলে সিঁড়ির ঘর, ইহার এক- পাশে এঞ্জিনঘরের উপর পুরুষদের ধূমপান কক্ষ, আর অন্যদিকে ডিনারঘরের উপর লাইব্রেরি। এখানে একটি পিয়ানোও আছে। ঘরটি আমাদের দেশের চকমিলান বাড়ীর মত, আকার চতুষ্কোণ, মধ্যাংশ ভিত্তিহীন ফাঁকা ; প্রান্তদেশ বারান্দাকারে অনুচ্চবেষ্টিত। আলিসার ধারে দাঁড়াইয়া নীচের খাবার ঘর উঠানের মত চোখে পড়ে। পুরুষদের ধূমপান কক্ষের মত এই ঘরটি যদিও মেয়েদেরি বিশেষ সম্পত্তি নয়, তথাপি কার্যতঃ ইহা তাঁহাদেরই দখলে থাকে। দুপুরবেলা গরমের সময়ে ত কথাই নাই, এমন কি রাতে ক্যাবিনে বেশী গরম বোধ হইলে কিম্বা অন্য কোন কারণে সেখানে শয়নে সুবিধা বোধ না হইলে কেহ কেহ রাতেও এখানে আসিয়া শয়ন করেন। দুপুরবেলা ত অনেক সময়ই লাইব্রেরিতে পুস্তকান্বেষণে আসিয়া সোফায় কোন সুন্দরীকে শয়নামানা দেখিয়া পুরুষপ্রবর আস্তে আস্তে পশ্চাৎপদ হইয়া পড়েন।

আমাদের দুপুরবেলা টিফিনের হেঙ্গামা ছিল না ; আমরা প্রাতর্ভোজনান্তে দশটা সাড়ে দশটার পর হইতে বিকাল পর্য্যন্ত একখানা বই হাতে করিয়া মধ্যাহ্নের সমস্ত গরমটা অবিচ্ছেদে এই ঘরেই কাটাইয়া দিতাম। নীচের খাবার ঘর ও উপরের এই লাইব্রেরি দুই চারিটি বিচিত্র পত্রপুষ্পের টবে এমন সুন্দর সুসজ্জিত দেখায় কি বলিব! প্রথম দিন এই লাইব্রেরি ঘরে ঢুকিয়াই মনে হইল ঘরটি কি চমৎকার সাজান! কিন্তু তাহার পর নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম ইহার এত মনোহারী সজ্জা কেবল একটিমাত্র ফুটন্ত ফুলের সৌন্দর্য্যে। ঘরে পিয়ানোর কাছে একটি টবে অর্কিডে ফুল ফুটিয়াই ঘরটি এমন আলো করিয়া রাখিয়াছে। এই ঘরের পাশেই কাপ্তেনের ঘর।

আমরা জাহাজে আসিবার অল্পক্ষণ পরেই টিফিনের অর্থাৎ মধ্যাহ্ন ভোজনের ঘন্টা পড়িল। আমরা কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই বাড়ীতে অনুপস্থিতের প্রত্যাশা ছাড়িয়া উপস্থিতের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আসিয়াছি—কাজেই দ্বিতীয়বার আবার এত শীঘ্র চাণক্যদেবের অনুজ্ঞা পালন করিতে পারিয়া উঠিলাম না। আমাদের বিদায়দানে আগত সঙ্গীগণ এবার বুদ্ধিমানের পদবীটা একচেটিয়ারূপে দখল করিয়া লইলেন। জাহাজে ভোজের বন্দোবস্ত নবাবী রকমের। খাদ্যের যেমন বৈচিত্র্য, তেমনি পরিমাণ-বাহুল্য। যাত্রীদের বন্ধুবান্ধবগণ পর্য্যন্ত অবাধে এই ভোজে যোগদান করিতে পারেন। উঠিয়াই প্রত্যূষে ছোটহাজরী অর্থাৎ রুটি মাখন চা কফি প্রভৃতি ; তার পর সাড়ে ৯ টার সময় বড়হাজরী, প্রাতর্ভোজন—মাছভাজা, যবান্ন (পরিজ), মাংসের দুই তিন রকম পর্য্যায়, কারি ভাত, রুটি-মাখন, জ্যাম-ফল ইত্যাদি। বেলা একটার সময় টিফিন—মধ্যাহ্নভোজন। খাদ্যপর্যায় সংখ্যায় প্রায় সকালেরই মতন, বাড়ার ভাগ সুপ এবং কমার ভাগ যবান্ন ও কারিভাত। সান্ধ্যভোজনে কেবল যবান্ন ছাড়া উক্ত উভয় সময়ের খাদ্যাদি প্রায় সমস্তই আছে, অধিকন্তু মধুরেণ সমাপয়েৎ, মাংসাদির শেষে প্রায় দুই রকম পুডিং থাকে। অবশ্য এই তিনবারের মাংস পর্য্যায় যে ঠিক একই রকম তাহা নহে—ইংরাজি ভোজের দস্তুরে রুচি বদলের জন্য প্রতিবারেই কিছু না কিছু পরিবর্ত্তিত। চা কফি যদি খাইতে চাও, তাহাও প্রতি ভোজনের সঙ্গে আছে, ইচ্ছা করিলেই পাইতে পার—মদ্যাদির কথা বলা বাহুল্য।

এককথায় তিনবারই ইংরাজি মহাভোজের আয়োজন, আর এই তিনবারের প্রতিবারেই ইংরাজ তনয়-তনয়াগণ উক্ত খাদ্য-পর্য্যায়সমূহের যথাযোগ্য সম্মান রক্ষা করিয়া থাকেন। এই আলস্যের জীবনে বিনা পরিশ্রমে কিরূপে তাঁহারা এরূপ দৈত্যক্ষুধা সংগ্রহ করেন, আমাদের নিকট তাহা একটি রহস্য প্রহেলিকা! বেশী খাইলে বুদ্ধি মোটা হইয়া যায়, এই ত সাধারণ বিশ্বাস। আমাদের ব্রাহ্মণ জাতি ফলমূলাদি স্বল্পাহারে জীবন ধারণ করাতেই তাঁহাদের বুদ্ধি বিশেষ ধারাল সূক্ষ্ম হইয়া উঠিত, ইহাই আমরা মনে করি। ইংরাজেরা এত অধিক খাইয়াও যেরূপ বুদ্ধির পরিচয় দেন—কম খাইলে তাঁহাদের বুদ্ধি কিরূপ সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মে পৌঁছিত কে জানে? কিম্বা আমি জাহাজের দৃষ্টান্তে বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মবুদ্ধি ইংরাজদিগের খাদ্য তুলনা করিয়া ভুল করিতেছি; হয়ত বা মানসিকবৃত্তি অনুশীলনকারী ইংরাজেরা প্রকৃত প্রস্তাবে অল্পই আহার করিয়া থাকেন। যাহাই হউক, আহার্য্যের প্রতি যাঁহাদের অনুরাগ তাঁহাদিগের প্রতি ব্যবস্থা এই, শরীরের জন্য পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলে তাঁহারা যেন ইংরাজ কোম্পানীর জাহাজে সমুদ্রযাত্রা করেন। এ সম্বন্ধে এত আয়েস আর কুত্রাপি পাইবেন না।

জাহাজ ছাড়িয়া দিলে আমরা ছাতে আসিয়া তীরের গতিশালী বিচিত্র শোভা দেখিতে লাগিলাম। বিজ্ঞানবিচক্ষণ পাঠিকা আমার ভ্রমসংশোধন করিবেন সন্দেহ নাই—কিন্তু তাহার উত্তরে আমি বলিতে পারি, পৃথিবী সূর্য্যকে অনবরত ঘুরিয়া মরা সত্ত্বেও যদি সূর্য্যকেই আমরা গতিশীল আখ্যা দিতে পারি, তাহা হইলে তীরের এই দৃশ্যতঃ গতি হইতে তাহাকেই বা গতিশীল না বলিব কেন ? অন্ততঃ আমি না বলিলেই যে এইরূপে উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে চাপান রহিত হইয়া যাইবে তাহা নয়। তাহার দৃষ্টান্ত—রমণি ! তুমি যে তোমার স্বার্থত্যাগী নীরব মহাপ্রেমের তরঙ্গে ধীরে ধীরে কত কঠিন পাষাণ দ্রব করিয়া সংসারের সুকুমার কোমলতা বৃদ্ধি করিতেছ তাহা কেহ দেখিতেছে না, তাহাদের নিজের প্রবৃত্তির গতি-অনুসরণে তোমার কটাক্ষে চাঞ্চল্য আর হৃদয়ে চপলতা উপলব্ধি করিয়া চিরকাল কেবল তোমার নিন্দাই করিয়া আসিতেছে। সংসার যখন আসৃষ্টি এইরূপ ভ্রমসঙ্কুল, আর আবিপ্লবই এইরূপ থাকিবে বলিয়া কথিত—তখন আমার সামান্য একটা ভ্রমে তাহার আর ক্ষতিবৃদ্ধি কি ? এই ভাবিয়া আমার ভ্রমটি ঠিকই রাখিয়া দিলাম।

তীরের গতিশালী শোভা অতি বিচিত্র। আমরা পূর্ব্বদিকের ডেক হইতে দেখিতেছি, সুতরাং নদীর পূর্ব্ব তীর অর্থাৎ যেদিকে কলিকাতা তাহাই মাত্র আমাদের নয়নে উজানে ভাসিয়া চলিয়াছে; সহরের গায়ে গায়ে ঘেঁসাঘেঁসি বাড়ীর সার ক্রমে অন্তর্হিত, শ্যামল উদ্যানের মধ্যে পাশাপাশি সুন্দর শ্বেত সুবৃহৎ বাড়ীগুলি একটির পর একটি দেখা দিয়া দিয়া পুরস্কার গ্রহণে সমাগত ছাত্রদিগের ন্যায় একে একে সরিয়া পড়িতেছে। আমি এই গতিশীল উপবনের মধ্যে বটানিক্যাল গার্ডেনটি চিনিয়া লইব বলিয়া নতমুখ হইয়া আছি, তীরের প্রত্যেক সোপানাবলীতে নয়ন নির্দ্দিষ্ট করিয়া ঈপ্সীত ধাপগুলি দেখিতে পাইতেছি না; তবুও নিরাশ নহি, সেই বহুপরিচিত বিচিত্র অসাধারণ প্রকাণ্ড লৌহ-ধাপ কি আমার চক্ষু এড়াইতে পারে ? এক সময় না এক সময় তাহা ধরা দিবেই, এই ভাবিয়া অতি বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত হইয়া আছি। কিন্তু যখন খিদিরপুর

ছাড়াইয়া জাহাজ রাত্রের মত সেখানে স্থায়ী হইল তখন বুঝিলাম—অতিবিশ্বাস কেবল স্ত্রী ও রাজকুলেই আর অতিনিশ্চিন্ততা কেবল রাজমন্ত্রি ও পরীক্ষাব্রতধারী ছাত্রের পক্ষেই হানিজনক নহে। বেশী বিশ্বস্ত, বেশী নিশ্চিন্ত হওয়াতে কোম্পানীর বাগানের সেই প্রকাণ্ড লৌহ-ধাপগুলা পর্য্যন্ত আত্মদোষের মত আমার নজর এড়াইয়া গেল। কোম্পানীর বাগানের স্থূল ধাপের অদর্শনে এই সূক্ষ্ম দর্শন লাভ করিয়া অতঃপর কথঞ্চিৎ সুস্থ হৃদয়ে সূর্য্যের অস্তমান রূপ দেখিবার অভিপ্রায়ে পূর্ব্ব ডেক হইতে পশ্চিম ডেকে আসিয়া দাঁড়াইলাম। অন্যদিকের মত এদিকে জাহাজের কোন বেঞ্চ নাই, বসিতে হইলে নিজের নিজের চৌকিতেই বসিতে হয়। আমাদের চৌকিগুলি এই ডেকেই ছিল। আসিয়া দেখিলাম চৌকিতে অন্য লোক। আমি ত বলিতে পারি না, "তোমরা আমার আসন ত্যাগ করিয়া আমার অধিকার আমাকে প্রদান কর।" এই সভ্যতার দিনে আবশ্যকস্থলে জোর করিয়া অন্যের অধিকার গ্রহণ করিতে পারিলে তাহা প্রশংসার কাজ, কিন্তু অনাবশ্যক স্থলে অর্থাৎ যেখানে তোমার অধিকারহানির কোনই সম্ভাবনা নাই সেখানে স্বার্থত্যাগের ভাণ না করিলে তাহা বর্ব্বরতা। যাহা হউক, আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়-ভাবে অগ্রসর হইতেই একজন ললনা দাঁড়াইয়া উঠিয়া সস্মিত বদনে বলিলেন—"আপনার চৌকি ?" সন্দেহভঞ্জক উত্তর পাইয়া নিরর্থক শূন্যগর্ভ অথচ ভদ্রতার অবশ্যংগত মৌলিক উপাদানস্বরূপ যে কয়েকটি ফাঁকা মৌখিক বিনয় বাক্য মানব সমাজে অনবরত মিথ্যা প্রচার করিতেছে,—তাহারই একটি—"ক্ষমা প্রার্থনা করি", এই বাক্যে মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের বিকৃত অবস্থাটাকে বেশ প্রকৃতিস্থ করিয়া লইয়া বলিলেন—"আপনাকে চৌকিখানি কি সরাইয়া দিব ?" ইচ্ছা করিলে আমি নিজেই সরাইতে পারি—সে ক্ষমতাটুকু আমার আছে, সুতরাং অনর্থক কৃতজ্ঞতা ভারাক্রান্ত হইতে ইচ্ছা না করিয়া তাঁহাকে সাধুবাদ দিয়া বলিলাম, "না"। বলিয়াই তাঁহার কথার প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিলাম। আমার সুবিধার জন্যই যে তিনি নিতান্ত নিঃস্বার্থভাবে চৌকিখানি সরাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহা নহে। আমি একটু দূরে বসিলে সেইখানেই অন্য দুইখানি চৌকিতে বসিয়া তাঁহারা নির্জ্জনালাপ করিতে পারেন, এই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু আমার মূঢ়তাবশতঃ তাহা হইল না—তাঁহারা উঠিয়া জাহাজের আলিসার কাছে দাঁড়াইলেন, আমিও কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই অনুতপ্ত হইলাম। এমন কাজও মানুষে করে ! তাঁহাদের বিদায়কালের একত্রে নির্জ্জনোপবেশন সুখটুকু হরণ করিলাম । না হয় আরো ক্ষাণিকক্ষণ অন্য ডেকেই থাকিতাম ! যাহা হউক, চোর পালাইলে আর অনুতাপের ফল কি ? লোকে বলে বটে ফল আছে, কিন্তু আমার জীবনে ত এ পর্য্যন্ত তাহার প্রমাণ পাইলাম না। চিরদিনই চোর পলাইতেছে, আর বুদ্ধিও যোগাইতেছে—কিন্তু ঠিক সময়ে কোনদিনই ঠিক কাজ বা ঠিক কথাটি যোগাইল না ! হায় হায় ! মানুষ মুহূর্ত্তকে ফিরাইতে পারিলে কি-না দিতে পারিত ! কিন্তু ভাগ্যিস আমাকে এ কথার প্রমাণ দিতে হইবে না !

৬টায় ডিনারের পূর্ব্ব ঘন্টা। সাড়ে ছয়টায় দ্বিতীয় ঘন্টা বাজিতে নীচে আসিয়া দেখিলাম, পথে পথে ঘরে ঘরে বিদ্যুতালোকের জ্যোৎস্না। ধূম নাই, গন্ধ নাই, জ্বালাইতে নিভাইতে কোন জ্বালা যন্ত্রণা নাই, দীপসংলগ্ন ক্ষুদ্র কলদণ্ড উঠাও, দপ করিয়া সহসা জ্বলিয়া উঠিবে,

নামাও, তৎক্ষণাৎ নিভিয়া যাইবে। সেদিন ক্যাবিনে আসিয়া কতবার যে আমি বিদ্যুৎ প্রদীপের কানটা উপর নীচে নাড়া দিয়াছিলাম তাহার ঠিক নাই। কলিকাতায় ঘরে ঘরে পথে পথে কবে এইরূপ বিদ্যুতালোক জ্বলিবে ?

ছাতের উপর ঠিক সন্ধ্যাতেই দীপ জ্বলে না, ডিনারের পর সকলে উপরে আসিলে তাহার একটু বাদে বিদ্যুতালোকে ছাত উজ্জ্বল হইয়া উঠে। আমার কিন্তু ছাতের অন্ধকারে বসিয়া থাকিতেই ভাল লাগিত। আকাশের চন্দ্রতারকা-জ্যোতি চারিপাশের অন্ধকারের মধ্যে চোখে যেমন পরিপূর্ণ শোভায় ফুটিয়া উঠে, বিদ্যুতালোকের তীব্রতার মধ্যে তেমন নহে। আকাশের সেই সুগম্ভীর সৌন্দর্য্যকে মর্ত্ত্যের এই জ্যোৎস্নাসুন্দরীর পাশে যেন সত্যের প্রতি পরিহাস—ক্ষুদ্রের ফেনায় মহৎকে ঢাকিবার প্রয়াস বলিয়া মনে হয়।

এইখানে প্রতি সন্ধ্যায় আরব্য উপন্যাসের গল্পের মত একটি কৌতুকজনক দৃশ্যের অভিনয় হইত। কোথা হইতে কে জানে একবার তীক্ষ্ণ বাঁশির স্বর উঠিত, অমনি খালাসির দল, জাহাজপ্রান্তে আলিসার ধারে আসিয়া সার দিয়া দাঁড়াইত ; আবার বাঁশি বাজিত, তখনি নিঃশব্দে চলিয়া যাইত। এই খালাসিরা সকলেই বাঙ্গালী মুসলমান। একদিন আমি তাহাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমরা প্রতিদিন এইরূপে দাঁড়াইয়া আবার তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাও কেন ?" তাহারা যাহা বলিল তাহা হইতে বুঝিলাম, বাঁশি বাজিলেই তাহারা জলিবোটের কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, বুঝিলাম এ তাহাদের অসময়ের আবশ্যকের জন্য দৈনিক অভ্যাস রক্ষা, ঝড়ের সময় পরের প্রাণরক্ষার জন্য নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়া থাকা। কি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ সমস্ত কার্য্যেই এইরূপ 'যদি' ভাবিয়া ইয়োরোপীয় সমাজ প্রতিদিন যেরূপ কষ্ট স্বীকার করে—তাহাতেই তাহাদের সহিত আমাদের মূলগত পার্থক্য। অনাবশ্যকে আমাদের অসি এমন ভোঁতা হইয়া যায় যে কার্য্যস্থলে তাহা আর ব্যবহারে লাগে না। ইংরাজের অসির উপর আবশ্যক অনাবশ্যকে সকল সময়েই সমানে শান পড়িতেছে।

৭ই মে প্রাতঃকালে জাহাজ খিদিরপুর ছাড়িল। বিকালে ডায়মন্ডহারবারে আসিয়া সে রাত্রি সেখানেই স্থিতি। এখনো সমুদ্রে আসিয়া পড়ি নাই, এটা সমুদ্র ও নদীর মোহানা, অত্যন্ত সুবিস্তৃত, কবিতার ভাষায় কূলকিনারাহীন বলিলেও চলে,—কিন্তু আসলে এখনো কূলকিনারা ঠিকই আছে। সন্ধ্যার দিকে জাহাজে অনেকগুলি নূতন লোকের সমাগম হইল। যাত্রীর সংখ্যা অল্প, তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবের সংখ্যাই অধিক। জাহাজের স্বজনতা বৃদ্ধির আশায় পূর্ব্বাগত ইংরাজ যাত্রীগণ মহা আহ্লাদ সহকারে তাঁহাদের আগমন দেখিতে লাগিলেন। আমরাও নিরানন্দে ছিলাম না। আমাদেরও একজন স্বজাতীয় বন্ধু এই সঙ্গে সমাগত হইলেন, তিনি যাইবেন সিলন। লঙ্কাদ্বীপ না বলিয়া সিলন বলিলাম, ইহাতে যেন কেহ না এমনটা মনে করেন যে বঙ্গ সাহিত্য হইতে এ নামটা লোপ করাই আমার অভিপ্রেত। তাহা নহে, লঙ্কাদ্বীপ বলিলে তাহার যে পুরাতন মাহাত্ম্য লইয়া সে আমাদের মনে আবির্ভূত হয়, আধুনিক সিলন সে মাহাত্ম্যহীন; তাই পুরাতনের সঙ্গেই সেই নামটার যোগ্য যোজনা দেখিতে পাই। যে লঙ্কা আগে দশমুণ্ড রাবণের অগম্য রাজধানী ছিল, যাহার তেজে বীর হনুমানও দগ্ধীভূত, ইংরাজের সিলন কি সে

তেজের কিছু পরিচয় দেয় ? রাক্ষসের পরিবর্ত্তে মৃদুস্বভাব ক্ষীণদেহ প্রশান্ত বৌদ্ধদিগের দ্বারা তাহা এখন পরিপূর্ণ, লঙ্কার তেজ, লঙ্কার তীব্রতার তাহাতে পরিপূর্ণ অভাব। সুতরাং ইংরাজরাজ্যে তাহা সিলনই, লঙ্কা নহে।

বন্ধুবরের নিকট শুনিলাম আমাদের নরিস সাহেব তাঁহার কোন বান্ধবীকে জাহাজে পৌছিতে আসিয়াছেন। নবাগত যাত্রীদিগের জন্য সেদিন ডিনারের অনেকটা বিলম্ব হইল, সাতটারো পরে দ্বিতীয় ঘন্টা পড়িল। তখন সকলেই ভোজনগৃহে সমাগত হইলেন। ঘরের দুইপাশে দুইটি সুদীর্ঘ টেবিল, টেবিলের চারিদিকে গদিআঁটা চৌকি, চৌকির পায়া জাহাজের তক্তায় একেবারে আঁটা, ইচ্ছা করিলে চৌকি ঘুরান ফিরান যায়, কিন্তু একেবারে অন্যস্থানে সরান যায় না। আবশ্যক হইলে ঘরের আশেপাশে আরো ছোট ছোট টেবিল পাতা হয়, কিন্তু এ যাত্রায় এই দুই টেবিলই পূরিত না, তা আবার অতিরিক্ত টেবিল ! নবাগত যাত্রীগণের বন্ধুবান্ধবের কৃপায় কেবল সেদিন ঘরটা যা জমজমাট হইয়া উঠিয়াছিল। আমাদের পূর্ব্ব-অধিকৃত টেবিলপ্রান্তেই আমরা আসিয়া বসিলাম, জাহাজে ভোজনগৃহে যে চৌকিখানিতে যে একবার বসিতে আরম্ভ করে, সেখানি তাহারি সম্পত্তি হইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য, আমাদের বন্ধু আমাদেরই কাছের একখানি চৌকি দখল করিয়া লইলেন। জাহাজের ডাক্তার সাহেব তাঁহার দক্ষিণে, তিনি ঔৎসুক্য সহকারে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"নবাগতদিগের মধ্যে নরিস সাহেব কে ?" আমারও তাঁহাকে দেখিবার কৌতূহল জন্মিল। অবশ্য আমি তাঁহাকে আগে দেখিয়াছি—তবে বহুজনের মধ্যে ; তাই চেহারাখানা ঠিক মনে পড়িতেছিল না। বন্ধুবর অতি সংক্ষেপে এইরূপে তাঁহার পরিচয় দিয়া দিলেন, "এঁদের মধ্যে যাঁর গোঁপ কামান"। জাহাজের দু'সার টেবিলের আট সার চৌকি প্রায় সেদিন লোকে ভরা, তাহার মধ্যে গুম্ফহীন দলেরও অভাব নাই। এই হৃতকেশ মসৃণ মুখমণ্ডলীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া হতাশ হইয়া আমি বুঝিলাম, দময়ন্তীর দিব্য দৃষ্টি না পাইলে নরিস সাহেবকে ইহার মধ্যে চেনা আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে ডাক্তারের আমার মত হতাশ হইবার কারণ ছিল না, কেননা নরিস ছাড়া আর যাঁহাদের গোঁপ কামান তাঁহারা সকলেই জাহাজের কর্ম্মচারী, ডাক্তারের পরিচিত। আহারান্তে তখনি নরিস সাহেব ডায়মন্ডহারবারের কলিকাতামুখী ট্রেণ ধরিতে চলিয়া গেলেন।

৮ই সকালে জাহাজ ডায়মণ্ডহারবার ছাড়িল। বেলা ৮/৯ টার সময় সমুদ্রপক্ষীগণ জাহাজের কাছাকাছি উড়িয়া, উঠিয়া, জলে পড়িয়া সমুদ্রের প্রথম নৈকট্য সূচনা করিল। ইহারা চিলের মত দেখিতে, কেবল শ্বেতবর্ণের—দুই একটি কালো রংয়েরও দেখিলাম।

দেখিতে দেখিতে জলের ঘোলা রং সবুজ হইয়া পড়িল। আমার মনে ছিল গঙ্গা যমুনার মিলনের মত নদীসমুদ্রসঙ্গমে ঘোলা ও নীল জলের মিলন দেখিব, সেইজন্য আমি সকাল হইতে এক দৃষ্টিতে জলের দিকে চাহিয়া আছি, কিন্তু বিধাতা দেখিতেছি আমার কপালে এ যাত্রা নৈরাশ্যই কেবল লিখিয়াছেন। কিম্বা এ আমার কপাল বলিয়াই নহে, যেখানেই আকাঙক্ষার তীব্রতা—সেখানেই এইরূপ নৈরাশ্য ? আশা আকাঙক্ষা কতদূর সম্ভব বা অসম্ভব, সুলভ বা দুর্লভ তাহার বিচার করিয়াই এতদিন তাহার সফলতা বা বিফলতার সম্ভাবনা স্থির করিতে

শিক্ষা করিয়াছি,—কিন্তু এখন দেখিতেছি আকাঙ্খার সম্ভাব্যতা অসম্ভাব্যতার উপর যতদূর না হউক তাহার তীব্রতার পরিমাণের উপরেই প্রধানতঃ সিদ্ধি বা অসিদ্ধি নির্ভর করে। দেখ না যেদিন তোমার রাঁধুনী বামুন পলাইয়াছে, ঘরে শুধু পান্তাভাতেরই ব্যবস্থা—যেদিন প্রাণ মনে ইচ্ছা করিতেছ আজ যেন বাড়ীতে কেহ অতিথি না আসে, সেইদিনই তোমার ঘরে লোকের আমদানি! আর যেদিন কারো বাড়ী হইতে সওগাৎ পাইয়া তুমি তোমার আত্মীয়কে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছ—সেদিন নিশ্চয়ই তাহার অসুখ। যেদিন ঘরের ঘোড়ার পায়ে চোট লাগায় সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়ীরও অভাবে থার্ড ক্লাশেই তোমার পরিবারবর্গকে তুলিয়া রেলগাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া তুমি দারুণ চিন্তায় জরজর, যে রাস্তায় গাড়ী ভাঙ্গিয়া তোমার গৃহিণীর রূপকান্তি এবং তৎসঙ্গে রাস্তায় গাড়ী ভাঙ্গারূপ ঘটনার বিকৃতিতে দর্শকের মনে পাছে একটা বিপর্যায় হাস্যকর অসঙ্গতির ভাব উদ্রেক করে এবং খবরের কাগজে দিনকতক ধরিয়া ইহার বিপরীত আন্দোলনে তোমাকে বিব্রত করিয়া তোলে, সেইদিন নিশ্চয়ই পথে তোমার গাড়ীখানি ভাঙ্গিয়াছিল কিনা স্মরণ করিয়া দেখ। আর যেদিন কোন মহারাজার চৌঘুড়িযুক্ত খোলা গাড়ী ধার পাইয়া মহা দম্ভে গুম্ফে তা দিতে দিতে অত্যন্ত ঔৎসুক্য সহকারে রাস্তায় বড়বাজারের সেই জহুরিটাকে খুঁজিতেছ,—যে নির্বুদ্ধি একটা সামান্য ৫০ টাকার আংটি জাঁকড়ে ভিন্ন তোমাকে বিশ্বাস করিয়া ছাড়িয়া দেয় নাই! সেদিন শুধু সে জহুরিটা কেন, কোন একটি সামান্য পরিচিতের মুখও তোমার নজরে পড়ে না। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে নিষ্কামবাদীরা তোমাকে ভোগ বঞ্চিত করিবার কু অভিপ্রায়েই কামনাহীন হইতে বলেন না, নিষ্কাম হইলেই মাত্র পূর্ণকাম হইবে, অর্থাৎ যদি চাহ ত পাইবে না, যদি না চাহ ত পাইবে, আকাঙক্ষা পূরণের এই যে অব্যর্থ উপায়, ইহাই মাত্র তাঁহারা শিক্ষা দিয়া থাকেন। তুমি বলিবে কেন আকাঙক্ষা কি পূর্ণ হয় না?—আমার উকীল হইতে ইচ্ছা ছিল—তাহাও হইয়াছি এবং জজের উচ্চ সিংহাসনে বসিবার ইচ্ছা আছে, বাক্যবলে তাহাও দখল করিব জানিতেছি।

ইহার উত্তর—আমি এতক্ষণ আকাঙক্ষার কথাই বলিয়াছি, সাধনার কথা বলি নাই, তুমি সাধনা ও আকাঙক্ষাকে এক করিতেছ। সাধনায় সর্ব্ব আকাঙক্ষাই সিদ্ধ হয়, তাহার নিকট কিছুই দুরাকাঙক্ষা নহে, ইহা অতি সত্য। তুমি সাধনার বলে উকীল হইয়াছ, সাধনার বলে জজও হইতে পার, কেবল কথার ছলে বা আকাঙক্ষার ফলে নহে। আমরা বাঙ্গালী জাতি আকাঙক্ষা করিয়াই নিশ্চিন্ত, সাধনা করিতে জানি না, তাই একুল ওকুল দুকূলই হারাই। না প্রকৃত নিষ্কামের স্বর্গীয় শান্তিসুখ লাভ করি, না সাধনার অব্যর্থ পার্থিব মহাসিদ্ধি আয়ত্ত করিতে পারি!

এ কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি? যেখানেই আসিয়া পড়ি তাহাতে যদিও দুঃখ নাই, স্ত্রীজাতির নানা অপবাদের মধ্যেও তাহার নীরব সহিষ্ণু বলিয়া যে সুনামটুকু আছে এই নৈরাশ্যপ্রলাপে সেটুকুরও যে অপলাপ করিলাম, ইহাই দুঃখ রহিল। তবে ইহাতে নারীজন-সুলভ অসঙ্গতির অভাব না দেখিয়া পাঠকদিগের দুঃখ ভরসা করি দূর হইবে।

ঘোলাজলের রাজ্য পার হইয়াছি। চারিদিকে সবুজের স্রোত বহিতেছে, কেবল কখন যে

ঘোলাজল ঘুচিয়া সবুজ আরম্ভ হইল, কূল হইতে অকূলে ভাসিলাম, তাহা বোঝাই গেল না। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের সেই বিশাল ঘোলা জলরাশির লেশও যেন ইহার আশেপাশে কখন ছিল না; যেন চোখের উপর এই সবুজ জলের তরঙ্গই আজীবন বহিতেছিল! পুরুষের নূতন প্রেমে পুরাতন প্রেম কিরূপে বিলীন হইয়া যায় ইহা তাহার একটী সদ্দৃষ্টান্ত।

সমাচার পাওয়া গেল 'বে অফ্ বেঙ্গল' অতিশয় প্রশান্ত, ঝড়ের কোন সম্ভাবনা নাই। বঙ্গোপসাগর অবশ্য এখনও দূরে, কি করিয়া ইহার মধ্যেই জাহাজের লোকে তাহা জানিলেন জানি না। ক্যাপ্টেন তাঁহার ঘরের ছাতে অর্থাৎ ত্রিতল ছাতে বসিয়া দূরবীণ কসিতেছিলেন, তাহা দেখিয়াছি। বোধ হয় তাহাতেই সন্ধান পাইয়া থাকিবেন। এই সুসংবাদে যাত্রীগণ বিশেষ স্ফূর্ত্তি লাভ করিলেন।

আমরা এখন প্রকৃতই অকূল পাথারে চলিয়াছি! সমুদ্রের জল আর সবুজও নয়, অতি সুন্দর গাঢ় নীল জলরাশির তরঙ্গে তরঙ্গে শ্বেতোচ্ছ্বাস ফেনা উঠিয়া উঠিয়া আবার সুনীলে মিলাইয়া পড়িতেছে। যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল অতল অকূল সুনীল বিশাল জল-স্রোত, অথচ ইহাতে সে অকূল দুস্তর ভয়াবহ ভাব নাই, সমুদ্রের সঙ্গে সঙ্গে আজন্মকাল যে অসীমতা কল্পনা করিয়াছি তাহাও নাই। একদিকে ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ আপনার সুবিশাল বাহুদ্বয়ের প্রসারণে উভয় পার্শ্ব হইতে সিন্ধুকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া তাহার দিগদিগন্তব্যাপী অসীমতাকে সীমা প্রদান করিয়া শিশুর মত ক্ষুদ্র করিয়া ফেলিয়াছে ; অন্যদিকে এই ক্ষুদ্র জাহাজ স্বকৌশল প্রভাবে বিশাল সমুদ্র প্রভাবকেও আয়ত্তবন্দী করিয়া তাহার দুস্তর অকূল ভাব হরণ করিয়াছে। সমুদ্রের মাঝে মাঝে ঐ যে এক একটা ভাসমান লাইটহাউস ও নোঙ্গর দেখিতেছি তাহাও এই অকূলের কূল—ইহাকে তবে ভয় করিবার কি আছে? অবশ্য ঝটিকাশূন্য নিস্তরঙ্গ প্রশান্ত সমুদ্রের দিকে চাহিয়া আমার মনে এই ভাবের উদয় হইয়াছিল,—সমুদ্রের ঝটিকাশালী প্রতাপের মধ্যে পড়িলে যে বিপরীত ভাবই মনে জাগিয়া উঠিত তাহা বুঝিতে পারি। এখন কেবল মনুষ্যের প্রভাবই দেখিতেছি। এই অকূল সমুদ্রে স্থলের সামান্য সুবিধাটুকুও হারাই নাই, বরঞ্চ সেখানে যেসব আয়েস-আবশ্যক হাতের কাছে মেলে না, এখানে হাত বাড়াইলেই তাহা পাওয়া যায়। ইস্তক উপন্যাসখানি হইতে নাপিতটি পর্য্যন্ত তোমার হাতের কাছে। খাদ্যাদির আয়েসের কথা ত আগেই বলিয়াছি, কিন্তু কেবল সে সম্বন্ধে নহে, সমস্ত বিষয়েই তোমার ইচ্ছায় ইঙ্গিৎ বুঝিয়া দাসদাসীগণ তোমার অনুজ্ঞা পালন করিতেছে, তোমার আয়েস আরাম সুবিধা আবশ্যক রুচি যোগাইতেছে। মর্ত্ত্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার যদি কোথাও থাকে ত সে জাহাজে। না ফুরাইতেই বন্দরে বন্দরে তাহার প্রচুরতা কানায় কানায় ভরিয়া উঠিতেছে।

সমুদ্রভ্রমণের যে উপদ্রব ঝটিকা এবং সমুদ্র-পীড়া, এতদুভয়ের কোনটিরই মুখাবলোকন না করিয়া এবং এই সঙ্গে রেলগাড়ীর ঘটঘটানী, স্নানাহারের সময়াভাব, কয়লার গুঁড়ায় চোবানি প্রভৃতি মনে পড়িয়া আমি সমুদ্রভ্রমণের বিলক্ষণ পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছি। এতদূর যে কেহ বাজি রাখিতে আসিলে আমি জোর করিয়া বাজি রাখিতে পারিতাম—যে যাত্রীগণ সকলেই আমার সহিত এ সম্বন্ধে একমত হইবেন। কিন্তু ঘরের মধ্যেই দেখিতেছি মতভেদ, আমার

এই সজোর পক্ষপাতিত্ব দেখিয়া আমার স্নেহাস্পদ অভিভাবক বলিলেন, "সমুদ্রের এই সব সুবিধা সত্ত্বেও তিনি রেল যাত্রা অধিকতর পছন্দ করেন,—কেন না জাহাজে মরিলে ডাঙ্গা পাইবার যো নাই, জলে ফেলিয়া দিয়া যায়!"

আমি জাহাজের অন্য সমস্ত আয়েসের কথা বলিয়াছি কিন্তু ইহার সর্ব্বোচ্চ সর্ব্বপ্রধান আয়েসের কথা এখনও বলা হয় নাই। জাহাজে শ্বেত-কৃষ্ণের, জেতৃ-বিজেতৃর বিজাতীয় উচ্চনীচ বিদ্বেষ ভাব অনুভব করা যায় না, অন্ততঃ আমি ত করি নাই। এই বিশাল সমুদ্রে ভাসমান ক্ষুদ্র জাহাজখানিতে ক্ষণকালের জন্য যে কয়েকটি ক্ষুদ্র জীব অদৃষ্টের অপূর্ব্ব যোজনায় একত্রে ভাসিয়াছে, তাহারা সকলেই মনুষ্য, প্রকৃতভাবে সহযাত্রী। একজন অন্যের সুবিধার অসুবিধার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া চলে। মনুষ্যত্বের একতার এই স্বাদটুকুই এখানে সর্ব্বাপেক্ষা সুস্বাদু; উপভোগ্য, আরাম। এখানে দাসদাসীর নিকটেও তুমি যেমন সম্মানীয় একজন ইং-রাজও তেমনি, কিছুই ইতর বিশেষ নাই। এমন কি জাহাজে বসিয়া ইংরাজের বুদ্ধি কৌশলের তারিফ করিয়া তুমিও গর্ব্ব অনুভব কর; কেননা এখানে কেবল সে ইংরাজ, তুমি বাঙ্গালী নহ, উভয়েই সমান মনুষ্য, মনুষ্যের যাহা খ্যাতি তাহা তাহার হইলেও তোমারো বটে। কিন্তু এই মুহূর্ত্তে যখন আমি জাহাজ হইতে বহুদূরে, তখন আর ঠিক সে ভাবটি আমার মনে উঠিতেছে না। এখন ক্ষুদ্র জাহাজের সেতুতে সেই দুস্তর সাগর অতি সুখে লঙঘনের কথা ভাবিয়া কেবল মনে হইতেছে যে ইংরাজ তুমিই ধন্য! তুমি বলিয়াই এরূপ অসাধ্য সাধনা করিয়াছ, তোমার জন্যই আমরা তরিতেছি। আমাদের আর্য্যগৌরবাভিমানী স্বদেশবৎসল এ কথার উত্তরে তীব্র কটাক্ষ করিয়া বলিবেন, পূর্ব্বে এ দেশের কাঠবিড়ালীতে সেতু বাঁধিয়াছিল, আর ইংরাজ মনুষ্য হইয়া জাহাজ বানাইয়াছে ইহাই এতবড় কথা! তাহা সত্য বটে, এ কথাটা এতক্ষণে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, অতএব মানিতেই হইতেছে যে আমাদের মত মহিমা কাহারও নাই!

শুনিতে পাওয়া যায় সমুদ্রপীড়া ও ঝটিকা ছাড়া সমুদ্র-ভ্রমণের আর একটি উপদ্রব—যাত্রীদিগের অবিশ্রান্ত আমোদ উৎসব। কিন্তু আমরা এবার তাহারও কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম না। ফার্ষ্টক্লাশের ছাতে বসিয়া দূর হইতে সেকেণ্ড ক্লাশের ছাতে কখনও কখনো দুই একবার যুবক যুবতী বালিকাকে বিঁড়া ছুটাইয়া তাহার পশ্চাতে ছুটিতে দেখি বটে, কিন্তু আমাদের এদিকে ওরূপ দুরন্ত খেলার কোনই আভাষ পাই না।

নরিস সাহেবের বান্ধবী—ইনিই রমণীযাত্রীদিগের মধ্যে একজন ফ্যাসানেবল লেডি, জাহাজে আসিয়া প্রথম রাত্রের অত্যুচ্চ খুর জুতায় পদস্খলন করিয়া ইনি তাহার পরিচয় দিয়াছেন। তদ্ব্যতীত ইঁহার দুইটা ঘোড়াও ইঁহার সঙ্গে এই জাহাজেই মান্দ্রাজ যাইতেছে; ইনি যে সেখানকার কোন হুমড়াচুমড়া লোকের পত্নী তাহাতে আর ইহার পর কাহারো সন্দেহ নাই। ধনের বিদ্যুৎ আঁচে সকলেই বিমুগ্ধ, বিশেষতঃ ইংরাজের সূক্ষ্ম চর্ম্মে ইহার ফল অতি দ্রুত হইতে দেখা যায়। জাহাজের প্রায় সকলেরই, বিশেষতঃ যুবকমণ্ডলীর ইঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য একটি সজাগ ঔৎসুক্য দেখা যায়। তবে এ ঔৎসুক্য একপক্ষ নহে, ইনিও হস্তস্খলিত নিম্নপতিত রূমালখানি কুড়াইবার অবসর দিয়া চৌকিখানি টানিতে বলিয়া, সন্ধ্যায়, কোন

কোন দিন দুপুরেও পিয়ানো ঠুংঠুং করিয়া, যুবকদিগকে তাঁহার সঙ্গে গাহিতে অনুরোধ করিয়া এবং গায়কের মিষ্টস্বরে অতি মুগ্ধ হইয়া, প্রতিদানে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া আসর জমাইতে চেষ্টা করেন। দুঃখের বিষয়, জাহাজের এই জীবন্ত ভাবটুকু অধিকদিন থাকিবে না, ১১ই শনিবার জাহাজ মান্দ্রাজে লাগিবে। ১১ই জাহাজে একটী লটারি হইল, জাহাজ সেদিন ক মাইল চলিবে? জাহাজের কর্ম্মচারীগণ, যাত্রীগণ সকলেই টিকিট ক্রয় করিলেন, লটারিতে যাহার ভাগ্যে যাহা উঠিল। আমার ভাগ্যে উঠিয়াছিল ৫২ নম্বর, তাহাতে অবশ্য মনে কিছুমাত্র আশা জাগে নাই। কিন্তু যখন শুনিলাম, সেদিন মোট ৫৩ মাইল মাত্র জাহাজ চলিয়াছে, আর এক মাইল বেশী হইলেই আমি জিতিতাম, তখন মনে এমন আশা জাগিয়া উঠিল, যে এত অল্পের জন্য সে আশায় নিরাশ হইয়া নিতান্তই হায় হায় করিতে লাগিলাম। এমনি ভাগ্যের বিড়ম্বনা! তবে সুখ দুঃখ কিছুই সংসারে খাঁটি মেলে না—সুখের মধ্যে দুঃখ, দুঃখের মধ্যে সুখ বাঁটিয়া ভাগ্য আপনার অপক্ষপাতী সমদানে চিরদিন সমান গালাগালি খাইয়া আসিতেছে। আমি না জিতি, আমাদের বন্ধুবর সেদিন লটারিতে জিতিলেন। অন্য কাহারও পরিবর্ত্তে তাঁহার ভাগ্যে যে ৫৩ নম্বরের টিকিটখানি উঠিয়াছিল এজন্য এই নিরানন্দের মধ্যেও অবশেষে আনন্দ লাভ করিলাম।

দুই একজন ব্যতীত জাহাজের মহিলা যাত্রীদিগের প্রায় সকলেরি সহিত আমাদের একরূপ আলাপ হইয়াছিল; একজন পুরুষ যাত্রীর সঙ্গে সেইদিন আলাপ হইল। তখনও সন্ধ্যার বিলম্ব আছে, দিবাবসানে জাহাজ কতদূর চলিবে এখনও ঠিক হইয়া যায় নাই। তবে কাছাকাছি একটা আভাষ পাওয়া গিয়াছে, ৫২ কি ৫৩ মাইল চলিবে, ইহাই জাহাজের লোকের অনুমান। পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ যাত্রীবর এই খবরটি সুসংবাদ স্বরূপ আমার নিকটে বহন করিয়া আনিয়া বলিলেন, "খুব সম্ভব আপনিই জিতিবেন।" এই উপলক্ষে ক্রমে অন্য কথাও আরম্ভ হইল, অন্য কথা আর বিশেষ কিছুই নহে—তাঁর গৃহিণীর কথা! জানিলাম ২৭ বৎসর কাল তাঁহার বিবাহ হইয়াছে, ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত কখনো একদিন তাঁহাদের বিচ্ছেদ হয় নাই। আপাততঃ তিনি স্ত্রীর নিকট যাইতেছেন, ইটালিতেই তাঁহার সহিত সম্ভবতঃ সাক্ষাৎ হইবে, ইংলণ্ড পর্য্যন্ত যাইতে হইবে না। তাঁহার স্ত্রী ১০টি সন্তানের মাতা, কিন্তু এখনো তাঁহার দেহ-যষ্টি অনুপম সুগঠনবতী ইত্যাদি ইত্যাদি। দেখিলাম, ভদ্রলোকটি দুই বৎসরের দীর্ঘ বিরহে এত কাতর হইয়া উঠিয়াছেন যে তাহাই তাঁহার একমাত্র চিন্তনীয় কথনীয় বিষয়, তাহার প্রকাশেই মাত্র সে কষ্টের কথঞ্চিৎ প্রশান্তি। স্ত্রীর প্রতি তাঁহার এই অকৃত্রিম অনুরাগ দেখিয়া আমার লোকটাকে লাগিল ভাল; তাঁহার প্রতি আন্তরিক সহানুভূতির উদ্রেক হইল। আমিও তাঁহার গল্পে আনন্দ অনুভব করিয়া আগ্রহ সহকারে তাঁহার স্ত্রীর সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। লোকটা যে তাহাতে কিরূপ দ্রব হইয়া গিয়াছিল, তাহার প্রমাণ একা আমি নহি—পরদিন আমার স্বজাতীয় সকলেই লাভ করিয়াছিলেন। যখন পরদিন সকালে মান্দ্রাজে ফল বিক্রয় করিতে লইয়া আসিল, তিনি আঙ্গুর কিনিয়া আমাদের সকলকে বিতরণ করিতে লাগিলেন। একটি আধটি লইলে বৃদ্ধের মনস্তুষ্টি হইবার নহে, থোলো থোলো তুলিয়া লওয়া চাই। অবশ্য

রমণীগণের ধন্যবাদ অজস্ররূপে তাঁহার প্রতিই বর্ষিত হইল, কেননা তাঁহারা ইহার মূল কারণ কিছুই জ্ঞাত ছিলেন না। কিন্তু যেখানে মানুষের সূক্ষ্ম কর্ম্মাকর্ম্মের ফল সঞ্চিত হইতেছে, আশা করি সেখানে এই ধন্যবাদের ভাগও যথাযোগ্যরূপে আমার ভাগ্যে রক্ষিত রহিল। কেহ কেহ বলেন, আমরা এখানে যত কর্ম্মাকর্ম্ম করি তাহার ফল এখানে ফুরাইলেই ভাল; ভবিষ্যৎ যন্ত্রণার হাত হইতে এই উপায়েই একমাত্র অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে। ঠিক কথা, দুঃখের সময় ইহা মহৎ সান্ত্বনা সন্দেহ নাই; কিন্তু এই জন্মেই যদি সমস্ত কর্ম্মাকর্ম্ম ফুরাইল, তাহা হইলে পরজন্মের দশা কি হইবে? যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে সুখও যে ফুরাইল! তাই বলি, অকর্ম্ম ফুরাইলে ভাল বটে, কিন্তু কর্ম্ম কিছু উদ্বৃত্ত হাতে থাকা চাই। যাহা হউক, দেখা যাইতেছে সর্ব্বত্রই বন্ধুতার ক্ষেত্র আছে।

১১ই মে প্রত্যূষে জাহাজ মান্দ্রাজ বন্দরে লাগিল; আমরা ৭টার পর ছাতে উঠিলাম। পূর্ব্ব অভিজ্ঞতায় জানা গিয়াছে ইহার আগে ডেকে আসা বিড়ম্বনা মাত্র। সাধারণতঃ ইংরাজ রমণীরা ৯টার পূর্ব্বে প্রায় ডেকে আসেন না, সুতরাং বেশী সকালে কোন রমণীকে ডেকে বিচরণ করিতে দেখিলে, এই অনাচারে নৈশচরিক বর্ব্বরতার লক্ষণ দেখিয়া ইংরাজ সেলারগণ সকৌতুক বিস্ময় দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে; দ্বিতীয়তঃ, ৭টার পূর্ব্বে প্রায় ডেক ধোওয়াই হয় না, ডেক ধুইতে আরম্ভ করিলে আবার অন্যত্র পলাইতে হয়, এই উভয় সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অগত্যা অরুণোদয়ের শোভাদর্শন হইতেও আমাদিগকে বঞ্চিত হইতে হইত। ছাতে আসিয়া দেখিলাম, বিস্তর ছোট ছোট নৌকা, প্রায়োলঙ্গ, অতিক্ষীণ, দীর্ঘ হস্তপদ, বদ্ধঝুঁটি, কৃষ্ণবর্ণ নরগণের হস্তে বাহিত হইয়া জাহাজের গায় আসিয়া লাগিতেছে, আর মান্দ্রাজের ব্যাপারীগণ তাহা হইতে নামিয়া পঙ্গপালের মত জাহাজে আসিয়া উঠিতেছে। মান্দ্রাজের প্রথম দৃশ্যেই এইরূপে কিষ্কিন্ধ্যার সংশোধিত সংস্করণ যেন চোখের উপর আসিয়া পড়ে, উক্ত নরনামধারীগণ যে বলিরাজার কলিযুগের বংশধর, তাহাদের দেখিলে তাহার আর অন্যতম প্রমাণ আবশ্যক করে না। মান্দ্রাজি ব্যাপারীদের বেশ অবশ্য অপেক্ষাকৃত অনেক ভব্যযুক্ত। কটিদেশে একখণ্ড করিয়া আপাদলম্বমান বস্ত্রবেষ্টিত, গায়ে একটা করিয়া পিরাণ, কাহারো বা চাদর জড়ান; সম্মুখের অর্দ্ধেক মাথা মুড়ান, অন্য ভাগে অর্দ্ধেক চুলের ঝুঁটি বাঁধা। ব্যাপারীদের মধ্যে অনেক পশ্চিমের মুসলমানও দেখিলাম। তাহাদের বেশভূষা এ দেশের লোকের সঙ্গে একত্রে বিশেষরূপ নয়ন প্রীতিকর। এই সকল ব্যাপারীরা নানারূপ ফল, নানারূপ কারুশিল্প, জরির সূক্ষ্ম কাজ, রেশমের সূক্ষ্ম কাজ, বেতের ঝুড়ি পাখা, ইত্যাদি বিক্রয় করিতে আনিয়াছে। আশ্চর্য্য, নিজ মান্দ্রাজ সহরে ইহার অনেক জিনিষ সন্ধান করিয়া মেলে না, অন্ততঃ আমরা ত পাই নাই, কিন্তু জাহাজ লাগিতে না লাগিতে এখানে তাহার আমদানি হইতে থাকে। কোন যাত্রী যদি মান্দ্রাজে নামিয়া এই সকল জিনিষ কিনিবার অভিপ্রায়ে জাহাজের এই সুযোগ অবহেলা করেন, তাহা হইলে তিনি ঠকিবেন। এখানে জরির কারুকার্য্যের দামও বেশ শস্তা বলিয়া মনে হয়। অবশ্য প্রথমে খুবই দর হাঁকিয়া বসে—কিন্তু শেষে আবার তেমনি নামে। একটা বড় জরির টেবিল চাদর যাহার দর হাঁকে ৫০/৬০, তাহাই শেষে ১০/১২ টাকায় দেয়।

ডেকের চারিদিকে সেদিন এই জনতা; কেনাবেচার ভিড়। তাহারি মধ্যে এক পাশে বসিয়া দেখিলাম, একজন জাহাজের কর্ম্মচারী তন্ময় ভাবে এক মনে মেয়েলি হাতের লেখা দিস্তা দিস্তা কাগজ পড়িতেছেন এবং তাঁহার চক্ষু কর্ণে এ জনতা একেবারেই পশিতেছে না। বুঝিলাম তিনি প্রেয়সীর পত্র পাইয়াছেন।

জাহাজ হইতে মান্দ্রাজ উপকূল দেখিতে সুন্দর। উচ্চ তটভূমিতে হাইকোর্ট, কলেজ প্রভৃতি বড় বড় বাড়ী শোভা পাইতেছে। নিম্নে দুই স্তরে সমুদ্রের অপরূপ রূপ। জলগর্ভে একটি সুদীর্ঘ দেয়াল গাঁথা হইয়াছে, তাহার দুই দিকেই সুপ্রশস্ত জলরাশি, তাই এই স্তরবিন্যাস! আগে মান্দ্রাজোপকূলে নাকি তরঙ্গবেগ অত্যন্ত প্রবল ছিল, জাহাজ হইতে নৌকায় নামিতে, নৌকা হইতে জাহাজে উঠিতে বিশেষ ভয় পাইতে হইত, সমুদ্রে এই দেয়াল বাঁধিয়া, স্রোতোবেগ শুনা যায় এখন অনেক প্রশমিত হইয়াছে, জাহাজ হইতে নামিতে এখন ত তেমন অসুবিধা দেখিলাম না। মান্দ্রাজ এত বড় একটা বন্দর, কিন্তু এখানে একটি জেটি নাই। তাই জাহাজ হইতে নৌকায় নামিয়া তীরে উঠিতে হয়। নৌকা জাহাজের সিঁড়ির কাছে আসিয়া লাগায়, তরঙ্গে তরঙ্গে তাহা উঠিয়া নামিয়া একবার সিঁড়ির প্রায় কাছাকাছি ওঠে, একবার সিঁড়ি হইতে অনেকটা নীচে নামিয়া যায়, যখন সিঁড়ির কাছাকাছি আসে—সেই অবসরে নৌকায় উঠিয়া পড়িতে হয়।

মান্দ্রাজের একজন ধনী সওদাগর নাইডু মহাশয়, তিনি আমাদের জাহাজ হইতে আনিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার বাড়ী উপকূল হইতে অনেকটা দূরে, তাঁহার অংশীদার চেটি মহাশয়ের বাড়ী কাছেই। তাই আমাদের তিনি তাঁহার বাড়ীতেই তুলিলেন। আমরা যে ট্রেণ ধরিব তাহা সন্ধ্যার সময় ছাড়ে। আমরা জাহাজ হইতেই খাওয়া দাওয়া করিয়া আসিয়াছিলাম, দুপুরের রৌদ্রটা এইখানে কাটাইয়া বিকালে সহর ঘুরিয়া ষ্টেসনে যাইব এই বন্দোবস্ত।

বৃদ্ধ চেটি মহাশয় মিউনিসিপালিটির কলেক্টর।[২] ইনি এ দেশের একজন রিফর্ম্মার। ইঁহার দুই পুত্র বিলাত যান; একজন ডাক্তার, একজন সিভিলিয়ান হইয়া আসেন। দুঃখের বিষয়, দুজনেরই মৃত্যু হইয়াছে। ইঁহার কন্যারা ইংরাজি বেশ শিখিয়াছেন। তাঁহারা শিক্ষিত মহিলার এখানে আদর্শস্থল, নাইডু মহাশয় ইঁহাদের লইয়া বিশেষ গর্ব্বিত। সকল পিতাই কন্যাদিগকে এরূপ শিক্ষা প্রদান করেন না, ইহাই তাঁহার দুঃখ। শিক্ষিত পত্নী চাহিলে চেটি পরিবারে বিবাহ করিতে হয় অথচ ভিন্ন জাতি হইলে তাহারো উপায় নাই; অতএব সকল বাপেরই কন্যাগণ শিক্ষিত হইলে এ বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, এই তাঁহার মনের ভাব। বিবাহের পর যে স্ত্রীকে শিক্ষা দেওয়া যায় না, তাহার চেষ্টা যে কেবল বিড়ম্বনা মাত্র; তাঁহার এইরূপ শোচনীয় অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, আর সেইজন্যই এই আপশোষ—এই রকমটা আমার মনে হইল। এ ক্ষেত্রে বৃদ্ধ চেটি তাঁহার একটি কন্যা একটি পুত্র ও দুইটি পুত্রবধূর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। একজন পুত্রবধূ বিধবা। কন্যা ইংরাজি বেশ জানেন, আমাদের কথা কহিবার কোন অসুবিধা নাই। তাঁহার মুখে শিক্ষার বেশ একটি উজ্জ্বল ভাব। পুত্রবধূ দুইজন নিতান্ত ছেলেমানুষ, তাঁহারা কেবল একবার মাত্র দেখা দিয়া গেলেন। আমি জিজ্ঞাসা

করিলাম—ইঁহার, ভাইরা বিলাত গিয়াছেন, ইনি নিজে এমন শিক্ষিত, বিবাহের জন্য কোন গোল হয় নাই? শুনিলাম বিশেষ না। প্রথমতঃ, পিতার টাকা আছে; ছেলেরা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাই সহজেই জাতে উঠিয়াছিলেন, আর টাকার জোরে পুত্রকন্যা কাহারো বিবাহেরও গোল হয় নাই। ইঁহারা জাতে উঠিয়াছেন সত্য—কিন্তু স্বজাতি সকলে ইঁহাদের গ্রহণ করে নাই, একদল তাঁহাদের সহিত খাওয়া দাওয়া করে, একদল করে না। চেটির যে পুত্রকে দেখিলাম তিনি নাইডুর অংশীদার, তাঁর কাণে বড় বড় হীরার গোল ফুল, এখানে তাহার নাম কমল, হাতে সোণার বালা, লম্বা চুল, চুড়িদার ইজার, পিরাণের উপর লম্বা আচকাণ, পায়ে জুতামোজা নাই, সাজসজ্জায় চেহারায় এদেশী রাজাদের ইতিপূর্ব্বে যেরূপ ছবি দেখিয়াছি অনেকটা সেইরূপ দেখিতে। ইনি বিলাত যান নাই। এদেশে বাঙ্গলার মত জানানাও নাই, আর শ্বশুর ভাশুরের কাছে সেরূপ লজ্জাও নাই। পুত্রবধূগণ শ্বশুরের সাক্ষাতেই আমাদের নিকট অনাবরিত মস্তকে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মহারাষ্ট্রীয় ললনাদের মধ্যে যদিও বঙ্গদেশের অন্তঃপুর প্রথা নাই, কিন্তু তথাপি তাঁহারা শ্বশুর ভাশুরের সাক্ষাতে মস্তকে কাপড় দেন, কিন্তু এখানে নূতন নিয়ম দেখিতেছি—মাথায় কাপড় দেওয়া কোন অবস্থাতেই রীতি নহে। মেয়েদের বেশ দেখিলাম হিন্দুস্থানী রকমের, একটা ঘাগরা, ছোট অঙ্গরক্ষা, তার উপর চাদর। কোমরের কটিবন্ধে কেবল এদেশীয় ভাব রক্ষা পাইতেছে। ইঁহাদের এই বেশ এ দেশের সর্ব্বসাধারণ মহিলার বেশ নহে, ইহা বণিক জাতির বিশেষ বেশ—অন্যেরা দীর্ঘ বস্ত্র কুঁচাইয়া ফিরাইয়া পরেন। চেটি ও নাইডু উভয়েই বণিক জাতীয়, ইঁহাদের মধ্যে শূকর খাইতেও দোষ নাই। এ দেশের ভদ্রলোকদিগকে কই চাপকাণ পরিতে দেখিলাম না, কোট কিম্বা পিরাণ আচকাণ, তাহার উপর মাথায় সুশ্রী করিয়া বাঁধা জরির পাগড়ি। এই পাগড়ি সম্মুখ দিক হইতে দেখিতে যতদূর ভাল পশ্চাদ্দিকে তেমন নহে, পশ্চাতের কাপড় অধিকাংশ পাগড়িতে খোঁপার মত বাঁধা, কোন কোন পাগড়িতে এ দোষটুকু নাই, সেইগুলি অতিশয় সুন্দর।

মান্দ্রাজে একটি ব্রাহ্মসমাজ আছে শোনা গেল, কিছুদিন থাকা হইলে এখানকার উপাসনা পদ্ধতি দেখিতে পাইতাম। অবশ্য এখানকার ব্রাহ্মগণ সাধারণতঃ জাতি মানিয়া চলেন, আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ইহাঁদের মধ্যে একজনও আছেন কি না জানি না। সম্প্রতি এ দেশের একজন খৃষ্টান জাতে উঠিয়াছেন। জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্য পর্য্যন্ত তাহাতে মত দিয়াছেন। যদিও এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল, তথাপি এই আচারবিরোধী নবানুষ্ঠিত উদারতার বীজের মধ্যে ভবিষ্যতের সদ্‌বৃক্ষও কল্পনা করা যায়।

বিকালে আমরা বাজার অঞ্চল ঘুরিয়া ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। সহর যতটুকু দেখিলাম, কলিকাতা ও বম্বের তুলনায় সামান্য বলিয়া মনে হইল। সমুদ্রের ধারে যে কয়েকটি বাড়ী দেখিয়াছি তাহা ছাড়া সহরের মধ্যে তেমন একটিও ভাল বাড়ী দেখিলাম না। আমাদের আফিসাঞ্চল বলিতে কিরূপ বৃহৎ ব্যাপার বোঝায়, কিন্তু এখানকার আফিস অঞ্চল দেখিলাম অপরিষ্কার অসম ধূলিময় নাতিবৃহৎ রাস্তার দোধারি সামান্য একতলা দোতলা, যেন গুদামবাড়ী। রাস্তায় এত ধূলা বোধ করি আর কোথাও দেখি নাই। এখানকার বাড়ীর গঠন পদ্ধতি অনেকটা

বম্বের বাড়ীর মত, কিন্তু তাহার সেই ত্রিতল চৌতল, অতি দীর্ঘ অতিবিস্তৃত সুদৃশ্য সারি এখানে নাই। মান্দ্রাজের প্রাকৃতিক গৌরব তাহার সমুদ্র, আর কার্য্যগৌরব তাহার ইলেক্‌ট্রিক ট্র্যাম, এখনো সম্পূর্ণ হয় নাই, অল্পদিনের মধ্যেই শেষ হইয়া যাইবে। ইহা দেখিয়া আশা হইতেছে বাষ্পযানের বদলে জলেস্থলে সর্ব্বত্রই একদিন বৈদ্যুতিক যান চলিবে। একচন্দ্র যেমন তমোহন্তি তেমনি বিপরীত অর্থে রেলের গাড়ীর এক কয়লার গুঁড়ায় তাহার সমস্ত সুবিধাও যেন তমসাচ্ছন্ন করিয়াছে।

ভারতী, ভাদ্র ১৩০২

৩

আর্য্যাবর্ত্ত

(জনৈক বঙ্গ-মহিলার ভ্রমণ বৃত্তান্ত)

প্রসন্নময়ী দেবী

প্রথম ভাগ। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীযসী"। শ্রীমতী "বনলতা" ও "নীহাবিকা" বচযিত্রী কর্ত্তৃক প্রণীত।[১] কলিকাতা। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বাবা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ৫৫নং আপাব চিৎপুব বোড। সন ১২৯৫ পৌষ। পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৭৭ ।

উপহার

প্রাণাধিকা --
কুমারী শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী।
চিরায়ুষ্মতীষু --

মা-প্রিয়,

ভূত ভারতের গৌরব কাহিনী আর্য্যকীর্ত্তি অদ্য উপকথা নহে, বিন্ধ্য হইতে হিমগিরি যাহার অভ্রভেদী নিদর্শন, গঙ্গা যমুনা সরযূ যাহা করুণ বিলাপে অবিরাম গাইতেছে, অযোধ্যা হস্তিনা এবং ইন্দ্রপ্রস্থে অতীতের আধভগ্ন স্মৃতিরূপে অদ্যাপি যাহা বিদ্যমান দেখিলাম, সেই পুণ্যভূমির সে পবিত্র গৌরব আজি নাই বলিয়া আমরা কাঁদিতে পারি কিন্তু তাহা কাল্পনিক স্বপ্নময় উপন্যাস মনে করিতে পারি না। ভীমার্জ্জুন যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, প্রতাপ সিংহ এবং পৃথ্বু রায় যে দেশ ধন্য করিয়াছিলেন সেই বীর-মাতা ভারতের কেন এমন অধঃপতন হইল ও কেনই বা আজ ভারত জননী মুষ্টিমেয় বিদেশী করে এবং "অপুত্রিকা শতপুত্র বিদ্যমানে" হইলেন তাহা তুমি বালিকাবস্থায়ই কতক অবগত হইয়াছ কি? তবে অন্য কথা শুন, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, দ্রৌপদী ও লক্ষ্মীরাণী প্রভৃতি পুণ্যবতী প্রাতঃস্মরণীয়া আর্য্যনারীগণ যে দেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন, সেই দেশে তুমিও জন্মিয়াছ এইটী সতত স্মরণ রাখিয়া তাঁহাদিগের উচ্চতম আদর্শে এবং তাঁহাদেরই পদানুসরণে অদ্যকার বিজাতিসভ্যতাবিড়ম্বিত না হইয়া যথার্থ হিন্দু মহিলার উপকরণে নিজের সুকুমার হৃদয় ও কিশোর চরিত্র সুগঠিত কর।[২] তাহা হইলেই তোমার জননীর অবিরাম-বাহী নীরব স্নেহের কতক প্রতিদান হয়। সংসারের বাহ্য প্রকাশিত অন্তঃসারশূন্য স্নেহানুভবে অসমর্থ ও জর্জ্জরিত এ হৃদয়—যে স্নেহ বাক্যহীন কার্য্যে তোমার মঙ্গল কামনায় অনিবার ঢালিয়া দিতেছে—ভাষায় তাহা কখনও প্রতিফলিত হউক, আর নাই

হউক, সেই নিস্তব্ধ গভীর স্নেহের ক্ষুদ্র আশীর্ব্বাদ স্বরূপ এই "আর্য্যবর্ত্ত" (ভ্রমণ) যুগান্তের ঐতিহাসিক মহিমা গাথা স্বদেশ প্রেমের চিহ্নরূপে তোমাকেই স্নেহোপহার দিলাম।

কৃষ্ণনগর
অগ্রহায়ণ
১২৯৫ সাল।

বিজ্ঞাপন

বঙ্গ মহিলার ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠকের কেমন লাগিবে তাহা জানি না। আমি যাহা দেখিযাছি, দেখিয়া যাহা ভাবিয়াছি তাহা লিখিলাম। অন্তঃপুররুদ্ধা বঙ্গনারী তীর্থযাত্রা উপলক্ষে কখন কখন দেশ ভ্রমণ করিয়া থাকেন। কিন্তু দেশ ভ্রমণকালে যে সকল দৃশ্য তাঁহাদের নয়ন গোচর হয়, প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য্যলীলাতে নারীর কোমল হৃদয়ে যে সকল ভাব উদিত হয়, মনুষ্যের ক্ষমতার পরিচায়ক নানাবিধ কীর্ত্তি দেখিয়া মনে যে চিন্তা প্রবাহ বহিতে থাকে, পথিমধ্যে নারীকে যে সকল অপ্রত্যাশিত ঘটনার হস্তে কখন কখন নিক্ষিপ্ত হইতে হয়, তাহার বর্ণনা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই জন্য হয়ত আমার সামান্য ক্ষমতায় ও আমি যাহা কিছু লিখিতে পারিয়াছি তাহা কাহার কাহারও পাঠ করিবার ঔৎসুক্য হইতে পারে। সংসারে যেমন বর্ণনা করিবার শক্তি সকলের সমান নহে, তেমনি দেখিবার শক্তিও সকলের সমান নহে। একজন সমুদায় পৃথিবী ঘুরিয়াও কেবল মৃত্তিকা এবং ইষ্টক ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাইল না, আর একজন একটী মাত্র দেশে বা নগরে বা গ্রামে, মানবজাতির আচার ব্যবহার, সমাজের গূঢ়তত্ত্ব, রোগের উৎপত্তি, সভ্যতার বিকাশ, বিজ্ঞানের উন্নতি সম্বন্ধে কত কি দেখিতে পাইলেন। যাহার সে পরিমাণে জ্ঞান আছে তাহার সেই পরিমাণে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। সুতরাং আমি অধিক দেখিতে পাইয়াছি বা যাহা দেখিয়াছি তাহা ইচ্ছনীয়ভাবে বর্ণনা করিতে পারিয়াছি তাহা অবশ্য মনে করি না। কিন্তু পুরুষের পক্ষে যাহা যেরূপ দেখায় নারীর নেত্রে তাহা ঠিক সেইরূপ না দেখিতে পারে। সেই জন্য বঙ্গনারীর চক্ষে ও হৃদয়ে এই ইতিহাসময় আর্য্যাবর্ত্তে ভিন্ন ভিন্ন স্থান কি রূপে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল তাহা কেহ কেহ জানিতে ইচ্ছা করিতে পারেন এবং তাই আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে আমি যাহা দেখিয়াছি তাহা বর্ণনা ও প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম।

আর এক কথা, আমার নির্জ্জন জীবন শুভ কার্য্যময়তায় প্রফুল্ল করিতে যে মঙ্গল ইচ্ছার উৎসাহজনক সাহায্যে এই ভ্রমণ অদ্য পুস্তকাকারে পরিণত হইল, কিন্তু অবস্থানুসারে সে বিষয় একটী মাত্র কথাও বলা হইল না—বাক্যে তাহা কখন পরিস্ফুট হউক আর নাই হউক, হৃদয় তাহাতে আমরণ এমনি নীরব ঘনীভূত কৃতজ্ঞতায় পরিপ্লুত রহিবে।

অবতরণিকা

শারীরিক অসুস্থতা কোন অবস্থাতেই কাহারও নিকট সুখকর কিংবা প্রীতিপ্রদ নহে। ইহার যন্ত্রণায় এই সৌন্দর্য্যময় বিশ্বজগৎ শোভা-শূন্য বোধ হয়, মানসিক তেজ ও চিন্তা-শক্তি ক্রমে শিথিল হইয়া যায়, কঠিন পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা লোপ পায়; কেহই ইচ্ছা করিয়া তাহা চাহে না। কিন্তু এই অসুখকব অসুস্থতায় আমার কিছু জ্ঞান লাভ হইয়াছে। এই অসুখে যে শিক্ষা ও আনন্দ পাইয়াছি, তাহার স্মৃতি আমার নির্জ্জন-প্রিয় জীবনের একটী পবিত্র সুখ। মাতৃভূমির ঘটনা-পূর্ণ প্রধান প্রধান স্থানগুলি দেখিবার প্রবল ইচ্ছা হৃদয়ে যত্নের সহিত আশৈশব পোষণ কবিয়া আসিতেছিলাম; কখন যে সে অভিলাষ পূর্ণ হইবে আমার কিন্তু এমন বিশ্বাস ছিল না। অবরোধবাসিনী হিন্দুমহিলাদিগের পক্ষে দেশ ভ্রমণ কত যে অসম্ভব, তাহা সহজেই অনুমেয়। হিন্দু-ধর্ম্মে অচল বিশ্বাসে, পূর্ব্বেও শত শত মহিলা তীর্থ দর্শনে যাইতেন এবং এখনও গিয়া থাকেন; তথাপি ইহা হিন্দু রমণীব পক্ষে যে তত সহজসাধ্য নহে, ইহা কে না স্বীকার করিবে? দেশভ্রমণের কল্পনা অথবা স্বপ্ন আমার কখনই সফল হইত কিনা, তাহা আমি জানি না; কিন্তু শঙ্কটাপন্ন শারীরিক অসুস্থতা ও আত্মীয় স্বজনের উদ্বিগ্ন স্নেহে আমার এই অভিলাষ পরিপূর্ণ হইয়াছে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ বাঙ্গালার জলবায়ু আমার অসুস্থ শরীরের পক্ষে অনুকূল নহে। কিন্তু স্নেহময় প্রিয়জন ছাড়িয়া দীর্ঘকাল দূরদেশে থাকা নিতান্ত কষ্টকর। আবার অন্যদিকে জীবন রক্ষা করিতে হইলে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া মধ্যে মধ্যে বিদেশে যাইতে হয়। অসুস্থতাই আমার ভ্রমণের মুখ্য কারণ। ১৮—সালে বর্ষার প্রারম্ভে আমার শরীর আবার দিন দিন অধিকতর অসুস্থ হইতে লাগিল। এবং চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে ১৮—সালের ৩ রা নবেম্বর তারিখে রাত্রি ৯-টার সময় আমি জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমযাত্রা করিলাম। আমার তখনকার শারীরিক অবস্থা এত শোচনীয় ছিল যে, আমি আরোগ্য হইয়া আবার দেশে ফিরিয়া আসিব কিনা, সে বিষয়ে আমার বন্ধু বান্ধবদের অনেকেরই সন্দেহ জন্মিয়াছিল।

আমার নিজের মনে তখন যে বিশেষ কোন নূতন আশঙ্কা হইয়াছিল তাহা এখন তত স্মরণ নাই, তবে মৃতপ্রায় অবস্থায় ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গিয়া স্বাস্থ্য পুনর্লাভ করিবার জন্য বিষণ্ণমনে আত্মীয়স্বজনের নিকট বিদায় মনে করিলে স্মৃতি এখনও আমার হৃদয়ে বিষাদ ঢালিয়া দেয়। সে যা হোক্ ট্রেন ছাড়িল; সঙ্গে দুই সহোদর থাকিলেন, আর সকলে বিদায় লইলেন। ক্ষণকাল পরেই কেবল শকটের ভীষণ ঘর্ঘর শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল।

অশান্তিময় রাত্রি নিদ্রা অনিদ্রায় কোন রূপে কাটিয়া গেল। প্রভাতে জাগিয়াই বুঝিলাম যে, আমরা অনেক দূরে আসিয়াছি। ভ্রাতার মুখে শুনিলাম "নোয়াদি"। আমার পূর্ব্ব পরিচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈল-রাজি পরিশোভিত নোয়াদির নাম শুনিয়া তাহার প্রাতঃ-সূর্য্য-রশ্মিময় শোভা দেখিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু গাত্রোত্থানে অসমর্থ, সে সাধ পূর্ণ হইল না।

অপরাহ্নে গাড়ী যখন মৃজাপুরের মধ্যে দিয়া যাইতে লাগিল, তখন বিন্ধ্যগিরির শিরে সূর্য্যের অস্তগামী অপূর্ব্ব শোভা নিরীক্ষণ করিয়া আমার সহোদরদ্বয় বিমুগ্ধ হইয়া আমাকেও তাহা একবার দেখাইবার নিমিত্ত মুহূর্ত্তের জন্য শয্যাতে উঠাইয়া বসাইলেন। আমি সেই অনির্ব্বচনীয় জীবন্ত সৌন্দর্য্য দেখিয়া এবং প্রদোষের স্বাস্থ্যকর নির্ম্মল বায়ু সেবন করিয়া একটু যেন জীবন পাইলাম ও সুস্থ হইলাম। আমার সৌন্দর্য্য-প্রিয় কবি-প্রকৃতি বন্ধুগণের সহিত যে একত্র হইয়া সেই স্বর্গীয় শোভা দেখিতে পাইলাম না, তখন তাহাই কেবল মনে হইতে লাগিল। কেমন শূন্যমনে উদাস-প্রাণে সেই কনক-কিরণের সৌন্দর্য্যসাগরে ভাসিয়া গেলাম। বঙ্কিমবাবুর "সাধের তরণী, আমার" মনে আসিয়াছিল কিনা বলিতে পারি না, তবে এই সংসারে এই অনন্ত বিশ্বের অমিশ্রিত সুখভোগ হতভাগ্য মানবের ভাগ্যে কখনই প্রায় ঘটে না, নতুবা সেই নিরূপম মাধুরী হেরিয়া আমার চক্ষে জল আসিল ও হৃদয় অশ্রুসিক্ত হইল কেন? একের সুখ, দুঃখ, আশা, নৈরাশ্য অপরে সহজে অনুভব করিতে পারেন না, তাই আমার সেই সায়াহ্ন হর্ষ-বিষাদ-কাহিনীও বলিতে ইচ্ছা নাই।

রাত্রি প্রায় ৮ টার সময় গাড়ী কিছু বেশীক্ষণের জন্য থামিলে প্লাটফরমে হৈ রৈ, কলরব, ডাক হাঁক শুনিয়া বুঝিলাম যে কোন একটী বড় স্টেসনে পৌছিয়াছি। ইহা গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম স্থান সেই প্রয়াগ তীর্থ।

গাড়ী পুনর্ব্বার উদাসীন ভাবে চলিতে লাগিল। দ্বিতীয় প্রহর রজনীতে হঠাৎ অস্থিভেদী শীতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তখন আবার হৈ রৈ কলরব—বুঝিলাম গাড়ী কানপুরে আসিয়াছে। তাকাইয়া দেখিলাম একটী শ্বেত পুরুষ ও তাঁহার শ্বেতাঙ্গিনী পত্নী আমাদিগের গাড়ী মধ্যে বিরাজমান,—সৌভাগ্যক্রমে ব্রিটীশ সিংহ আমাদিগকে উদ্বেজিত না করিয়া ক্ষণকাল পরে মস্তকোপরি 'হ্যামকে' দোদুল্যমান হইলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে শিষ্টাচারের সহিত আপনা হইতেই আমার সহোদরের সঙ্গে গল্প আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহার পত্নী আমাকে পীড়িত লক্ষ্য করিয়া স্বামীকে নীরব হইতে কহিলেন। যদিও অধিক সময়ই "ব্রিটিশ সিংহের বিকট বদন" রেলগাড়ী ইত্যাদিতে 'নিগার' দর্শনে আরও বিকটতর হয় এবং তাহাতে নানাপ্রকার অপ্রিয় ঘটনাও সততই ঘটিয়া থাকে, তথাপি ইহাদিগের ভদ্রোচিত আচরণে আমাদিগের কিছুমাত্র কষ্ট কি অসুবিধা হয় নাই। কর্ত্তব্যের অনুরাধে এই সামান্য ঘটনার উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইল। অবশেষে অতি প্রত্যূষে গাড়ী এটোয়া থামিল, আমরা সেখানে নামিলাম ও আমাদিগের জন্য রক্ষিত যানে আমরা কোন এক আত্মীয় ব্যক্তির বাসায় গিয়া পৌছিলাম।

এটোয়া

—এখানে হিন্দু কি মুসলমান জাতি অধিক তাহা আমি বিশেষরূপে অবগত নহি। তবে ভদ্র বাঙ্গালীর সংখ্যা অত্যন্ত অল্প ও রাজপথে কখনই প্রায় বাঙ্গালীর মুখ দেখিতে পাওয়া যায়

না। এদেশের আচার ব্যবহার এবং পরিচ্ছদাদিও আমাদিগের মত নহে। হিন্দুস্থানী পুরুষগণ ধুতি কি পায়জামা, চাপকান ও টুপি পরে, স্ত্রীলোকেরা "ল্যাংঘা" (ঘাগরা), আঙ্গরাখা ও চাদর ব্যবহার করে। মুসলমান ও ক্ষত্রিয় রমণীগণ জুতা ও খড়ম পরিয়া থাকে। সাধারণতঃ এদেশের লোক সুস্থ, সবল ও কতকটা ফরসা, কিন্তু মুখে প্রায়ই বুদ্ধির তত আভা নাই বলিয়া বোধ হয়। বুদ্ধিব প্রতিভাহীন মুখমণ্ডল নয়নপ্রীতিকর নহে, এবং স্মৃতিতে গভীর রেখা অঙ্কিত করে না। এই কারণেই হউক, কিম্বা কিজন্য ঠিক বলিতে পারি না, আমি এদেশের সুন্দর মুখও দীর্ঘকাল দেখিয়াও স্মৃতিতে রাখিতে পারি নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুস্থকায় বালক বালিকার বুদ্ধিহীন মুখচ্ছবিতে কেমন সুখের সহিত বিষাদ হৃদয়ে ঢালিয়া দিত—তাহাতে কত কি ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা, অস্পষ্ট ভাব মনে আসিত।

পশ্চিম অঞ্চলে খাদ্যসামগ্রী অতি সুলভ। দুগ্ধ ও নবনীত অতি উপাদেয়। অন্যান্য দ্রব্যও বেশ পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের বাঙ্গালার ন্যায় সুস্বাদু, রসনা-মোহন মিষ্টান্ন দুর্ল্লভ; তাই বুঝি রসনা-দাস বাঙ্গালী—আজীবন পশ্চিম বাসে আপনাকে অধিকতর হতভাগ্য মনে করেন? হিন্দুস্থানীগণ "দাল রুটি প্রিয়"—তাহারা রসনা তৃপ্তি অপেক্ষা শরীর পুষ্টি বোধ হয় অধিক ইচ্ছনীয় বিবেচনা করে। আমি স্পার্টানদিগের "কাল ঝোলের" (black broth) পক্ষপাতী নহি, তথাপি একথা স্বীকাব করি, আমাদিগের বাবুগণের আহার প্রণালী একটু পরিবর্ত্তন করিলে ক্ষতি নাই। হিন্দুস্থানীরা দিনান্তে কোনদিন একবার অন্নাহার করে, কিন্তু রুটিই ইহাদিগের প্রধান আহার। এমন কি ভিখারীদিগকে ডাল কিম্বা রুটি ভিক্ষা দিবার প্রথা এদিকে প্রচলিত আছে।

ইহারা আরাম কাহাকে বলে তাহা বড় বুঝে না, বাহিরের আড়ম্বর অধিক ভালবাসে। স্ত্রীলোকদিগের বেশভূষার প্রতি বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে, কিন্তু তাহা সুমার্জ্জিত নহে। বঙ্গীয়া ভগিনিগণ ইহাদিগের ন্যায় অলঙ্কার পরিতে আজিও শিখেন নাই। ইহারা এতই অলঙ্কার প্রিয় যে তাহার অভাবে সর্ব্বাঙ্গ "উলকি" দ্বারা চিত্রিত করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। আমি যদি চিত্রবিদ্যায় পারদর্শী হইতাম, তাহা হইলে হিন্দুস্থানী নারীগণের বহুবিধ অলঙ্কার (জোড়া কড়া) পরিশোভিত দেহচ্ছবি চিত্র করিয়া আনিতাম, ও দেশীয়া ভগিনিগণ তাহা দেখিয়া আমোদিতা হইতেন।

এদেশের অবরোধ প্রণালী আমাদিগের দেশের অপেক্ষাও কঠিনতর, (হয়ত অত্যাচারী মুসলমান বাদসাহদিগের নিকটে বাস বলিয়া পুরাকালে আত্মসম্মান রক্ষার্থে অন্তঃপুর প্রথা এত অধিক কঠিন করা হইয়া থাকিবে। তবে সময়ে ও অবস্থার পরিবর্ত্তনসহ তাহার কোন নূতন সংস্কার আর যে করা আবশ্যক, তাহা এখন মনে হয় না) কিন্তু ইহার মধ্যে একটু নূতনত্ব আছে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। বিবাহাদি কোন উৎসবে ভদ্র মহিলাগণ পর্য্যন্ত "মঝৌলীতে" (একপ্রকার গরুর গাড়ী) চাপিয়া আবরণের মধ্য হইতে উচ্চৈঃস্বরে Shelley-র "Skylark" এর মত, অথবা কবি হেমবাবুর "চাতক পক্ষীর" মত লুক্কাইত থাকিয়া,—(যদিও, "সুদূর গগনে উঠি গায় সুখে ছুটি ছুটি" নহে) রাজপথে গীত গাইতে গাইতে—সঙ্গীত চূর্ণ ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়া যায়। ঈদৃশ রাজপথে বামা-কণ্ঠ ঝঙ্কারে কোন

লজ্জার বিষয় নাই, কেননা, সেই "রমণী বদন, পুরুষ নয়ন, নাহি দেখিতে পায়"। ইতর লোকের স্ত্রীলোকদিগের বাহিরে যাওয়া কোন দেশেই দোষাবহ নহে, প্রয়োজনে; তবে এদিকে তাহাদিগের একটু বেশী স্বাধীনতা আছে। সামান্য লোকের স্ত্রী কন্যাগণ প্রকাশ্যভাবে ঘোঁড়ায় চড়িয়া কুটুম্ববাড়ী যাতায়াত করে। ইংরাজ মহিলাদিগের সম্বন্ধে কবিবর বলিয়াছেন যে "ধায় অশ্বপৃষ্ঠে অশঙ্কিতচিতে, কানন কন্দর উন্নত গিরিতে, অপ্সরা আকৃতি পুরুষ সেবিতা" ইত্যাদি, কিন্তু ইহাদিগের অশ্বারোহণ দেখিয়া কাহারও মনে এ কবিতা মধুরে আবৃত্তি করিতে ইচ্ছা হয় না; কেবল একটা "হাস্যভাজন" ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। বধূ দিব্য সাজে আবৃত, সুখে অশ্বারূঢ়া, অনুগত ভক্ত স্বামী গঙ্গারাম অশ্বরশ্মি সজোরে ধরিয়া চলিয়াছে এবং মৃদুস্বরে উভয়ে মধুরালাপ কবিতেছে ! এই দম্পতি-দৃশ্য, অবগুণ্ঠনবতী স্বাধীনতার এবং অশ্বরশ্মির সংলগ্ন প্রেমের মধুর সমাবেশ। ইহা ইউরোপের মধ্যযুগের শিভেল্‌রি (chivalry) হিন্দুস্থানে বিকশিত, তবে কি জানি, দেখে আমার কেমন একটু হাঁসি পায়। চারুহাসিনী ভগিনি পাঠিকে, সহিসরূপী পতিসঙ্গে এইরূপে অশ্বপৃষ্ঠে রাজপথে বিচরণ করিতে সখ যায় কি?

স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা হিন্দুস্থানীরা এখনও যেন আদৌ বুঝিতে পারে না। কখন কোন হিন্দুস্থানী বালিকাকে পাঠ করিতে আমি দেখি নাই কিম্বা শুনি নাই। আমি মহারাষ্ট্রীয়া পণ্ডিতা রমাবাই-এর দেশের কথা বলিতেছি না, স্মরণ রাখিবেন।[৫] গৃহেও তাহাদিগের রীতিমত লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া হয় না। আমাদিগের দেশে যদিও স্ত্রীশিক্ষা কেবলমাত্র অঙ্কুরিত হইতেছে, আজও তাহার শুভফল চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয় নাই; তথাপি ইহার প্রয়াজনীয়তা অনেকে প্রায় বুঝিতে পারিয়াছেন এবং যাহাতে বহুল পরিমাণে প্রচলিত হয়, তাহারও কতক চেষ্টা করা হইতেছে। কিন্তু হিন্দুস্থানীদিগের মধ্যে সে চেষ্টাও প্রায় কোনখানে দেখি নাই। তাহাদিগের অন্তঃপুরবাসিনীগণ অজ্ঞানে ঘোর তমসাচ্ছন্ন। কি এই দেশে, কি বাঙ্গালায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশেষ উদ্যোগ ও চেষ্টা আবশ্যক। আমাদিগের দেশে রাজনৈতিক উন্নতির জন্য যে রূপ চেষ্টা হইতেছে, তাহার অপেক্ষা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের অধিক চেষ্টা হওয়া আবশ্যক। আমাদিগের দেশের পুরুষগণ নিজের অন্তঃপুরের মূর্খতা, কুসংস্কার এবং অন্ধকার দূর করিবার কোন চেষ্টা না করিয়া বাহিরে "দেশীয় উন্নতি" "দেশীয় উন্নতি" বলিয়া যে চীৎকার করেন, তাহার জন্য অনেক সাহেব তাঁহাদিগকে ধিক্কার দেন, অনেক সময় দেশীয়গণকে এই ধিক্কারের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বোধ হয়।

হিন্দুস্থানীগণ অধিকাংশ পৌত্তলিক, কিন্তু আমাদিগের দেশের ন্যায় এদিকে প্রতিমা পূজা তত প্রচলিত নাই। মহাদেব কিম্বা অন্য কোন বিগ্রহ যাহা যেখানে আছে, তাহারই মধ্যে মধ্যে পূজা করিয়া থাকে। জৈন এবং বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণ মূর্ত্তিবিহীন মন্দিরে উপাসনা করে। অহিংসাই ইহাদের পরম ধর্ম্ম, সেই জন্য ইহারা সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রদীপ জ্বালে না ও কীটাণু সেই দীপে দগ্ধ হইবে আশঙ্কায় অন্ধকারেই আহারাদি করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করে। দীন দরিদ্র অতিথিগণ শূন্য হস্তে কখনই ইহাদিগের ঘর হইতে চলিয়া যায় না, নিজে উপবাস করিয়াও অতিথি সেবা করে। কর্কশ বাক্যে কখন কাহার মনে কষ্ট দেয় না। প্রাণী মাত্রের দুঃখ

দূর এবং অহিংসাই যাহাদিগের পরম ধর্ম্ম, তাহারা অবশ্যই আমাদের পরম শ্রদ্ধার পাত্র।

আজি কালি আবার বাল্যবিবাহ অনেক ইংরাজি-নবিশ পসন্দ করিতেছেন, কিন্তু আমি তাহার উপকারিতা এখনও বুঝিতে পারি নাই। আমার বোধ হয় বঙ্গভূমির অধঃপতনের একটী প্রধান কারণ বাল্যবিবাহ। সেই বাল্যবিবাহ-স্রোত এদিকে ভীষণবেগে প্রবাহিত দেখিয়া সুখী হইতে পারিলাম না। মাতৃগর্ভে সন্তান, পিতামাতা প্রতিশ্রুত হইল; সুতরাং শিশুর জন্মের সহিত বিবাহলিপি লিখিত হইয়া গেল এবং মাতৃগর্ভ পরিত্যাগের পূর্ব্বেই পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইতে হইল। এই বিবাহ প্রথার মনোহারিত্ব ও উপকারিতা আমাব সহজ বুদ্ধিতে কখন অনুভব করিতে পারি না।

বিলাতী সভ্যতার সংস্পর্শে এখনও এদিকে অখাদ্য ভক্ষণাদি প্রচলিত হয় নাই। ধর্ম্ম এবং জাতি অদ্যাপি ইহাদিগের নিকট অতি যত্ন-রক্ষিত পবিত্র সামগ্রী। এমন কি, ইহারা বাঙ্গালীর স্পৃষ্ট কোন দ্রব্য ভক্ষণ করে না, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণেরা জাতিচ্যুত এবং বাঙ্গালী মাত্রেই "খৃষ্টান" এই এদেশের লোকের দৃঢ় বিশ্বাস। লালা (কায়স্থ) ভিন্ন ব্রাহ্মণ কিম্বা ক্ষত্রিয় এদেশে কখন মদ্যপান করে না। এইটী সুখের বিষয় যে, সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয় সমাজের পরিত্যক্ত সন্তান। কিন্তু নীচ জাতীয়দিগের মধ্যে "মৌয়া" (একরূপ মদ্য) অথবা "তাড়ি" পানের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব।

এদেশে জমিদার অর্থে ধনী ব্যক্তি নহে, যাহার কিছু জমি আছে সেই "জমিদার"। এক বিঘা কি ততোধিক জমি থাকিলেই জমিদার নামে অভিহিত হইতে পারা যায়। কিন্তু ক্ষেত্রে গিয়া দেখিবে যে, জমীদারগণ হলধর; নিজ হস্তে ভূমি কর্ষণ করিতেছে, তাহাতে বিন্দুমাত্র অপমানের বিষয় নাই। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি নিজে কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। দাসত্বের রাজভোগে পাদুকা-লেহনে জীবন অতিবাহিত না করিয়া এরূপ স্বাধীনতায় কৃষিকার্য্য করার গৌরব, হতবীর্য্য বাঙ্গালী পুরুষগণ অনুভব করিতে পারিবেন না হয়ত। তাহাদিগের কৃষিকার্য্যে লোভনীয় হল লেখনি, এবং বিস্তৃত ক্ষেত্র শাদা কাগজ, এবং প্রতি বৎসরের প্রচুর ফসল অপমান। ভগিনি পাঠিকে,আমাদিগের স্বামী বা পিতা বা ভাই যখন চাকুরী (দাসত্ব) করিয়া টাকা আনিয়া দেন, সে টাকা দিয়া আমরা গহনা ও শাড়ী কিনি, আমরা কি মনে করি তাহা কত অপমানের টাকা? কত অপমান খাইয়া শ্বেতাঙ্গের কত পদাঘাত নিত্য সহ্য করিয়া সেই টাকা আনিতে হইয়াছে? না, আমরা তা ভাবিব কেন, স্বামী বা পিতার অপমানে আমাদের কি?

সাহস, বীরত্ব এবং আত্মরক্ষার গৌরবে যে ক্ষত্রিয় জাতি জগতের ইতিহাসে আদর্শ স্থানীয়, সেই বীর বংশে দ্বারবানের জন্ম! তাহাদের আজ এই দুর্গতি হেরিয়া অন্তরে বিষাদের সঞ্চার হয় সত্য, তথাপি ব্রাহ্মণ জাতির নীচতায় প্রাণে দারুণ আঘাত লাগে। আর এক কথা বলি, পশ্চিমের সামান্য অবস্থার ব্রাহ্মণগণ মোট বহে এবং গরুর গাড়ী চালাইয়া থাকে, তাহা

অদ্যাপি দেখিতে পাই এবং যাঁহাদিগের বুদ্ধি বিদ্যার অবিনশ্বর অত্যাশ্চর্য্য কীর্ত্তি ভাবিতেই আহ্লাদে ও ভক্তিতে রোমাঞ্চ হয় এখনও, সেই জাতির এই শোচনীয় পতন কীরূপে সহনীয় হইতে পারে? ধন, মান, কিম্বা বংশ-মর্য্যাদায় মনুষ্যে মনুষ্যে দূরতা কখনই ইচ্ছনীয় নহে, এবং যত শীঘ্র এই জাতিগত বৈষম্য বিদূরিত হয়, ততই সমাজের মঙ্গল; তবুও হৃদয়ের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত ব্রাহ্মণত্বের মহিমা ভুলিতে পারি না। সুদূর সাগর পারে রহিয়াও বিদেশী পণ্ডিতপ্রবর মোক্ষ-মূলার যে জাতির গৌরব গীত নিয়ত উচ্চকণ্ঠে গাইতেছেন, যিনি ব্রাহ্মণত্বের উচ্চতা কখন বিস্মৃত হন না, আজি হতভাগ্য হইয়াছি বলিয়া সেই জাতির মহিমাময় পবিত্রতা কি রূপে ভুলিতে পারি?

প্রখর বুদ্ধিবলে বাঙ্গালী সর্ব্বত্র পূজিত। পশ্চিমে বাঙ্গালীদিগের অত্যন্ত সম্মান ও তাহারা নিরীহ হিন্দুস্থানীদিগকে একরূপ চালাইয়া থাকে বলিলেও হইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ বাঙ্গালী এদিকে আসিয়া সমাজ-ভয় যেন একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায়, কুৎসিত আমোদ প্রমোদ এবং অসার গল্পে জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকে। সাধারণতঃ উৎসাহ নাই, কার্য্য কিম্বা চিন্তা নাই, কেবল আলস্যে ও তাস পাসায় মূল্যবান সময় ক্ষেপণ করিয়া সুখী হয়। এই ঊনবিংশ শতাব্দীর দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য কি রাজনীতির অবস্থা কিরূপ তাহা তাহারা অবগত হইতে ইচ্ছা করে না। সংবাদপত্র পড়ে না ও বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীর দোষগুণ কি তাহাও সম্যকরূপে জানিতে চাহে না। অর্থোপার্জ্জনে যে কিসে মস্তিষ্কের পরিচালনা আবশ্যক, দিবাভাগে কোনরূপে তাহাতে ব্যাপৃত থাকিয়া অপরাহ্নে দশ পাঁচজন একত্র হইয়া অক্ষক্রীড়ায় সেই দিবা ক্লান্তি দূর করিয়া সুখী হয়। শিক্ষা ও জ্ঞানে তাহারা যেন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, আর এ জীবনে যেন তাঁহাদিগের কিছু শিখিবার কি জানিবার নাই।

কাব্যশাস্ত্র বিনোদেন
কাল গচ্ছতি ধীমতং
ব্যসনেন চ মূর্খানাং
নিদ্রায়া কলহেন চ

তাহাদিগের সম্বন্ধে একটী বলিতে পারা যায়। যাহা দোষ তাহা বলিলাম, এখন গুণের কথা বলি।

পশ্চিমবাসী বাঙ্গালীরা মুক্ত হৃদয়ে যত্নের সহিত অতিথি সৎকার করিয়া থাকে, সাধ্যমত দান করিতেও তাহারা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহে এবং স্বজাতি ও আত্মীয়গণের বিপদে তাহারা নিতান্ত চিন্তার সহিত ইচ্ছাপূর্ব্বক অর্থ সাহায্য করিয়া তাহাদিগকে বিপদ মুক্ত করিয়া সুখানুভব করে। কত প্রতারক দুঃখের রঞ্জিত ইতিহাস প্রস্তুত করিয়া অধিকাংশ সময়ই তাহাদিগের নিকট ভুলাইয়া অর্থ লইয়া যায়, কিন্তু তাহারা বারম্বার এ প্রকার প্রতারিত হইয়াও দানে বিমুখ নহে। কোনও আত্মীয় ব্যক্তি পীড়িত হইয়া তাহাদিগের গৃহে আশ্রয় লইলে চিকিৎসকের এবং ঔষধের অর্থ পর্য্যন্ত নিজে দিয়া থাকে ও তাহাতে অণুমাত্র ক্ষতি বোধ করে না। শত অসুবিধা

সময় সময় সহ্য করিয়াও পরিচিত অপরিচিত অতিথির সেবা করিতে সতত উৎসুক থাকে। দেশের কাহাকেও দেখিলে যেন চরিতার্থ হইয়া যায়। মার্জ্জিত সহৃদয় ভদ্রতা ও আপ্যায়িত ইহাদিগের নিকট শিক্ষা করা যাইতে পারে বলিলে কিছু বেশী বলা হইবে না। গৃহ-বিচ্ছেদ (দলাদলি) ইহাদিগের মধ্যে থাকিলেও ইহারা বান্ধব-প্রিয় এবং দয়ালু।

এটোয়া সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলিবার নাই। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমের অন্যান্য সামান্য যাহা জানিতাম, তাহা বলিয়াছি।

এটোয়া পরিত্যাগ*

ক্রমে শীতাবসান হইতে লাগিল; আমিও এটোয়া পরিত্যাগের চেষ্টায় থাকিলাম। তখন আমি সেনিটারী কমিশনারের ন্যায় উত্তরে পশ্চিমাঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন নগরের স্বাস্থ্য ও মৃত্যু সংখ্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। লক্ষ্ণৌ, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানে প্রচণ্ড মারিভয় উপস্থিত হওয়ায় সেখানে রাজাজ্ঞায় যাত্রী সমাগম নিষিদ্ধ হইয়াছিল। আমিও যত্ন ও ব্যয়ে পুনর্লব্ধ স্বাস্থ্য, অপরিণত বয়সের ভ্রমণেচ্ছা বাসনা-মন্দিরে বলিদান দিতে উৎসুক ছিলাম না, সুতরাং আমার ভ্রমণ-লোলুপ নেত্র একদিকে নিবারিত হইয়া অন্যদিকে সঞ্চালিত হইতে বাধ্য হইল।

২৪শে ফেব্রুয়ারী, প্রত্যুষের ট্রেণে আমরা এটোয়া ত্যাগ করিয়া আগ্রাভিমুখে যাত্রা করি। প্রভাতে গাড়ী "তুন্ডুলা" পৌঁছিলে সে গাড়ী ছাড়িয়া আগ্রার গাড়ীতে উঠিলাম এবং ৮।।০ ঘটিকার সময় আগ্রা গিয়া উত্তীর্ণ হইলাম। কতক পথ যাইতে না যাইতে অর্দ্ধ-প্রকাশিত, অর্দ্ধ-লুক্কায়িত ভাবে নীলাকাশ স্পর্শ করিতে করিতে তাজমহলের ধবল প্রস্তর নির্ম্মিত অপূর্ব্ব দীপ্তিময় শিল্প-প্রভার উজ্জ্বল গৌরব আমাদিগের দৃষ্টিপথে সহসা প্রতিভাত হইল, এবং সেই স্বপ্নময় স্মৃতিশাখা তাজের গগনস্পর্শী শ্বেত চূড়া কতক দেখিয়াই কেমন যেন এক মোহস্বপ্নে ডুবিয়া গেলাম। আমি সে অবস্থা বর্ণনার চেষ্টা করিব না। চক্ষের সম্মুখে সকলি জীবন্ত চিত্র, অথচ যেন তাহা বহুদিন দৃষ্ট অতীত স্বপ্নবৎ ভাবপূর্ণ, স্মৃতিতে জাগিবে জাগিবে করিয়া জাগিতেছে না, দেখিতে পাওয়া যাইতেছে সব, কিন্তু ছুঁইতে কি ধরিতে ক্ষমতা নাই। দূর হইতে সেই মানসমোহন তাজমহলের শিখরমালা নিরীক্ষণ করিয়া কত আশার কথা, কত নিরাশার অশ্রু হৃদয়কে সুখে দুঃখে হাসি কান্নাময় করিয়া ফেলিল,—আমি আমাকে তখন ভুলিবার জন্য অন্যমনা হইবার প্রয়াস পাইলাম, এমন সময় উদার সৌন্দর্য্যপূর্ণ সুবিস্তৃত যমুনা সেতু দেখিয়া

* এই প্রবন্ধের পূর্ব্বাংশ আলোচনায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে তাজমহল ভুলিয়া গেলাম এবং "যমুনা লহরী" সঙ্গীতের "নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা, তটশালিনী সুন্দর যমুনে ও" ভাবিতে ভাবিতে সেতু পার হইলাম।

আমরা গাড়ী হইতে নামিয়া পথভ্রান্ত পথিকপ্রায়, ক্লান্তভাবে, কোথায় যাইব, কি করিব ভাবিয়া (Overland) সেতুর উপর কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। তখন একজন হিন্দুস্থানী, বর্ণে কাফ্রি বিনিন্দিত, নাসিকায় চীনবাসী লজ্জা পায়, স্বশরীরে আসিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া একখান খাতা দেখাইল। তাহাতে অনেক বাঙ্গালী যাত্রীর পরিচিত নাম দেখিয়া আমরা গৃহে বাসা লইতে স্বীকৃত হইলাম। তার গৃহে যাইবার সময় পথিমধ্যে কয়েকটী স্ত্রীলোক সহসা আসিয়া আমাদিগকে যেন ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিল। তাহারা ইতর স্ত্রীলোক, বিদেশী পথিকদিগকে প্রলোভন দেখাইয়া আগে নিজ গৃহে লইয়া যায় ও পরে যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করে। আমরা বহু কষ্টে সেই মায়ারূপিনী রাক্ষসীগণের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির গৃহে বাসা লইলাম।

আমরা যে গৃহে বাসা লইয়াছিলাম, তাহা দ্বিতল ও যমুনা নিকটস্থ রাজপথবর্ত্তী। পথশ্রান্তির পর তাহা পরিপাটী এবং নয়ন তৃপ্তিকর বোধ হইল।

আমরা আসিবামাত্র কিরূপে যে সেই সংবাদ আগ্রাবাসী ফেরিওয়ালাদিগের মধ্যে টেলিগ্রাফ হইল, সে রহস্যভেদ করিতে এখনও পারি না। অল্পকালের মধ্যেই তাহারা ঝাকে২ আসিতে লাগিল ও নানাপ্রকার কারুকার্য্য বিশিষ্ট বিবিধ প্রস্তর সামগ্রী বিক্রয়ার্থে আনিয়া মন ভুলাইতে লাগিল। সেই সকল সুন্দরতর শিল্পকার্য্য দেখিয়া মন আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া যায়। তবে তাহার অসম্ভব মূল্য শুনিয়া হর্ষ বিষাদে পরিণত হইয়া থাকে। ধর্ম্মভয়-বিরহিত বিক্রেতাগণ সর্ব্বত্রই সমান। সেই বিক্রেতাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আবার অপেক্ষাকৃত কিছু বেশী বুদ্ধিমান্। তাহারা বিক্রীত দ্রব্যের সহিত অনেক বড় লোকের নামও মস্তকে বহন করে এবং বাঙ্গালী দেখিলে তাহা বিজয় নিশান স্বরূপ দর্শন করাইয়া থাকে। তাহাদিগের সেই পণ্যদ্রব্যের অংশরূপ নামাবলীর মধ্যে প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের নাম দেখিলাম।[৪] কিন্তু তাহাতে দাম করিয়া দ্রব্যক্রয়ের কোনই সুবিধা হইল না। তখন ভাবিলাম, "স্বদেশীয় (এন্টিকোয়েরিয়ান) পণ্ডিত ব্যক্তির নামে বিদেশে সুলভমূল্যে কিছু পাওয়া যায় না, বরং বড় লোকের রেটে গরিবরা অনেক সময় মারা যায়।" দূর প্রবাসে স্বজাতির পণ্ডিত ব্যক্তির অপরিচিত নিদর্শন হস্তাক্ষর দেখিয়া, সত্যই বড় আনন্দিত হইয়াছিলাম। তাহা দেখাইয়া যে বিক্রেতাগণ আমাদিগকে ঠকাইতে পারে নাই, সেজন্য এখনও সন্তুষ্ট আছি। আমরা আহারান্তে সেইদিনই আগ্রানগরী, তাজ এবং যমুনার শোভা দেখিবার জন্য বাহির হইলাম।

অগ্রবন

(আগ্রা)

অগ্রবন মোগল বাদসাহদিগের সময়ের মহা সমৃদ্ধিশালী রাজধানী ও হিন্দুদিগের একটী তীর্থ,

মথুরা বৃন্দাবনের চৌষট্টি ক্রোশের মধ্যে যে সকল স্থান আছে, সে সমুদায় তীর্থমধ্যে পরিগণিত এবং তাহাদের অগ্রবর্ত্তী বলিয়াই আগ্রার প্রাচীন নাম অগ্রবন। ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ এখানেও বিহার করেন, তাহাতেই তীর্থযাত্রী বৈষ্ণবগণ রীতিমত পূর্ব্বে অগ্রবন পরিদর্শন ও যমুনায় স্নানাদি করিয়া শেষে মথুরা বৃন্দাবন যায়। আমরা তীর্থ-যাত্রী না হইলেও, আগে অগ্রবন দর্শন করি, তবে যমুনায় স্নান করিবার সৌভাগ্য আমার ভাগ্যে ঘটে নাই।

যমুনার তীরোপরি সৌষ্ঠবময়ী শ্রীসম্পন্না "সুন্দরীতরা" প্রস্ফুটিতা নগরী আগ্রা আলেখ্যবৎ বিরাজিতা। তাহার অতুলনীয় "ধবল সৌধছবি" নীল সলিলে আপনার মুখ আপনি দেখিয়া দেখিয়া যেন প্রতিবার মুগ্ধ হইয়া যাইতেছে। সেই প্রতিবিম্বিত রূপরাশি "মরি মরি কোন বিধাতা গড়িয়া ছিলরে।" দর্শকের চিত্তমুগ্ধকর সে শোভার কথা কিরূপে ভাষায় প্রকাশ করিব?

অসংখ্য জনস্রোত আগ্রার বৃহৎ প্রস্তরময় রাজপথে অবিরাম প্রবাহিত হইতেছে, তাহার বিরাম নাই, কেবলি কলরব ও মনুষ্যমস্তক শুনিবে এবং দেখিবে মাত্র। সেই কঠিন শিলাময় ধূলিরঞ্জিত রাজবর্ত্মে পদব্রজে বাহির হওয়া সুখকর ব্যাপার বোধ হয় না।

আগ্রার বিপণীগুলি পরিপাটীরূপে সুসজ্জিত এবং প্রস্তরের কারুকার্য্যে দোকান সকল নয়ন-প্রীতিকর। পথিকগণ রাজপথে চলিতে চলিতে অনেক সময় অনন্যমনে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া যায় ও তাহা দেখিয়া যেন পথক্লান্তি দূর করিয়া থাকে।

তাজ

যখন অস্তগামী অংশুমালীর কনককিরণে পশ্চিমাকাশ অনুরঞ্জিত, সেই হৈম রশ্মিকণা যমুনার নীলবক্ষে মৃদুল তরঙ্গে কখন ভাসিয়া, কখন ডুবিয়া জলক্রীড়া করিতেছিল, যমুনা-হৃদয়ে সেই কিরণমালার লুকোচুরী খেলা—শোভার মাধুরী নয়ন ভরিয়া দেখিতে দেখিতে দিবাবসানে আমরাও তাজমহলের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম।

ইতিহাসে ও বন্ধুপ্রমুখাৎ আশৈশব শ্রবণ করিয়া এবং কল্পনা নেত্রে নির্জ্জনে কখন কখন দেখিয়া তাজমহল যেন আমার চিরপরিচিত হইয়া গিয়াছিল। সেই কল্পনা-জাত মানসচিত্র তাজমহল, এখন আবার তাহার সেই অপূর্ব্বশরীরী মাধুরীময় ছবি, সেই সর্ব্বজন-মনোমোহনমূর্ত্তি চক্ষুর সম্মুখে জীবন্ত হেরিয়া হৃদয় কেমন যে হইয়া গেল, সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ আমি স্তম্ভিত ও অবাক হইয়া গেলাম এবং মুহূর্ত্ত মাত্র শূন্য দৃষ্টিতে সেই অনন্ত শোভাপূর্ণ অমরাবতীসম প্রণয়-সমাধি-সৌধের কারুকার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া আত্মহারা হইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলাম। সে স্মৃতিময় চিন্তা শৈশবের সুখস্বপ্নের মত অস্ফুট নহে। প্রকৃত প্রণয়ের প্রথম দৃষ্টির ন্যায় তাহা মধুময়, প্রিয়তমের প্রেম-সম্ভাষণের ন্যায় তাহা প্রাণস্পর্শকর, ললিত সঙ্গীত অনুভবে আজিও তাহা হৃদয়ে সজীবতা আনিয়া দেয়। সে স্মৃতি ভুলিবার নহে। পৃথিবীতে "সাতটী আশ্চর্য্য দ্রব্য" আছে, আমার ভাগ্যে অন্যগুলির দর্শন না ঘটিলেও, তাজমহলকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিতে যেন

ইচ্ছা করে। কঠিন প্রস্তরে ললিত সঙ্গীত, ভাবুক জনহৃদয়ে আশার হাস্য, প্রণয়ের স্বপ্নময় সুখদ সম্মিলন এবং শিল্পের চরমোৎকর্ষ অপূর্ব্ব শিলায় একত্র সন্নিবেশিত দেখিয়া, কে না ক্ষণকালের নিমিত্ত, এই রোগ শোক দুঃখ বিজড়িত পার্থিব জগৎ এবং মনুষ্যজীবনের গত নৈরাশ্যের যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইবে?

মৃতপত্নীর প্রণয়-স্মৃতি ইহজগতে চিরস্থায়ী করিবার জন্য এই অমূল্য, অতুলনীয় তাজ (সমাধি) নির্ম্মিত হইয়াছে। অপরিমিত অর্থ, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং শিল্পের চরমোৎকর্ষ ইহাতে পর্য্যবসিত হইয়া গিয়াছে। তীর্থস্থানে কোন মহাপুরুষ কিম্বা কোন দেবমূর্ত্তি দর্শন করিবার নিমিত্ত পর্ব্বদিনে যেমন জনসমাগম হইয়া থাকে, তেমনি প্রতিদিন প্রদোষে এই অমর সমাধি দর্শনার্থে অগণ্য লোক একত্র দেখিতে পাওয়া যায় ও বারেক মাত্র সকলে যেন ইহার শোভা দেখিয়া নয়ন সার্থক জ্ঞান করে। প্রদীপ্ত চন্দ্রালোকে তাজ দেখিতে আরো মনোহর।

তাজমহলের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া জনৈক ইংরাজ মহিলা একটী কবিতায় লিখিয়াছিলেন যে, "তুমি নারীকুলে ভাগ্যবতী, তাই এই স্বর্গীয় রশ্মিমালা-বিনির্ম্মিত তাজ তোমার সমাধিমন্দির, তুমিই পতি-সোহাগিনী, তোমার ন্যায় ভাগ্য এ-জগতে কাহার আর?" কিন্তু আমি তাজ দেখিয়া এত যে মোহিত হইয়াছিলাম, স্বর্গের স্বাপ্নিক মাধুরী যেন প্রস্তরে বিকশিত দেখিলাম বোধ হইল,—তথাচ আমি মনে করি, প্রকৃত অকৃত্রিম অপার্থিব পবিত্র প্রণয় এই সুন্দর মহান সমাধি-সৌধ তাজ অপেক্ষা সুন্দরতর, মহত্ত্বতর ও অনন্ত সজীব। প্রকৃত এবং অমর প্রণয়ের গৌরবে অযুত অযুত তাজ নিমগ্ন ও বিলীন হইয়া যায়। যে প্রণয়ে নাস্তিক হৃদয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও পরলোকে বিশ্বাস, ব্রাহ্মে পৌত্তলিকতা এবং ইহজীবনেই অনন্ত অক্ষয় জীবন্ত স্বর্গ আনয়ন করে ও যে প্রেমে দুই পৃথক আত্মা একত্রীভূত হইয়া পরমাত্মাতে শেষে সম্মিলিত হয়, ও একের অস্তিত্বে অন্য জীবন ধারণ করে, সে প্রণয়ের স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার জন্য কোন পার্থিব সমাধির যে প্রয়োজন আছে, আমি ত তাহা বুঝিতে পারি না। এক-জনের মৃত্যুতে অন্য একজন জীবিত, ইহলোকেই যাহার জীবন্ত সমাধি হইয়া থাকে, সেই অপার্থিব প্রেমের অবিনশ্বর সমাধির স্থান এ অনন্ত বিভব নহে। তাজমহল স্বরূপ অলৌকিক সমাধিমন্দির দেখিয়াও তাহার অভ্যন্তরে চিরনিদ্রিতা সাজাহান প্রেয়সী মহিষীকে "নারীকুলে ভাগ্যবতী" কিম্বা "পতি-সোহাগিনী" বলিয়া আমি মনে করি না।

তাজ দেখিয়া অনেক ইংরাজ ভ্রমণকারী নানা প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন, সে সকল এস্থলে উল্লেখ করিবার কোন প্রয়োজন নাই—কিন্তু কিছুদিন হইল একজন ইংরাজ *Statesman* পত্রিকায় ঐ বিষয় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে বেশ একটু নূতনত্ব ও সার আছে এবং আমি তাঁহার মত সম্পূর্ণ সহানুভূতির সহিত গ্রহণ করিয়াছি।

সাজাহান আপন সুন্দরী প্রিয়তমা রমণীর সমাধিহর্ম্ম্যে অগণ্য অর্থ ঐ প্রকারে ব্যয় না করিয়া, যদি তাঁহার স্মরণার্থে, তাঁহার নামে কোন পতিতাশ্রম, পান্থশালা কিম্বা কোন শিক্ষালয় স্থাপন করিয়া যাইতেন, তাহাতে তাঁহার কীর্ত্তিময় উপকার জগতে যেমন চিরস্থায়ী ও স্মরণীয় হইত, ইহাতে সে প্রকার কিছু হয় নাই। কখন কোন পথিক দর্শক, অথবা কোন ভ্রমণকারী

একদিন মাত্র তাজ দেখিয়া যে সুখ পায়, তাহা অকিঞ্চিৎকর! তাজমহলের দ্বারা সংসারের অন্য কোনই উপকার দেখি না। ইহাকে হৃদয়বিহীন সুন্দর সজ্জিত পাষাণময়ী দেব প্রতিমার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, কারণ, বাহিরে তাহার অতুলনীয় শোভাময় হেম কিরণবৎ মাধুরী ঝরিয়া পড়িতেছে যেন দেখিয়া মনে হয়, অঙ্গুলী দ্বারা স্পর্শ করিতে সাহস হয় না, বোধ হয় যেন মনুষ্যের করস্পর্শে তাহার দেবত্ব, কমনীয় কান্তি মলিন হইয়া যাইবে, "ছুঁইলে নখের কোণে বিষম বাজিবে প্রাণে" ভাবিয়া কোমল স্নেহের করেও স্পর্শ করিতে প্রাণে কেমন ব্যথা লাগে, কিন্তু তাহার হৃদয় মাঝারে মৃত শরীর সমাধিশয্যায় প্রোথিত রহিয়াছে, ভাবিলে, কল্পনায়ও মন বিষণ্ণ হইয়া যায়। বাহিরের চাকচিক্যে ভিতরের মলিনতা দূর হয় না। অমিশ্রিত পবিত্রতা অতীব উপাদেয় এবং অপার্থিব।

তাজমহলের ভিতর প্রবেশ করিবার সময় মুসলমানগণ জুতা পরিহার করিতে বারম্বার অনুরোধ করে এবং কখন বা দীনহীন দেখিলে কিছু কর্কশতা প্রদর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু শ্বেতপদের সর্ব্বত্র সমান সম্মান ও অধিকার, মানবের সমাধি মন্দির-প্রবেশে দেবজাতি পাদুকা ত্যাগ করিবে কেন? এই পাদুকা রহস্য অবলম্বন করিয়া সেই স্থানীয় মুসলমানেরা বিষণ্ণ-ভাবে যাহা বলে, তাহার অর্থ,—

বৃটিশ সিংহের বিকট বদন,
না পারি নির্ভয়ে করিতে দর্শন,
কি বাণিজ্যকারী অথবা প্রহরী—
জাহাজী গৌরাঙ্গ কিবা ভেকধারী,
সম্রাট ভাবিয়া পূজি সবারে।

তাজমহল, তাহার সম্মুখস্থ রমণীয় পুষ্পোদ্যান এবং তাহার হৃদয়ে কৃত্রিম উৎস একে একে নয়ন ভরিয়া অবলোকন করিয়া পরিশেষে আমরা সায়াহ্ন সমীরণ সেবন করিতে করিতে মন্দির ইসলামদৌলা (ইহার প্রকৃত উচ্চারণ আমি জানি না, সেখানে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই লিখিলাম) গিয়া পৌঁছিলাম। এই রম্য হর্ম্ম্যের প্রস্তরময় ভিত্তি যমুনা-বক্ষে প্রোথিত। আগ্রার সৌধমালার প্রত্যেকটীর এমন এক অপরূপ সৌন্দর্য্য আছে যে, তাহার কোন্‌টী রাখিয়া কোন্‌টী দেখিব, তাহা অনুমান করা যায় না। বাদসাগণ এই ইসলামদৌলার প্রশস্ত উচ্চ প্রোথিত প্রাঙ্গণে বসিয়া প্রদোষে যমুনার জলক্রীড়া দর্শন করিতেন। সেই অনৈসর্গিক রূপরাশি যমুনা, যখনি দেখা যায় তখনি মন আহ্লাদে পরিপ্লুত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্যময়ী নীলবর্ণা যমুনা বর্ষাকালে যখন পূর্ণাঙ্গিনী হইয়া রূপভরে উছলিয়া পড়ে, তৎকালে তাহার সেই তরঙ্গায়িত পূর্ণ মাধুরী কল্পনাতীত শোভা ধারণ করে। অতীতের সাক্ষী-রূপিণী "লীলাময়ী যমুনার তরঙ্গ" নিচয় দর্শন করিয়া অনেক বিষাদময়ী চিন্তার আঘাত আমার হৃদয়ে লাগিয়াছিল।

উৎসব দিবাবসানে, প্রিয়জন প্রবাস গমনে, বিজয়াদশমীর দিনে, নির্জ্জন গৃহে একক নিশীথে হৃদয় যেমন একপ্রকার অবসাদ ও পরিত্যক্ত ভাবে নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া

যায় ও সুখময় ভূত স্মৃতি কেবলমাত্র শূন্যতা আনয়ন করে, যমুনার তীর ছাড়িয়া আমার মনও সেই প্রকার কেমন এক অবসন্ন ভাবে বিষাদে ডুবিয়া গিয়াছিল। অশান্তির স্বপ্নময় ভাঙ্গাভাঙ্গা নিদ্রায় দীর্ঘ রজনী অতিবাহিত করিলাম। সুখ দুঃখ উভয়ই সমানে চলিয়া যায়, তাহার স্মৃতিমাত্র আমরা আজীবন অন্তরে বহন করি। এ-স্মৃতিও চিরদিন আমার হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে।

দুর্গ

পরদিন অরুণোদয়ে শয্যা ত্যাগ করিয়া আমরা আগ্রা-দুর্গ প্রবেশার্থে "পাস" (Pass) সংগ্রহে ব্যস্ত হইলাম। বিশ্রাম বারে (রবিবার) ইংরাজের আফিস ইত্যাদি বন্ধ, সুতরাং পাস পাইতে সেদিন একটু পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতে হইল। শুনিলাম, সেখানকার Brigade General লোক ভাল, ভদ্রলোকের সম্মান রাখিয়া থাকেন। আমরা তাঁর কর্ম্মচারীগণের নিকট পাস পাইলাম। আমরা দুর্গ ইত্যাদি দেখিবার জন্য বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহরের সময় বাসা পরিত্যাগ করিলাম। প্রথমে দুর্গদ্বারে প্রবেশ করিবামাত্র জনৈক সজ্জিত শিক সৈনিক আমাদিগের পাস দেখিতে চাহিল। আমাদের গাড়ীর বাহিরে General সাহেবের চাপরাশি ছিল, সে মুখে পাস আছে কহিয়া অন্যদ্বারে গাড়ী লইয়া গেল। আমরাও সেই স্থানে গাড়ী হইতে নামিলাম। দিবা দ্বিপ্রহরে পশ্চিমের আতপ তাপে দগ্ধ হওয়া বড় সুখকর নহে। প্রস্তরময় ভূমি,—তপ্ত অগ্নিকণাবৎ পদতল তাহাতে নিষ্ঠুরভাবে দগ্ধ করিয়া এবং প্রচণ্ড সূর্য্যকর মস্তকে ধরিয়া পুড়িতে পুড়িতে তখন দুর্গের মধ্যে যাইবার নিমিত্ত দ্বিতীয় দ্বারে গিয়া দাঁড়াইলাম। সেখানে একজন গোরা সৈনিক পাহারায় বসিয়াছিল, সে আবার পাস "তলপ" করিল। এবার ত আর মুখের কথায় চলে না, এবার তা দেখাইতে হইল। সে তাহা সম্রাট সম প্রভুত্বের সহিত মঞ্জুর করিলে আমরা দুর্গমধ্যে যাইতে পারিলাম।

আগ্রা-দুর্গ হৃদয়ে আর একটী চিত্রিতা সুন্দরী নারী যেন শোভা পাইতেছে। তাহার মনোমোহন সৌন্দর্য্য, তখন তৃপ্তিকর চারুতা দেখিয়া কতক্ষণ চাহিয়া থাকিতে হয়। অচেতন সৌন্দর্য্য, সচেতন জীবের প্রাণে কত আনন্দ দেয়। ইংরাজ সৈনিক পুরুষদিগের বাসগৃহগুলি এই দুর্গের ভিতর এবং তাহা অতি পরিপাটী ও পরিষ্কার। প্রাঙ্গণে সুস্থকায় প্রফুল্ল স্বাধীন প্রকৃতি ইংরাজ বালক বালিকাগণ আনন্দে ক্রীড়া করিতেছে—যেন শকুন্তলা-সুত সিংহ-শিশুর কেশর ধরিয়া বিক্রমে খেলিতেছে—এমনি স্বাধীন ও জীবন্ত ভাব। ভারতের অতীত দিনে বীরপুত্রগণ যেরূপ করিয়া ক্রীড়া করিত, তাহা কেবল পুরাণ এবং ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এই বালকের স্বাধীনতাময় খেলায় ও নির্ভীকতায় সেই ভূতকালের চিহ্ন কিছু রহিয়াছে মনে হয়। দাসপুত্রগণ জন্মিয়াই মাতৃদুগ্ধের সহিত ভীরুতাই যেন পান করিয়া থাকে, এবং বালকের খেলাতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। জন্মিয়া যে অধীনতার আঁধারে পরিবর্দ্ধিত হয়, বয়সে জ্ঞান সহকারে তাহা পরিহার করিতে পারে না। শাস্ত্রে আছে, "স্ত্রীজাতি বাল্যে

পিতা, যৌবনে পতি, এবং বার্দ্ধক্যে পুত্র কর্ত্তৃক রক্ষিতা হইবেন। নারী কখনই স্বাধীন নহেন।" কিন্তু আমার বোধ হয়, বাঙ্গালী পুরুষ সম্বন্ধে রূপান্তর করিলে এ শ্লোক কতক খাটে, যেমন বাঙ্গালী পুরুষ শৈশবে দিদিমার নিকট রহিয়া, কৈশোরে পাঠারম্ভে জননীর অন্তরালে থাকিয়া এবং যৌবন সমাগম হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত গৃহিণীর অঞ্চল ধরিয়া আপনাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। পত্নীর নিকট মন্ত্রপূত হইয়া বীরত্ব প্রকাশের যাহা কিছু অবসর (অনেকের পক্ষে) আশ্রিতা অনাথিনী বিধবা ভগিনী কিম্বা ভ্রাতৃজায়া অথবা বৃদ্ধা পিসী মাসী প্রভৃতির উপর, নতুবা বীর (?) বাঙ্গালী চিরকালই অন্যের দ্বারা রক্ষিত। আফিসে প্রভুর অপমানের বিনিময়ে কিরূপে হাত তুলিতে সাহসী হইবেন? সে ত আর তাঁহাদের কোন দোষ নহে, কলির শাস্ত্রই তাঁহারা সকল বিষয়ে মানিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে যেখানে বাদসাহদিগের বিলাসভূমি ও আরাম নিকেতন ছিল, আজি সেখানে বিদেশীয় সামান্য সৈনিকগণের বাস,—ইহা দেখিলে ভবিষ্যৎ যে চির অজ্ঞাত ও ধন, সম্পদ, মান, সম্ভ্রম যে কেবলমাত্র কথার কথা, ইহাই মনে হয়। যে জীবনের শেষ চিহ্ন শ্মশান-মৃত্তিকায় কিম্বা সমাধিতলে, তাহার জন্য এত হিংসা দ্বেষ বা পরনিন্দা কেন?

"মতি মস্‌জিদ" ও অন্যান্য প্রাসাদগুলিও এই দুর্গের মধ্যে অবস্থিত। "মতি মস্‌জিদ" মোগল বাদসাহগণের পারিবারিক ভজনালয়, ইহাও মর্ম্মর বিনির্ম্মিত, এবং দেখিতে যেমন মনোহর, তেমনি মূল্যবান্ প্রস্তরে পূর্ব্বে ভূষিত ছিল। এখনও তাহার সেই রাজকীয় গৌরবের কতক কতক নিদর্শন রহিয়াছে, কিন্তু সে স্বজনতা আর নাই। সমাধিমন্দির অমরাবতী সদৃশ নিরুপম শোভান্বিত হইলেও, তাহার জীবনশূন্য পরিত্যক্তভাবে দর্শকের চিত্তরঞ্জন করিতে পারে না। যখন বন্ধু-বান্ধব পরিবেষ্টিত হইয়া উপাসনালয়ে বাদসাহগণ "নমাজ" করিতেন, সে এক দিন, আর আজ এ এক দিন। সময়ের সর্ব্বসংহারক মূর্ত্তি কি ভয়ানক! যাহা যায়, তা আর ত ফিরিয়া আইসে না। থাকে কেবল—শোকের হাহাকার দৃশ্য!

বাদসাহদিগের সায়াহ্ন সমীরণ-সেবন-স্থান কেমন পূর্ব্ব আরাম স্মরণ করাইয়া দেয়। এইখানে বসিলে যমুনার লীলাময়ী শোভা মুক্তভাবে নয়নে প্রতিভাত হইয়া থাকে। আমরা ঘুরিতে ঘুরিতে যেই এইখানে আসিয়া দাঁড়াইলাম, কে যেন যাদুকর দণ্ডসম পরশি হৃদয়,

সৃজিয়া নূতন ভব
শত দৃশ্য অভিনব
নয়ন সমীপে আজি ধরিল আমার
কিম্বা সবার।

প্রদোষের সূর্য্যকরে যেন জগৎ নূতন এক পরিচ্ছদে আমাদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। আমরা তখন কি ছাড়িয়া কি দেখিব, বুঝিতে পারিলাম না। সম্রাট আকবর সকল ধর্ম্মের প্রতি ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। শুনিলাম, তিনি নাকি এই প্রাসাদের উপর দাঁড়াইয়া অস্তগামী রবিকরে মথুরার দেবমন্দিরের চূড়াদর্শন করিতেন। একথা কতদূর সত্য, তাহা জানি না; তবে এখান

হইতে অপরাহ্নে নিমীলিত দিবাকরে মথুরার দেবালয়ের চূড়া বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে যমুনা-হৃদয়-স্পর্শকারী শীতলবায়ু সেবন করিতে করিতে সম্রাটগণ এইখানে বসিয়া নর্ত্তকীকণ্ঠ-বিনিঃসৃত মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন।

এখানে দুইখানি "তক্ত" প্রস্তরাসন আছে। কৃষ্ণবর্ণ শিলাসনে স্বয়ং বাদসাহ ও শ্বেতাসনে বীরবল (মন্ত্রী) বসিয়া কখন কখন নিশীথে গুপ্ত দরবার করিতেন। সেই দুইখানি আসন বহুদিন রৌদ্রতাপে দগ্ধ হওয়াতে, কিম্বা যে কারণে হউক, বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে; এবং সম্রাটের কৃষ্ণাসনের মধ্যে একটা দাগ পড়িয়াছে; কিন্তু সম্পূর্ণ ভাঙ্গে নাই। তবে প্রবাদ এই যে, ইংরাজ কোম্পানী পলাসির যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া যখন আগ্রায় আসিয়াছিলেন, তখন নাকি দুর্গের মধ্যে এদিক সেদিক বেড়াইয়া শেষ এই আসন দেখিতে আসিয়া, সম্রাটের প্রভুত্বের পরিচয় স্বরূপ এই তক্তে একলম্ফেআরোহণ করেন। তাই ইংরাজের (লম্ফলাগিয়া) পদস্পর্শে অভিমানে কৃষ্ণাসন ফাটিয়া যায়। তাহার মধ্যে যে রক্তবর্ণ দাগ পড়িয়াছে, তাহা অভিমানীদিগের বিদীর্ণ হৃদয়ের শোণিত চিহ্ন; প্রস্তরের লালবর্ণ নহে। এই ভ্রমময় প্রবাদের প্রতিবাদ করিলে আগ্রাবাসী সামান্য মুসলমানগণ বড় দুঃখিত হয়। দিল্লীর দরবার ইত্যাদির কথা তুলিয়া নানা প্রকারে অত্যাচার প্রমাণ করিতে শেষে প্রয়াসী হইয়া থাকে।

"শীশমহল" (আয়নার প্রাসাদ) বেগমদিগের চারু নিকেতন। ইহার বাহিরের ভিত্তি চুণী "পান্না" দ্বারা বিভূষিত এবং ভিতরের সমুদায় প্রাচীর খণ্ড খণ্ড আয়নাতে বিমণ্ডিত। প্রতি প্রকোষ্ঠ এমন মনোহর, দেখিলে যেন কল্পনায় ইন্দ্রালয়ের চিত্র মানসে সমুদিত হয়। এই গৃহে একজনের প্রণয়াভিলাষিণী শত মহিলা পৃথক পৃথকভাবে বাস করিতেন। এমন উপাদেয় রম্য প্রাসাদে, শত সহস্র পরিচারিকা সেবিতা ও পরিবেষ্টিতা মহিষীগণ যে নিরুপম সুখে কালাতিপাত করিতেন, ইহা আমার বিশ্বাস হয় না। চিররুদ্ধ ভাবে, সুবর্ণ শৃঙ্খল পরিয়া পরাধীন জীবনে নিশীথ-কল্পনায় মাত্র প্রণয়সুখ অনুভব করিয়া তাঁহারা কখনও যে সরল প্রাণে হাসিয়াছেন, তাহা কে বলিবে? একজনমাত্র সপত্নী-শঙ্কা নারী জীবনের দারুণ যন্ত্রণা ও বিষম কন্টক, আর সজীবিতা শত প্রতিযোগিনী সপত্নীসহ একত্র বাস, কি ভয়ানক ব্যাপার! সে কলহময় ঈর্ষান্বিত সহবাসে স্বর্গও নরক স্বরূপ পূতিগন্ধময় অসহনীয় হইয়া উঠে। তবে যদি "দেবী চৌধুরাণী"র শিক্ষা সদৃশী শিক্ষাগুণে তাহাদিগের সপত্নীর বিষময়ত্ব দূরীকৃত হইয়া থাকে, তাহা বলিতে পারি না।

বেগমগণের প্রাসাদের নিম্নতলে তাঁহাদিগের "বাঁদী"রা থাকিত। সে স্থান অতি শোচনীয়। সূর্য্যকর দিবা দ্বিপ্রহরেও ভুলিয়াও সেখানে যাইত কি না, সে বিষয়ে সমূহ সন্দেহ আছে। রৌদ্র বায়ু পরিবর্জ্জিত সেই গৃহে বাস এবং কখন কখন বেগম-সাহেবদিগের সেবার অণুমাত্র ত্রুটি হইলে আবার তাহার পার্শ্বস্থ অন্ধকূপে দণ্ডস্বরূপ কয়েদ থাকিয়া তাহারা যে মনুষ্য জীবনের প্রতি অনুরাগিনী ছিল, তাহা ত সহজে অনুভব করা যায় না। তবে তাহাদের মনে একমাত্র সান্ত্বনা ছিল যে তাহারা কেহ সুন্দরী হইলে যৌবন-বসন্তে দাসীর অবস্থা হইতে রাজ্ঞীর পদে "প্রমোশন" (Promotion) পাইবে। সেই এক আশায় ক্রীতদাসীরা বাল্যকাল হইতে এই

গৃহে সুখের স্বপ্ন দেখিলেও অন্ধকূপের দৃশ্য তাহারা কখনই বিস্মৃত হয় নাই। ইতিহাসবেত্তা এলিসন বলেন যে, "সারকেসিয়ার কুমারীগণ শৈশব হইতেই প্রাচীন ধনীবৃন্দের অবরোধবাসিনী হইবার জন্য শিক্ষিতা হইত এবং ভাবী সুখের আশা তাহাদিগের পিত্রালয় পরিত্যাগের দুঃখ মন্দীভূত করিত"—তিনি আরো বলেন,—"পশ্চিম ইউরোপের সুন্দরী যুবতীগণের পক্ষে নাট্যশালা যেমন প্রীতিকর, বাদসাহ কিম্বা ধনীগণের অবরোধও (harem) নাকি অবরোধবাসিনীগণের নিকট সেইরূপ সুখ নিকেতন বলিয়া প্রতীত হইত।" বলিতে পারি না,—"পরচিত্ত অন্ধকার"—সত্যই ক্রীতদাসীগণ কল্পনাজাত সুখের আশায় প্রকৃত জীবনে কখনও সুখানুভব করিয়াছে কিনা। পূর্ব্বে এই দুর্গের প্রাঙ্গণে অতি রমণীয় পুষ্পোদ্যান ছিল। কাশ্মীর, ইস্পাহান, পারস্য প্রভৃতি দেশজাত ও বহু ব্যয়ে আনীত বিবিধ উপাদেয় স্বর্গীয় গোলাপ ও নানাবিধ মনোহর কুসুমে তাহা নন্দনকানন শোভায় বিরাজিত ছিল। যেমন অন্তঃপুরে অলৌকিক লাবণ্যময়ী মহিষীগণ, তেমনি এ উদ্যানে দুর্লভ ফুল্লকুসুমরাজি। যমুনা শীকরবাহী সমীরণ, তাহার প্রাণভরা মুক্ত সৌরভ অনিবার বহন করিয়া আগ্রার দ্বারে দ্বারে বিতরণ করিত। আজি সেই নন্দনকানন অন্ধকার, গুটিকত বিলাতী ফুলে—"ফিঁকে ভায়লেট গন্ধ নাহি তাহাতে"—তাহাকে পুষ্পোদ্যানে অবিহিত করিতেছে। শত শত কৃত্রিম উৎস, সুবাসিত বারিপূর্ণ প্রাণে, উথলিত হৃদয়ে যেখানে ক্রীড়া করিত, এখন সেখানে জলকণার চিহ্নমাত্র নাই। বিশুষ্কভাবে সকলি পূর্ব্ব সৌভাগ্যের সহিত বিলীন হইয়া গিয়াছে!

বেগমদিগের স্নান-হর্ম্ম্য অতীব রমণীয়। তাহার প্রাচীর রজতনিভ দর্পণখণ্ডে পরিশোভিত। স্নানের নিমিত্ত ইহার ভিতর একটী বৃহৎ কৃত্রিম সরিৎ এমন কৌশলের সহিত প্রস্তুত করা হইয়াছে যে, আপনা হইতে যমুনার সুশীতল পূত বারি তাহাতে অনায়াসে আইসে এবং একজন ব্যক্তি সুখে ভাসমান হইয়া সেই তরঙ্গবিহীন সরিৎসাগরে অবগাহন করিতে পারে। সেই হর্ম্ম্যস্থ সরিৎ লাবণ্য ছটায় আলোকিত করিয়া, নিদাঘ মধ্যাহ্নে অসূর্য্যম্পশ্যরূপা ভুবনজ্যোতি নুরজাহান কিম্বা রূপসী প্রধানা যোধবাই যখন আপন আপন সৌন্দর্য্যকিরণে ফুটিয়া উঠিতেন, তখন মেঘমালাশূন্য সরিৎ-হৃদয়ে "যেন জ্যোৎস্নার উপর বিদ্যুৎ জ্যোতি" শত শত হেমনলিনী বিনা প্রভাকরে প্রস্ফুটিত হইত। তাঁহারা রূপের সাগরে রমণীয় দেহলতা ভাসাইয়া পার্শ্ববর্ত্তী দর্পণে আপনার প্রতিবিম্বিত মাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া কতবার বিমুগ্ধ হইতেন, তাহা কে বলিবে?

"দেওয়ানী আম" (অর্থাৎ সাধারণের সহ দরবার স্থান) এবং "দেওয়ানী খাস" (কেবল আত্মীয়ের সহিত দরবার করিবার স্থান) ক্রমে দেখিয়া যখন আবার আমরা অন্যদিকের প্রাঙ্গণে আসিলাম তখন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেন্যান্ট গভর্ণর "কলভিন" সাহেবের যত্ন-প্রোথিত সমাধি আমাদিগের নয়ন-পথে পতিত হইল।[৫] সিপাই বিপ্লবে (১৮৫৭ সালে) ইঁহার মৃত্যু হয়। সমাধি প্রস্তরে জীবন মৃত্যু এবং গুণাবলী সুবর্ণ অক্ষরে খোদিত করিয়া ইংরাজ-রাজ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন।

ঢোলপুর মহারাজাকে পরাজয় করিয়া ইংরাজ কর্ত্তৃক আনীত তাঁহার কামানদ্বয়ও এই স্থানে রক্ষিত হইয়াছে, দেখিলাম। আমাদিগের জাতি ছুরিকা গৃহে রাখিতেও এখন স্বাধীন

নহেন, তখন এত বড় কামানের মর্য্যাদা তাঁহারা বুঝিতে অবশ্যই অপারক কি অনভিজ্ঞ ছিলেন না। শুনিলাম, ঐরূপ সুন্দর কামান আপাতত নাকি পাওয়া যায় না।

দুর্গের মধ্যবর্ত্তী সমুদায় দর্শনীয় মনোহারিতা পরিদর্শন করিয়া সেই সমুদায় দৃশ্য পরিত্যাগ করিবার সময় আমরা সোমনাথের মন্দিরের শ্বেতচন্দন বিনির্ম্মিত বৃহৎ ভগ্নদ্বার দেখিতে গেলাম। এই জীর্ণ স্মৃতি একটী ভগ্নপ্রায় মলিন গৃহে ধূলি ধূসরিতভাবে রহিয়াছে, কিন্তু তাহার সৌন্দর্য্য এখনও সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই। এই পবিত্র দ্বার সোমনাথের গৌরবের সাক্ষীরূপে জীর্ণতাযও অদ্যাপি আপনার মহিমা প্রকাশ করিতেছে এবং যবনরাজ কর্ত্তৃক সোমনাথের ধ্বংস ও অসংখ্য মণিমুক্তাদি আহরণের ইতিহাস স্মরণ করাইয়া দিতেছে। দিবাবসানের পূর্ব্বেই আমাদিগের অশ্বযান সেকেন্দ্রাভিমুখে প্রধাবিত হইল এবং অনতিবিলম্বে আমরা সেই সমাধিক্ষেত্রে গিয়া নামিলাম। সেকেন্দ্রা আগ্রা নগরীর বাহিরে, তবে অতি সামান্য দূর মাত্র। এখানে গাড়ী দেখিলেই মুসলমানগণ আপ্যায়িত করিতে দলে দলে আইসে, কিন্তু সেই আত্মীয়তার বিনিময়ে অযাচিত অনুগ্রহের প্রতিদানে পয়সা দিতে হয়। সেকেন্দ্রাতে আকবর বাদসাহের ও তাঁহার অন্যান্য পরিজনবর্গের সমাধি রহিয়াছে। সেই সকল সমাধির অবস্থা এখন অতীব শোচনীয়। কাহারো মন্দির ভগ্ন, কাহারও প্রস্তরখণ্ডের স্বর্ণাক্ষর বিলুপ্ত, কাহারও বা সমাধিশয্যা সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে শ্মশানের হাহাকার এবং জনশূন্যতার নিস্তব্ধ রোদন, কি দেখিব, কি শুনিব, বুঝিতে পারিলাম না, কেবল দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত শ্মশানের সেই ভগ্ন চিত্র স্মৃতিতে মিশাইয়া গেল।

বাদসাহদিগের সমাধির একটু দূরে আর একটী সমাধি-সৌধ দেখিলাম, কিন্তু তাহার ভিতরে আমরা যাই নাই। সেইখানের লোকের মুখে শুনিলাম যে, এই "শীশমহল" মহারাজ মানসিংহের ভগ্নীর স্মরণার্থ সংস্থাপিত এবং তাহার ভগ্নাবশেষ উক্ত মন্দির-হৃদয়ে যত্নে সমাধিতলে প্রোথিত করা হইয়াছে। এই জনশ্রুতি কতদূর সত্য, তাহা আমি বলিতে পারি না। কোন ইতিহাসে কিম্বা "হিন্দুর ভ্রমণ বৃত্তান্তে" এ-বিষয়ে কোন উল্লেখ আছে কি না, তাহাও এখন আমার স্মরণ হয় না। আগ্রা সম্বন্ধে দুই একটি নামের উচ্চারণ ও স্থানের বিষয় ভোলানাথ চন্দ্রের সহিত আমার মিল নাই।[৬] আমার ভুল, কি তাঁহার ভুল, সে মীমাংসা পাঠকগণ করিবেন। তবে আমার নিজের বোধ হয় যে, ভোলানাথ চন্দ্রেরই ঠিক। তাঁহার ও আমার অবস্থাগত বিভিন্নতায়, তিনি প্রবাসে যাইয়া যে সকল সুবিধা পাইয়াছেন, আমি গিয়া তাহা পাই নাই এবং তাহাতেই আমার সম্ভবতঃ প্রমাদ ঘটিতে পারে। সে যাহা হউক, "হিন্দুর ভ্রমণ বৃত্তান্তে" সময় সময় আমাকে স্থানাদির বিষয়ে সাহায্য করিয়াছে, সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ আছি।

আকবর বাদসাহের সমাধির পার্শ্বে তাঁহার ধাত্রী-পুত্রের সমাধি রহিয়াছে। ধনী মুসলমানগণ ধাত্রীর স্তন্যদুগ্ধে নাকি প্রতিপালিত হন। সেইজন্য তাঁহারা ধাত্রীকে মাতৃসম জ্ঞান করিয়া তাহার পুত্রকে সহোদরের ন্যায় স্নেহ ভক্তি করিয়া থাকেন। সম্রাট আকবর পরম ধার্ম্মিক ছিলেন, সুতরাং তাঁহার সকল কাজই প্রীতিকর এবং উল্লেখযোগ্য বলিয়া বোধ হয়।

আমরা এই সমাধির অট্টালিকার উপর হইতে ফতেপুর শিকড়ির দৃশ্য কতক কতক

দেখিলাম। কিন্তু চর্ম্মচক্ষে তত রূপ দেখা গেল না, "দূরবীক্ষণের চক্ষে" দেখিলে হয়ত আরও সুন্দরতর দেখাইত। দুর্ভ্যগ্যক্রমে আমার নিকট দূরবীক্ষণ ছিল না। সুতরাং "যন্ত্রহীন বিধাতা-নির্ম্মিত চারু মানব-নয়নে" যাহা দেখা সম্ভব, তাহাই দেখিয়া পরিতৃপ্ত মনে, সায়াহ্ন সমীরণ সেবন করিতে করিতে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দিবা-ক্লান্তি দূর করিলাম।

মথুরা

২৬এ ফেঃ প্রত্যুষেই আমরা সুন্দর আগ্রাপুরী পরিত্যাগ করিয়া মথুরাভিমুখে যাত্রা করি। আগ্রার গাড়ী ত্যাগ করিয়া আমরা যখন হাট্রাসে মথুরার ট্রেনে চড়িলাম, তখন ঊষার সুখময়ী মুর্ত্তি, তরুণ তপনের মধুর হাস্য পূর্ব্ব গগন অনুরঞ্জিত করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে আশার তরঙ্গ তুলিযা দিল। সেই শোভা আবার প্রভাতিক বিহঙ্গের কলকণ্ঠ স্বরে আরো দ্বিগুণতর ঘনীভূত হইয়া যেন অভিনব প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে দীপ্তি পাইতে লাগিল। এমন শান্তিময় সুখ-প্রভাত দর্শন মনুষ্যের ভাগ্যে অতীব দুর্ল্লভ। মথুরা যাইবার পথে বিস্তৃত শ্যামল ক্ষেত্রে মৃগ- শিশুগণ কোথায় বা নির্ভয়ে শুইয়া আছে, আবার কোথায় তাহারা চকিতে চাহিয়া, শব্দমাত্র শ্রবণে অদৃশ্য হইয়া যায়। এই আছে এই নাই, কেমন মনোমোহন দৃশ্য! ইহা দেখিয়া অতীত কালের পবিত্র তপোবনের চিত্র মানসক্ষেত্রে সমুদিত হয়। জীবনের এ সুখস্বপ্ন, বাস্তবিক স্বপ্ন নহে। যিনি এ দৃশ্য, এমন প্রভাত কখন নয়ন ভরিয়া দেখেন নাই, তাঁহাকে আর কি বলিব? আমি জীবনের অনেক প্রকৃত সুখস্বপ্নের স্মৃতির মধ্যে এ স্মৃতিও হৃদয়ে সযত্নে রক্ষা করিব।

হাট্রাসে মথুরা যাইবার জন্য যে গাড়ীতে আরোহণ করিলাম, তাহাকে বাষ্পীয় শকট না বলিয়া গজেন্দ্রগামী বণিকপোত বলিলে ঠিক হয়। এই ট্রেণ কখন চলিবে, কখন থামিবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। গাড়ী যখন চলিতে আরম্ভ করিল, তখন পথিকগণ ইচ্ছানুসারে তাহাতে উঠিতে লাগিল। কাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে না, করিলেও কথা গ্রাহ্য করিতে কেহ স্বীকৃত হয় না। কোন নিয়মও নাই, যাহার যা ইচ্ছা সে তাই করে। ধূমপানের ধূমের ত সীমা নাই। তামাক খাইবার জন্য প্রায়ই গাড়ী থামান হইতে লাগিল। আরোহীগণ ইহাকে যেন স্বকীয় বাসভবন মনে করিয়া সেইরূপ ব্যবহার করিয়া নামাউঠা জলযোগ ইত্যাদি করিতে করিতে চলিল। গরিব আমরা কেবল অধৈর্য্য হইয়া পড়িলাম। ইহার পরিচালকগণ হিন্দুস্থানী। এ গাড়ীর সহিত ইংরাজ কি ফিরিঙ্গীর সহিত কিছুমাত্র সংশ্রব নাই, সুতরাং দৌরাত্ম্য কি অপমান কাহাকেও সহ্য করিতে হইল না, তবে সেই মৃদু-মন্দবাহী গজেন্দ্রগমন আমাদের খুব প্রীতিকর বোধ হয় নাই।

আমাদিগের গাড়ীর পার্শ্বস্থ কক্ষে কতকগুলি ইংরাজীনবিশ হিন্দুস্থানী উঠিয়াছিলেন, তাহাদিগের হাব, ভাব, কথাবার্ত্তা সমুদায়ই অদ্ভুত। এমন জন্তু বিশেষ মনুষ্য দর্শন আমার কপালে পূর্ব্বে বড় ঘটে নাই। আমি তাহাদিগকে কি বলিয়া ডাকিব, ঠিক করিতে পারি না।

মনুষ্য যে এইরূপ ঘৃণার পাত্র হইতে পারে, ইহা দেখিয়া আমার মনে অনুকম্পারও উদয় হইল না। অন্য যাত্রীগণও প্রকাশ্য ভাষায় ঘৃণা প্রকাশ করিয়া কলহের চেষ্টায় ছিল। তাহারা একটু ইংরাজী জানে, বোধ হইল বাঙ্গালাও আধ আধভাবে একটু আধটু কহিতে পারে। কিন্তু "Little learning is a dangerous thing" এই প্রসিদ্ধ বাক্য তাহারা সপ্রমাণ করিয়া আরোহীদিগকে জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছিল। আরোহীগণের সৌভাগ্যবশতঃ গাড়ী খানিক পথ যাইতে না যাইতেই একজন বৃদ্ধ পরিব্রাজক পথিমধ্যে এই গাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। তাঁহার পবিত্র সৌম্যমূর্ত্তি ও স্থির দৃষ্টিতে কেমন যেন অপার্থিব ভাব। সে স্নেহময়, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখচ্ছবি দর্শন করিয়া প্রত্যেকেই ভক্তিভাবে তাঁহাকে অযাচিত অভিবাদন করিল। তিনিও হাস্যমুখে সংস্কৃত ভাষায় সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সেই বন্যব্যক্তিরা প্রথমে একটু পরিহাসের চেষ্টায় ছিল। কিন্তু তাহাদিগের সে চেষ্টা সুবিধামত হইল না। জীবন্ত পবিত্রতা পাপীর হৃদয়েও পুণ্যের শান্তিবারি ঢালিয়া দেয়। সে হাস্যের হিঃ হিঃ বিকটশব্দ, বাক্যের চাতুরী, এবং পাণ্ডিত্য-প্রকাশক গর্ব্বিত ভাষা কোথায় যেন উড়িয়া গেল, অবিলম্বে সমস্ত নিস্তব্ধ শান্তিপ্রদ ভাব ধারণ করিল।

সচরাচর আমরা পথেঘাটে যে সকল সন্ন্যাসী দেখিতে পাই, আমি যাঁহার কথা বলিতেছি, তিনি সে রূপ সন্ন্যাসী নহেন। হিন্দুশাস্ত্রে যাহাকে প্রকৃত সন্ন্যাস বলে, তিনি তাহাই গ্রহণ করিয়া পরমার্থ চিন্তায় নির্ব্বাণ ধর্ম্মে এবং জ্ঞান বিতরণে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। "সদন্নে বা কিদন্নে" তাঁহার সমান প্রীতি, "লোষ্ট্র" ও "কাঞ্চন," তাঁহার নিকট একরূপ। শীতপ্রধান দেশে শরীর রক্ষার্থে ও লজ্জা নিবারণ করিতে পরমহংসের পক্ষে যে প্রকার গৈরিক বসন সাজে, তাঁহারও তাই ছিল। একখানি কম্বল এবং তালপত্রের একটা ছত্র তাঁহার জীবনের প্রয়োজনীয় স্বরূপ সঙ্গে আছে, দেখিলাম। তিনি দ্বারকা হইতে মথুরার জনৈক সন্ন্যাসীর মঠে শাস্ত্রীয় বিচারের মীমাংসার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া শিষ্যসহ যাইতেছেন, শুনিলাম।

সোঁ, সা, করিতে করিতে কোন প্রকারে চলিয়া থামিয়া, অতি কষ্টে আমাদিগের গাড়ী বেলা ১০ ঘটিকার সময় মথুরা আসিয়া পৌঁছিল, আমরাও সুপ্রসন্ন মনে নামিয়া নিস্তার পাইলাম।

রৌদ্র তখনি চারিদিকে চনচন করিতেছে, আমরাও সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং পরিশ্রান্ত। অশ্বযান সহরে প্রবেশ করিল, আমরা বাসা খুঁজিয়া লইবার জন্য এদিক ওদিক একটু করিতে লাগিলাম, বেশিক্ষণ কষ্ট পাইতে হইল না, মুহূর্ত্তমধ্যে বহুসংখ্যক পাণ্ডা আসিয়া আমাদিগের গাড়ী ঘেরিয়া ধরিল এবং আমাদের পুর্ব্বপুরুষ পুর্ব্বে কেহ কখন মথুরা গিয়াছিলেন কিনা, তাহাই জনে জনে খাতা খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। অতগুলি লোকের খাতায় নামাবলী শ্রবণ করিবার ধৈর্য্যবল ও সৌভাগ্য না থাকায়, তাহারা আমাদিগকে ক্রমে মুক্তি দিয়া চলিয়া গেল। কেবল তিনজন মাত্র পাণ্ডা আমাদের গাড়ীর বাহিরে চড়িয়া একটী অতি সুন্দর প্রস্তরের বাড়ীর সম্মুখে আনিয়া সেই বাটিতে বাসা স্থির করিয়া দিল। আমরা যমুনার নিকটে একটী বৃহৎ প্রশস্ত দ্বিতল বাটীর একদিক ভাড়া লইলাম; তার অন্যদিকে মথুরার মুনসেফ বাবু সপরিবারে ছিলেন। পাণ্ডাঠাকুরেরা আমাদিগের জন্য বিশুদ্ধ দুগ্ধ ঘৃত মিষ্টান্ন প্রভৃতি হিন্দুর আহারীয়

সামগ্রী আনিয়া দিয়া, মাছ মাংস আনিতে নিষেধ করিয়া, তখনকার জন্য বিদায় হইলেন। তাঁহাদিগের মুখে গল্প শুনিলাম, কলিকাতা হইতে কয়েকজন ব্রাহ্ম নাকি মথুরায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন ও আমরা যে বাসায় ছিলাম, তাঁহারাও সেইখানে ছিলেন। কিন্তু গৃহস্বামীর অমতে স্বাধীনতা প্রকাশার্থে গোপনে অনেক মাছ মাংস ও পলাণ্ডু খাইয়াছিলেন। সেই সকল গৃহকোণে লুকাইয়া রাখাতে ধরা পড়িয়া শেষে অপমানিত হইয়া বাসা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আরো অনেক শোচনীয় দুঃখের কথা আমাদিগের কাণে আসিল। কিন্তু তাহা বিশ্বাস না করিলেও তাঁহাদিগের ব্যবহারের জন্য আমাদিগের একটু কষ্ট পাইতে হয়। আমরা যেন, রুষভীত ইংরাজ-রাজ্যে ছদ্মবেশী গুপ্তচরবৎ সন্দেহের ছায়ায় "নজরবন্দী" পাহারায় রহিলাম।

মথুরার পাণ্ডাগণের আত্ম-পরিচয়ের রহস্য সহসা ভেদ করা কঠিন। তাহারা যাত্রীগণের নিকট আসিয়া বলে "আমরা সাড়ে চারিভাই" কেহ বা "আড়াই" "দেড় ভাই"। ইহা না বুঝাইয়া দিলে বুঝিতে পারা যায় না। অন্ততঃ, আমরা ত "সাধু সাধু সাড়ে পাঁচ ভাই" বুঝিতে পারি নাই। কাজেই ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে হয়। অবিবাহিত ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না, সুতরাং যে ভাইরা বিবাহিত, তাহারা পূর্ণ ও তাহাদিগের মধ্যে যাহার বিবাহ হয় নাই, সে অৰ্দ্ধেক। আমাদিগের ভাগ্যে "সাড়ে পাঁচ ভাই" জুটিয়াছিল। এই অৰ্দ্ধাঙ্গীটী বড় সুশীল, মিষ্টভাষী ও প্রিয়দর্শন। তাহাকে ধনীর গৃহের যত্ন-পালিত বালক বলিয়া বোধ হয়। সংসারের কোন চিন্তা নাই, লেখাপড়ারও ধার ধারে না, "লাড্ডু পুরী" মিষ্টান্ন পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করিয়া স্বচ্ছন্দে বেড়াইয়া বেড়ায়। তবে বাঙ্গালী বালকের সহিত ইহার শারীরিক বিভিন্নতা অনেক, তাহাদের মত, ইহারা রুগ্ন দুর্ব্বল ও ম্যালেরীয়া প্রপীড়িত নহে। ইহারা প্রত্যহ নিয়মমত দুইবেলা ব্যায়াম শিক্ষা করিয়া থাকে। কুস্তীর "আড্ডা" আছে, সেখানে অধিক কাল অতিবাহিত করে এবং কুস্তীতে সুশিক্ষিত হইলে কখন কখন গোয়ালিয়ার হোলকার প্রভৃতি মহারাজ সদনে আত্মবলের পরিচয় দিয়া সম্মানের সহিত পুরস্কার লইয়া আইসে।

মথুরা দেখিতে বড় পরিপাটি। পথঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও কোনস্থানে ময়লা নাই। কংসরাজ-রাজধানী মথুরা, ঠিক রাজধানীরই মত সুন্দর। মথুরায় কেমন একটি শান্তিময় শোভা ও নির্জ্জনতা দেখিলাম, ইহা আমার মনের সঙ্গে ঐক্যতানে নীরবে মিলিয়া গিয়াছিল। আমি মথুরা গিয়া কেমন যেন এক স্মৃতি-স্বপ্নে ডুবিয়া গিয়াছিলাম, কেবল মুক্ত গবাক্ষে দাঁড়াইয়া চারিদিকের শোভা প্রাণ ভরিয়া দেখিতাম, এবং যমুনার কলকলনাদে আমার স্মৃতিমগ্ন হৃদয় ঘুমাইয়া যাইত। কল্পনায়, স্মৃতিতে, ও আশার চিন্তাতে দিন কাটাইতাম, প্রবাসের শূন্যতা তত অনুভব করি নাই। মথুরাবাসী স্ত্রী পুরুষগণ প্রায়ই গৌরাঙ্গ ও সুস্থ। তাহাদিগের শিশুসন্তানগুলি এমন সুশ্রী এবং সবল যে, দেখিলেই সাদরে কোলে তুলিয়া লইতে ইচ্ছা করে। পাণ্ডাদিগের সুন্দর সুন্দর বালকগণ পরিষ্কার পরিচ্ছদে দেবালয়ের পথে পথে দাঁড়াইয়া, আধ আধ ভাঙ্গা বাঙ্গলা ভাষায় "দাদা দিদি" বলিয়া ডাকিয়া যখন সামান্য পয়সা ভিক্ষা চাহে, তাহাতে কেমন মায়া হয় ও কিছু না দিয়া থাকা যায় না। একটী স্বর্ণমুদ্রায় লোকের যত আহ্লাদ না হয়, একটা

পয়সামাত্র পাইলে ইহারা ততোধিক আনন্দিত হইয়া থাকে। "ব্রজবাসী" মধুর কণ্ঠে গাইয়া এবং যাত্রীগণের সম্মুখে করতালি দিয়া যে নৃত্য করে তাহা দেখিতে আমোদ আছে।

ধনবান ব্যক্তি পুত্রহীন হইলে, সকল দেশেই পোষ্যপুত্র রাখিবার নিয়ম আছে, কিন্তু বাঙ্গালীগণ যেরূপ দুর্ব্বল ও ক্ষীণজীবী, তাহাদিগের সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য সংস্কার করা আবশ্যক। এই সকল ব্রাহ্মণ বালকগণকে নিঃসন্তান ধনী বাঙ্গালীরা পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া সুশিক্ষিত করিলে, ও প্রাপ্তবয়সে বাঙ্গালী বালিকাদিগের সঙ্গে বিবাহ দিলে সময়ে বেশ বলবান ও স্বাস্থ্যপূর্ণ সন্তান জন্মিতে পারে, এবং তাহাতে খুব উপকার হইবার সম্ভাবনা। সমাজ-সংস্কারকগণ এই বিষয়ে চেষ্টা করিলেও সমাজের পক্ষে একটী স্থায়ী উপকার করিতে পারেন। বাল্যবিবাহ উঠাইলে, ও বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিলে যেমন সামাজিক মঙ্গল, তেমনি বঙ্গবাসীর স্বাস্থ্য সংস্কার এইরূপে করিতে পারিলেও উপকার আছে। আমাদিগের সমাজে অদ্যাপি রাঢ়ী বারেন্দ্রর মধ্যে পর্য্যন্ত বিবাহপ্রথা প্রচলিত না থাকাতে কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিদিগের যে কত কষ্ট সহিতে হয়, তাহা কাহারো অবিদিত নাই। তাহাতে আবার পাশকরা ছেলের উৎপাতে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। আমাদিগের দেশহিতৈষীগণ এই সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি কেন মনোযোগ দেন না, তাহা দুঃখের সহিত বুঝিতে পারি না। কেবলমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলনে সামাজিক অশেষ দুর্গতি যাইবে না, আর সমাজ-সংস্কারক মহাশয়েরাও অসবর্ণ বিবাহ-প্রথা প্রচলিত করিবার জন্য এত চিন্তা ও যত্ন না করিয়া অগ্রে সবর্ণে সবর্ণে ঐ প্রকার বিবাহ দিবার চেষ্টা ও আন্দোলন করিলে সামাজিক কল্যাণ সাধন করা হয়।

মথুরায় অনেক বাঙ্গালী কার্য্যোপলক্ষে বাস করেন ও তাঁহাদের সহবাসে পাণ্ডাগণ বেশ "চলন সই" একরকম বাঙ্গালা কথা কহিতে শিখিয়াছে। তাহাদিগের সে আধভাঙ্গা বাঙ্গালা আমার নিকট ভাল লাগিত। আহারাদি করিয়া আমরা সেইদিন বৈকালেই মথুরার বিগ্রহগণ দর্শন করিতে বাহির হইলাম। মথুরায় বেশ গাড়ী পাওয়া যায়, তবে তাহার ভাড়া কিছু অধিক। বাসা ছাড়িয়া প্রথমে আমরা "কংস-খেড়া" ও "রণভূম্" দেখিতে গেলাম। এক পাণ্ডা আমাদিগের সহিত থাকিয়া "গাইডের" কাজ করিতে লাগিল। প্রবাদ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন হইতে যখন মথুরাতে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করা হয়, কিন্তু বিষ্ণু অবতার কৃষ্ণ, সকল বিপদ অতিক্রম করিয়া সম্মুখ-যুদ্ধে কংসরাজকে বিনাশ করিলেন এবং পরিশেষে স্বয়ং মথুরাব রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সেই সমরাঙ্গণের নাম "রণভূম্"। অতি ছোট একটু জমী, চারিদিকে ছোট ছোট গাছ, চারিজন লোক একত্র হইলে তাহা পূর্ণ হইয়া যায়। কোনকালে সেখানে যুদ্ধ হইয়াছিল যে, তাহা কেহ না বলিয়া দিলে কল্পনাতেও অনুমান করা যাইতে পারে না। "গলিভার ভ্রমণে" "লীলিপুটীয়ানদিগের" যেরূপ অদ্ভুত যুদ্ধ-কাহিনী আছে, এও বোধ হয় সেইরূপ যুদ্ধ এবং রণভূমি। আবার এই যুদ্ধক্ষেত্রে এক ভগ্ন-মন্দিরে চোখমুখ বিশিষ্ট এক মহাদেব মূর্ত্তি আছেন। অত্যাচারী কংসরাজা সমরে নিধনপ্রাপ্ত হইলেন দেখিয়া রণক্ষেত্রের মধ্য হইতে সহসা এক শিব আহ্লাদে নৃত্য করিতে করিতে উঠিয়াছিলেন ও তাহাতেই তাঁহার নাম—"রঙ্গেশ্বর মহাদেও" শুনিলাম।

কংসরাজ রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ ও গড়খাই দেখিলে,অদ্যাপি রাজকীয় সম্পদের চিহ্ন রহিয়াছে, দর্শকের মনে হয়। এই ভগ্নরাশির মধ্যে একটী ক্ষুদ্র মন্দির সজীবভাবে দণ্ডায়মান আছে, তাহা অতীতের হিন্দু মহিলার পবিত্রতার নিদর্শন। প্রবাদ এই যে, এই "সতীমঠে" কংসের মহিষী বাস করিতেন এবং তিনি এই মন্দিরেই পতির মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করেন ও স্বামীর চিতায় একত্র ভস্মীভূত হন। সেইজন্য তাঁহার সতীত্বের পবিত্র চিহ্নস্বরূপ এই মঠ "সতীমঠ" নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে ও ধনকুবের জগৎশেঠেরা তাহা পুনর্ব্বার সংস্কার করাইয়া যান। তাহাতেই আজিও "সতীমঠ" নূতন অবস্থায় রহিয়াছে যেন বোধ হয়। এই গল্প আমরা পাণ্ডাঠাকুরদিগের মুখে শুনিয়াছি. ও তাহা সত্য কিনা, সে বিষয় অনুসন্ধান করিবার কোন চেষ্টা করার প্রয়োজন বোধ হয় নাই। ভাল গল্প, ভাল লাগিল সুতরাং লিখিলাম। ভারতীয় রত্নভাণ্ডারে কত কীর্ত্তিময়ী মহিলার ঐরূপ পবিত্র জীবনকাহিনী লুক্কায়িত আছে, তাহার খোঁজ কে করিবে? ইতিহাসহীন ভারতের পূর্ব্ব গৌরব এখন হয়ত বিদেশীর নিকট মূল্য-শূন্য উপকথা, কিন্তু আমাদের কাছে তাহা নহে।

প্রভাত সায়াহ্নে "মথুরাবাসিনী মধুর-হাসিনী শ্যামবিলাসিনী"রা নানা বর্ণের বিচিত্র বসন পরিয়া পুষ্পমালা হস্তে দেবদর্শনে যায়। তাহাদিগের অবগুণ্ঠনাবৃত সৌন্দর্য্যরাশি মুগ্ধভাবে দর্শন করা যদিও প্রবাসীর ভাগ্যে সকল সময় ঘটিয়া উঠে না, তবুও যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে তাহারা যে সুন্দরী, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ জন্মে নাই। সাধারণতঃ তাহারা গৌরাঙ্গিনী এবং তাহাদিগের মুখশ্রী বেশ জ্যোতির্ম্ময়। তবে পশ্চিমাঞ্চলের মহিলাগণ প্রায়ই সুকেশিনী নহে। বঙ্গনারীর সুদীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ তাহাদিগের নিকট উপাদেয় এবং হিংসনীয় সামগ্রী। পাণ্ডাগণের প্রমুখাৎ শুনিলাম যে "মথুরাবাসিনীরা" নাকি গৃহকার্য্য করে না, এবং নব্য বঙ্গরমণীর ন্যায় "ধারাপাতে মূর্ত্তিমান, চারুপাঠ পড়া" শিখিয়া অসার আমোদে ও তাসক্রীড়ায় এবং আলস্যে জীবন কাটায়। বঙ্গের নব্যগণ কোনরূপ ধর্ম্মকর্ম্মও করে না, কিন্তু ইহারা দুই বেলা "মথুরানাথ" দর্শন না করিয়া জলগ্রহণ করে না, এই প্রভেদ।

আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই মথুরার চারিদিকে দেখিয়া আরতির একটু আগে "মথুরানাথ" দর্শনার্থে তাঁহার মন্দিরে গেলাম। কিন্তু তখনি সেই প্রকাণ্ড দেবালয় জনকোলাহলে এবং মনুষ্যমস্তকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, একটু দাঁড়াইবার স্থান পর্য্যন্ত নাই। লোক ঠেলিয়া সেই গোলে মিশিয়া বিগ্রহ দর্শন করা তৎকালে ঘটিল না। কোনরূপে পাণ্ডাঠাকুরদিগের সাহায্যে সংকীর্ত্তন প্রাঙ্গণে আমরা নিরাপদে একটু আশ্রয় পাইলাম।

দেখিতে দেখিতে দীপালোকে সমুদায় দিবাবৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। গায়কগণ মধুর হরিনাম সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই অবিশ্রান্ত কোলাহল থামিয়া সকল নিস্তব্ধ হইয়া গেল। সেই অসংখ্য প্রাণীবৃন্দ একেবারে নীরবে ভক্তিভাবে হরিপ্রেমে নিমগ্ন হইয়া স্তব করিতে লাগিল। আর কোন শব্দ নাই, প্রতিধ্বনিও সেই সান্ধ্যসঙ্গীতে মিশিয়া কোথায় গেল, তাহা কে বলিবে। সহসা এই নিস্তব্ধতা ভেদ করিতে বায়ু পর্য্যন্ত সাহসী নহে, সেও আর সেদিকে বহিতে না পারিয়া, হরিগুণে মজিয়া মথুরার দ্বারে দ্বারে পবিত্র গান গাইয়া

যেন বেড়াইতে লাগিল। এই অপরূপ দৃশ্যে, এই প্রাণপূর্ণ ভক্তিভাবে ও অলৌকিক সংকীর্ত্তন শ্রবণে আমরা স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। এমন ভক্তিভাব, এমন মোহময় আত্মবিস্মৃতি!—প্রতিদিন মথুরানাথের মন্দিরে আসিয়া যাঁহারা ইহা দেখিয়া যান, তাঁহাদের নিকট ইহা কল্পনায় অনুভব করিবার সামগ্রী নহে। এইরূপ পবিত্র মনোহর কীর্ত্তন আমি ত কখনও শুনি নাই। বৈষ্ণবদিগের তখনকার সেই আনন্দময় ভক্তিপূর্ণ উৎসাহ দেখিলে মনে শান্তির উদয় হয়। জগতে চৈতন্যের পবিত্র ধর্ম্ম, পতিতের আশ্রয় ও পাপীর মুক্তি। সময় ও অবস্থার পীড়নে তাহার সে পবিত্রতা নাই। তথাপি এই আরতির সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিলে ক্ষণকালের জন্যও পতিতজনের হৃদয়ে পরকালের কথা উদিত হয় এবং হরিনামের মোহে ইহ সংসার ভাসিয়া যায়। এমন ঈশ্বরগান শুনিলে, আমার বোধ হয়, অধম মনুষ্যজীবন তরিয়া যায়। মৃত্যুর পূর্ব্বে সজ্ঞানে জাহ্নবী সৈকতে শুইয়া যিনি ভক্তিভাবে এইরূপ হরিসংকীর্ত্তন শুনিয়া মরিতে পারেন, তাঁর আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

আমরা এখান হইতে আবার "বিশ্রামঘাটের" আরতি দেখিতে গিয়া আর এক ঐন্দ্রজালিক দৃশ্যে ডুবিয়া গেলাম। এই "বিশ্রামঘাটে" শ্রীকৃষ্ণ স্নান করিয়া "বংশী" ও "মোহনচূড়া" রাখিয়া যান এবং সেইজন্য ইহাকে "বিশ্রামঘাট" বলে। এইখানে শত সহস্র ব্যক্তি যুক্তকরে মুদ্রিত নয়নে দাঁড়াইয়া "জয় জয়" শব্দে নিশীথ নীলাম্বর প্রতিধ্বনিত করিতেছে। রাশি রাশি সুরভিময় কুসুমহার চারিদিক হইতে জলধারায় ন্যায় বর্ষিত হইতেছে, শাঁক ঘন্টা এবং বাঁশির রবে যমুনার হৃদয়েও যেন কম্পিত তরঙ্গ উঠিয়াছে। আর কিছু দেখা যায় না, কেবল লোকারণ্য, তাহার মধ্যে শান্তিরক্ষকের গভীর মুখ। প্রতি সন্ধ্যায় তাহারা নিয়মিত "বিশ্রামঘাটে" আসিয়া থাকে, নতুবা গোল থামাইয়া যাত্রীগণের ও দর্শকের জীবন রক্ষা সুকঠিন ব্যাপার।

"বিশ্রামঘাটের" আরতিতে একটু নূতনত্ব আছে। একজন অতি বলবান্ ব্রাহ্মণ উজ্জ্বলিত সহস্র দীপাধার প্রথমে হস্তে লইয়া, তারপর বক্ষে তুলিয়া, এবং পরিশেষে মস্তকে করিয়া আরতি করেন। তাঁহার কৌশলময় আরতি সকলেই মুগ্ধবৎ নেত্রে দেখিয়া ধন্য ধন্য করে। সেই ব্যক্তি এতই লম্বা যে, তাঁর মস্তক এত লোকের মাঝেও প্রত্যক্ষরূপে দেখা যায়।

"বিশ্রামঘাটে" আরতির সময় পুষ্প বিক্রেতা রমণীরা ফুলমালা ও দীপ লইয়া সারি সারি বসিয়া থাকে। তাহারা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তবে তাহাদিগের মধ্যে রূপে কেহ বঙ্কিমবাবুর "রজনী" কিম্বা লর্ড লিটনের "নিতিয়া"র মত না থাকিলেও তাহারা যে প্রায় সকলেই দেখিতে ভাল তাহা আমি বলিব।[৭] কেমন পবিত্রমাখা কোমল মুখে তাম্বুলরাগ-রঞ্জিত শোভাময় দীপালোকে বসিয়া সলজ্জভাবে যাত্রীগণকে ডাকিয়া মায়াফুল লইতে বলে। সে স্বরে মায়া আছে, ব্যবসার চাতুরী নাই। সে কণ্ঠ কোমলতায় পরিপূর্ণ, বিক্রেতার কপটতা তাহারা যেন জানে না। ফুলমালা স্ত্রী-পুরুষে সকলেই ক্রয় করে, কিন্তু প্রদীপ কেবল স্ত্রীলোকেরাই কিনিয়া প্রিয়জনের মঙ্গল কামনায় যমুনার বক্ষে ভাসাইয়া দেয়। যাহার শুভ উদ্দেশ্যে তাহা ভাসান হয়, দীপ ডুবিয়া গেলে তাহার সমূহ অমঙ্গল। আর তাহা ভাসিতে ভাসিতে দূরে গিয়া অদৃশ্য হইলে কোন অশুভ নাই। আমি কোন দীপ নিমগ্ন হইতে দেখি নাই। নীল যমুনার বক্ষে সেই

অসংখ্য দীপমালা যখন ভাসিয়া যায় এবং মৃদুল বায়ুভরে একটু নিবু নিবু হইয়া আবার তখনি জ্বলিয়া উঠে, সে শোভা অপূর্ব্ব ও অপার্থিব। তাহা একবার মাত্র দেখিলে মনুষ্য ইহজীবনে কখন আর ভুলিতে পারিবে না। আমি যখন অতি ছোট ছিলাম, সেই সময় একখানি সংবাদপত্রে একজন ইংরাজ ভ্রমণকারীর একখানি পত্র (বাঙ্গালা অনুবাদ) পড়িয়াছিলাম, তাহাতে যমুনার ঘাটের এই দীপ ভাসাইবার বর্ণনা ছিল এবং তাহা এমন সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছিল যে, আজ কত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, তবু আমার সেই শৈশবের স্মৃতি অদ্যাপি সজীবিত রহিয়াছে। আমি নিজে তাহা স্বচক্ষে না দেখিলেও লিখিবার সময় কল্পনার সাহায্যে সে দৃশ্য এইরূপই অনুভব করিতে পারিতাম, বোধ হয়।

এদিকে আরতির শোভা, আবার অন্যদিকে যমুনার বক্ষে অযুত দীপালোকের উজ্জ্বলতা ও তটভূমে মনুষ্য হস্তে এই সকলের শোভা; এই সকল দৃশ্য একত্র অবলোকন করিয়া আমার হৃদয় আনন্দ-উচ্ছ্বাসে এবং আশা-নৈরাশ্যে কেমন যে হইয়া গেল, তাহা বলিতে পারি না। যমুনাতীর ছাড়িয়া রাত্রে বাসায় আসিলাম, কিন্তু তখন সকলই আঁধার হইয়া গেল, এখন আর কিছু স্মরণ নাই। মনুষ্যের প্রাণের উপর দিয়া যুগ যুগান্তর বহিয়া যায়, তথাপি স্মৃতি জাগরিত রহিয়া অতীতের সমুদায় স্বপ্নবৎ স্মরণ করাইয়া কখন কখন যেন সান্ত্বনা করে। আমার জীবনের অন্য অনেক প্রিয় স্মৃতির মধ্যে এই ভ্রমণের স্মৃতি আর একটী প্রিয় সামগ্রী।

বৃন্দাবন পথে

দ্বিতীয় নিশা প্রভাতে মথুরাপুরী পরিহার মানসে আমরা সমস্ত দিন বাসায় বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্নে বৃন্দাবন দর্শনার্থে অশ্বযানে বাহির হইলাম। বৃন্দাবনের এই পথের চারিধার ঘন কৃষ্ণ ছায়াময় সুদীর্ঘ বৃক্ষাবলী পরিশোভিত কাননরাজি নব দূর্ব্বাদলে এক অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করিয়া রহিয়াছে। মধুর নিস্তব্ধতা, এই পথ দিয়া ধীরে ধীরে আমাদিগকে যেন আর এক অভিনব প্রকৃতিরাজ্যে লইয়া চলিল। প্রকৃতি সুন্দরী প্রাণ খুলিয়া পবিত্র নবীভূত সৌন্দর্য্যরাশি অকাতরে পথিকের জন্য এদিক সেদিক ছড়াইয়া রাখিয়াছে, তাহার এ জগতে রোগ শোক জ্বালা যন্ত্রণা নাই। সকলি শোভা, সকলি মাধুরী। ভাবুকজন এখানে আসিলে নয়ন ভরিয়া কল্পনার শোভা বাস্তবিক রাজ্যে দেখিতে পান। আর শোকাভিভূত মনুষ্য-হৃদয় ইহাতে জুড়াইয়া যায়। আর্য্যগণই যথার্থ কবি, তাঁহারা জীবন্ত কবিতা অধ্যয়ন করিতে এই সকল পুণ্য তীর্থ পরিদর্শন প্রথা প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন।

"অহিংসা পরমধর্ম্ম" এই মহদ্বাক্যের সার্থকতা এই সব স্থানেই হইয়াছে। মনুষ্যের সহিত ময়ূর ময়ূরী এবং মৃগশিশুগণ একত্র পথে পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। তাহা দেখিলে পুণ্যময় অতীতকালের তপোবন স্মৃতি আমাদিগের মানস পটে আবার জাগরূক হয়। ঋষিকুমার কুমারী যে হরিণ-শিশুর সহিত ক্রীড়া করিতেন, তাহা আর্য্য কবির কল্পনা নহে, প্রকৃত চিত্র।

আমরা সন্ধ্যাসমাগমে চিরবসন্তময় রাজ্য বৃন্দাবনে আসিয়া নামিলাম। একজন বৃদ্ধ বৈষ্ণব আমাদিগকে তাহার বাটীতে বাসা দিয়া অন্যত্র উঠিয়া গেল। বৃন্দাবনের বাড়ী "কুঞ্জ" নামে অভিহিত। যাত্রী দেখিলে বৈষ্ণবগণ আপন আপন "কুঞ্জে" বাসা দিতে যত্ন করে, তবে আমাদিগকে প্রকৃত তীর্থযাত্রী বোধ না হওয়াতে তাহারা বড় সাধিয়া বাসা দিতে অগ্রসর হইল না। এখানেও পাণ্ডাঠাকুর মূর্ত্তিমান্, তাঁহারাই সকল সুবিধা করিয়া দিলেন।

বৃন্দাবন

মথুরা হইতে বৃন্দাবন কয়েক ক্রোশ পথমাত্র ব্যবধান এবং চতুর্দ্দিকে নীল শোভাময়ী যমুনা, মধ্যে স্বর্ণ কাননবৎ বৃন্দাবন দ্বীপসম বিরাজিত, ইহাকে "আলোদ্বীপ আঁধার সাগরে" বলা যায়। এ পুণ্যদ্বীপের মাধুরী জীবলোক মুগ্ধ-কর ও পত্রপুষ্প বিশিষ্ট। নব-পল্লবিত শ্যামল তরুকুলের চির প্রফুল্ল সৌন্দর্য্যরাশি এ দ্বীপ-অঙ্গে নিরীক্ষণ করিলে ইন্দ্রালয়ের নন্দন কানন কল্পনা-নেত্রে যেন ফুটিয়া উঠে।

শান্তিময়ী যমুনার ঘাটশ্রেণী পৃথক্ পৃথক্ নাম ধারণ করিয়াছে। এই সকল ঘাটে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিতেন, সেই নিমিত্ত ইহার স্মৃতি ভক্ত বৈষ্ণববৃন্দের নিকট অতীব আদরণীয়। তাঁহারা যে ভাবে এ সকল ঘাট দর্শন করেন, আমরা সেভাবে তাহা না দেখিয়াও প্রচুর আনন্দ পাইয়াছি।

মাননীয় বঙ্কিমবাবুর শ্রীকৃষ্ণ নহেন, গোস্বামী মহাশয়ের কিম্বা বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের কৃষ্ণঠাকুর সে ঘাটের কদম্ব তরুশাখায় গোপবালার অপহৃত বস্ত্র রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই বৃক্ষের পল্লব একটু নূতনতর। গোপীনাথের "করপুটের চিহ্ন" নাকি ঐ সমুদায় পত্রাবলীতে প্রকাশিত হইতেছে। ভক্তজনের চক্ষে দেবতার লীলাখেলা অবশ্যই মালিন্যকণাহীন, কিন্তু দুঃখের বিষয় বৈষ্ণব কবিগণ ভক্তির স্রোতে, কবিত্ব-হিল্লোলে ভাসিয়া গিয়া তাঁহাদিগের "মহাপ্রভুকে" কিছু বেশিমাত্রায় বিলাসী করিয়া ফেলিয়াছেন। মহাজন পদাবলী ও অন্য বৈষ্ণব গ্রন্থ পড়িলে ভক্তি বিষাদে পরিণত হয়। তবে আজিকালিকার অনেক বিজ্ঞ সমালোচক কৃষ্ণচরিত্রে নানাপ্রকার অলৌকিকতা দেখাইতেছেন।

আরতির মধুর হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন বাসায় রহিয়া শুনিতে শুনিতে সুনিদ্রায় বিভাবরী পোহাইলে "রূপসী উষার অরুণ ভূষার তরুণ" শোভা নিরীক্ষণ করিয়া আমরাও "পথিক মন"কে জাগ্রত করাইয়া পরদিন প্রভাতেই দেব দর্শনে গমন করিলাম।

বৃন্দাবনে গাড়ী প্রভৃতি পাওয়া যায় না, সুতরাং পদব্রজে গমন করাই নিয়ম। জুতা, ছাতা ও ছড়ি লইয়া মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ থাকায়, তাহা দ্বারবানের নিকট গেটে রাখিয়া যাইতে হয়। "এখানে আসিলে সকলি সমান," লক্ষপতি হইতে অতি গরিব পর্য্যন্ত এ স্থানে "একই মূল্য বহন করে, এ বাজারে সব এক দর", "রাজা মহারাজা", "মহামহোপাধ্যায়" "নক্ষত্র" অনক্ষত্র

"রায় বাহাদুর" হইতে সামান্য কৃষক এখানে আসিয়া পাদুকাবিহীন হন। ইংরাজের কিম্বা বিধাতার উপাধির এ স্থানে সমান গৌরব।

প্রথমেই আমরা "গোবিন্দজী ও রাধারাণী" দেখিতে গেলাম। তখন কেবলমাত্র ললিত প্রভাত-রশ্মি উচ্চ মন্দির চূড়ায় কনক কিরণ প্রতিভাত হইয়াছে ও কাল পিক-কূজনে বৃন্দাবন জাগিয়া উঠিয়াছে, সেই সময়ই মন্দিরের চারিধার লোকারণ্যে পরিপূর্ণ এবং যাত্রীগণ যুক্তকরে বসিয়া যেখানে হরিনাম জপ করিতেছিল, আমরাও সেখানে গিয়া দাঁড়াইলাম। গোবিন্দজী ও রাধারাণী বৃন্দাবনের প্রধান বিগ্রহ।

গৃহত্যাগী ভিখারীর স্থান বৃন্দাবন, বৈষ্ণব কিম্বা গোস্বামী ভিন্ন অন্য লোক তত দেখিতে পাওয়া যায় না। অধিকাংশ পুরুষ কৌপীন ও নামাবলীধারী, আর স্ত্রীলোকেরাও এখানে অতি সঙ্কীর্ণ বস্ত্র পরিধান করে। পূর্ব্ববঙ্গের বৈষ্ণব বৈষ্ণবী এখানকার অধিবাসীর মধ্যে বেশি হইলেও নবদ্বীপ শান্তিপুরের গোস্বামী মহাশয়দের খুব দর্শন পাওয়া যায়।

বাজারে মৎস্য মাংসের সম্পর্কও নাই, খাদ্য ভিখারী উপযোগী, কিন্তু দুগ্ধ ঘৃত প্রচুব পরিমাণে পাওয়া যায়। গোচারণ ও নবনীত অপহরণ ক্ষেত্রে দুগ্ধ ঘৃত পাওয়া যাইবারও কথা। এখনও বৃন্দাবন গোপিনীর দেশ নয়। প্রতি বৎসর অনেক নূতন নূতন "আইন কানুন" প্রচার করিয়া "কানাই বলাই" একত্র "কাউন্সিলের" শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন।

এখানকার মনোহারীর দোকানে কেবল তুলসির মালা, তিলক "রজ" (বৃন্দাবনের ধূলা) ও নামাবলীই পাওয়া যায় এবং তাহাই লোকে ভক্তিভরে ক্রয় করে। বৃন্দাবননাথের রাজ্যে সৌখীন বিলাসের উপকরণ কিছু দেখিতে পাইলাম না।

এই সকল পবিত্র তীর্থস্থানে অসংখ্য পতিত পাতকী আসিয়া বাস করিতেছে। তীর্থের পবিত্রতা তাহাদিগের সহবাসে যেন কমিয়া যায়। অধঃপতিত জাতিকে পরিত্রাণ করিতে মহাত্মা চৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। কিন্তু সময়ে তাহাতে অশেষ অমঙ্গল আনিয়াছে। পুণ্যস্থানে মুক্তিলাভের ছলনায় কতপ্রকার ঘৃণিত কার্য্যে যে তাহারা জীবন কলঙ্কিত ও কলুষিত করিতেছে, তাহা ভাবিলে হৃদয় ব্যথিত হইয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর এই সকল তীর্থস্থানে আবার সহসা বুদ্ধ বা চৈতন্যের আবির্ভাব না হইলে, আর এ পাপ-স্রোত নিবারিত হইবার আশা নাই। সাধুজন সংস্কার-বহ্নি জ্বালাইয়া যদি ইহার অণু-পরমাণু একেবারে ভস্মীভূত করিয়া আবার নূতন উপকরণে ইহা প্রস্তুত করেন, তবেই নিস্তার, নতুবা আর এ জীবের মুক্তি সম্ভবে না। ঈশ্বর জানেন, এই সকল জীবনের পরিণাম কি ?

ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রমে লালাবাবুর ব্রহ্মচারী (একজন ধনবান উচ্চবংশজাত ব্রাহ্মণ, উপাধি ব্রহ্মচারী) এবং টিকারীর মহারাণীর সুন্দর দেবমন্দির দর্শন করিয়া আমরা শেষে শেঠের মন্দিরে গেলাম। লালাবাবুর অক্ষয় কীর্ত্তি বৃন্দাবনের চারিদিকে শোভা করিয়া আছে। তাঁহার "সদাব্রতে" প্রত্যহ দুই বেলা অসংখ্য দীন দরিদ্র অন্নপানে প্রতিপালিত হইতেছে। সামান্য এক মুষ্টি ভিক্ষা দিয়া কর্কশবাক্যে কেহ তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে পারে না। এখানে অনেক ভদ্রলোক ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী উচ্চ বেতনে নিযুক্ত আছেন, এবং তাঁহারা সুনিয়মে "সদাব্রতের"

কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। বিবাহ কিম্বা উপনয়নের সময় ধনীর গৃহে যেরূপ ভোজের আয়োজন হয়, তেমনি প্রতিদিন পুণ্যাত্মা লালাবাবুর সদাব্রতে আহার প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে যাহা খাইতে অভিলাষ করে, তাহাকে তাই পরিতোষপূর্ব্বক দেওয়া নিয়ম। তাঁহার ঠাকুর-বাড়ীর সমুদয় স্থান বড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সদাব্রত, অসংখ্য ভিখারীর বাসেও কিছুমাত্র মলিন নহে।

যে লালাবাবুর এই অতুল বৈভবময় পুণ্যকীর্ত্তি বৃন্দাবন জীবিত রাখিয়াছে,— লোকমুখে শুনিলাম, সেই পুণ্যাত্মা প্রত্যহ বৃন্দাবনের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্মরক্ষার্থ রুটি ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিতেন নাকি। এখানকার প্রায় সমুদায় দেবমন্দিরই দেখিতে অতীব মনোরম্য। আর ধনীগণ তাঁহাদিগের ধনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে যেন যত্নসঞ্চিত সুবর্ণ দ্বারা আপনাদিগের দেবমন্দির-চূড়া নির্ম্মাণ করাইয়া ধার্ম্মিকজীবনের সুখানুভব করিয়াছেন। স্বর্ণ যেমন পবিত্র ও সুনির্ম্মল, তাহার স্থান দেবতার গৃহচূড়াই যোগ্য। নরদেহ তাহার উপযুক্ত স্থান নহে। ফুল সম্বন্ধে ধার্ম্মিক কবি বলিয়াছেন,

এমন পবিত্র, এমন নির্ম্মল
দেবপদ ভিন্ন কোথা শোভে বল?
সুবর্ণ সম্বন্ধেও এ কথা খাটে,
এমন নির্ম্মল এমন উজ্জ্বল,
দেবচূড়া ভিন্ন কোথা শোভে বল?

টিকারীর মহারাণীর মন্দির-চূড়া কনক গঠিত হইলেও শেঠের মন্দির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাহার প্রায় অর্দ্ধেক স্বর্ণ নির্ম্মিত এবং উজ্জ্বল প্রভাকর কিরণ যখন তাহার উপর পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়, তখন সে হাস্যময় উচ্চ দীপ্তির দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় না। সে সৌন্দর্য্য আপনার গৌরবে আপনি মুগ্ধ। পৃথিবীর মলিনতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

শৈশবে যখন পিসীমার মুখে "রামায়ণ মহাভারতের" পুণ্যময় অপূর্ব্ব কাহিনী শুনিবার জন্য সন্ধ্যা হইতে কত রাত্রি চেষ্টা করিয়া জাগিয়া থাকিতাম, তখন বৃন্দাবনের এই "সোণার তালগাছের" কথা কতবার শুনিয়াছি। তাঁহার অমৃতপূর্ণ স্নেহের সহিত মিশ্রিত হইয়া তখন সে "সোণার তালগাছ" শ্রবণে যেমন মধুর লাগিয়াছিল, আজ তাহা শেঠের দেবালয় প্রাঙ্গণে চক্ষের সম্মুখে শরীরী রূপে বিদ্যমান দেখিয়াও আর তেমন মোহিত হইলাম না। স্মৃতিসুখকর রাজ্যের সে সুধাকাহিনী এখন কেবল অস্ফুট স্বপ্নসম বোধ হয়।

শেঠের প্রকাণ্ড ঠাকুরবাটীর পশ্চাতে একটী সুদীর্ঘ সুন্দর দীর্ঘিকা আছে। তাহার ঘন কৃষ্ণ বারিরাশি নিদাঘের মেঘমালা সদৃশ শোভাময়। সেই সলিল-হৃদয় মথিত করিয়া কত রাজহংস-হংসী ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে; যেন মানস-সরোবরে বিকশিত শ্বেত শতদল ফুটিয়া রহিয়াছে। তাহা একবার দেখিয়া সাধ পূর্ণ হয় না, যতবারই দেখিবে, ততবারই অতৃপ্ত নয়ন ফিরাইতে পারিবে না। কেমন সে মাধুরী, এখনও আমার মানসনেত্রে দীপ্তি পাইতেছে।

দর্শক কিম্বা যাত্রীগণের আমোদার্থে একখানি ক্ষুদ্র বোটও সেখানে যত্নপূর্ব্বক রাখা হইয়াছে, ইচ্ছা করিলে সায়াহ্নে তাহাতে আরোহণ করিয়া "জলখেলা" করা যায়। কর্ণধারহীন সে "সাধের তরণী তরঙ্গে" পড়িবার ভয় নাই। বসন্তের শরৎহিল্লোলে সে তরী আপনি ভাসিয়া যায়, "কূল ত্যজিয়া" গেলেও "আতঙ্কে মরিতে" হয় না।

"মোচার খোলার মত ছোট নৌকাখানি, চলে যেন নাচিয়া নাচিয়া।" "গগনের ঘন গরজনে" কিম্বা "খর সমীরণে" অদ্যাপি কোন বিপদ সে দীর্ঘিকা সাগরে ঘটে নাই।

শেঠজীর দেবনিকেতনের ভিতরও প্রত্যহ সকাল বিকালে কাছারী হয়। এখানেও অনেক ভৃত্য এবং পরিচারক ব্রাহ্মণ আছে। শুনিলাম, এখানকার নায়েবও একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক এবং অতিথি অভ্যাগতের সমুচিত আদর ও যত্ন করেন।

বৃন্দাবনের কোন বিগ্রহ দর্শনেই কিছু দিতে হয় না। বিগ্রহস্বামীগণ এই সকল দেবদেবীর জন্য অকাতরে প্রচুর অর্থদান করিয়া এবং জমীদারী লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন। দাতাদিগের বংশধরগণ ইচ্ছা করিলেও সেই সব "দেবোত্তর" এবং "ব্রহ্মোত্তর" কাড়িয়া লইতে পারেন না। নিয়ম বড় কড়াক্কড় নাকি।

অন্যান্য মন্দিরের বিষয় বলিতে বলিতে "সাহাজীর" চিত্রময় সুন্দর মন্দিরের কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এই মন্দিরের বাহিরে এবং ভিতরে নব নব প্রকার খোদিত ও চিত্রিত মূর্ত্তি আছে। তাহা সুনিপুণ ভাস্কর কিম্বা দক্ষ চিত্রকর হস্তজাত না হইলেও দেখিতে প্রীতিকর। কেমন একটু নবীভূত কল্পনা তাহাতে রহিয়াছে, দর্শক-নয়নরঞ্জন প্রতিমূর্ত্তিগুলিতে ভারতীয় কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার একটী চিত্র আমার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল; তাহা এই— অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহ রথারোহণে শূন্যমার্গে উঠিতেছেন, বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর, সুশীলা সুভদ্রা সখীগণ সহকারে সরোবর হইতে স্নাত বসনে গৃহে আসিতেছেন, সদ্য স্নানে বদনমণ্ডল লোহিত রাগে রঞ্জিত হইয়াছে, এমন সময় পথে অর্জ্জুনকে দেখিতে পাইলেন। উভয়ে উভয়কে দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন, কিন্তু কথাবার্ত্তা হইতে সুবিধা হইল না, স্বয়ং ভগবান রথোপরি আরূঢ়। দেখিতে দেখিতে রথ বায়ুবেগে ছুটিতে লাগিল, অর্জ্জুন মুখ ফিরাইয়া নিম্নদৃষ্টে রহিলেন, রথ অদৃশ্য হইয়া গেল। লজ্জাশীলা সুভদ্রা দৃষ্টির সীমায় প্রিয়তমকে আর দেখিতে না পাইয়া পদতলে আঘাত লাগিয়াছে বলিয়া রাজপথেই দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। চতুরা সহচরীগণ তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া পরস্পরে তাকাতাকি ও হাসাহাসি করিতে লাগিল। দেবী সুভদ্রা তাহাদিগের পরিহাসে কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিতে করিতে দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে চলিলেন।

"সাহাজী" পরমভক্ত। প্রতিদিন শত ব্রাহ্মণের পদধূলি তাঁহার মস্তকে পড়িলে তিনি পরলোকে পরিত্রাণ ও মুক্তিলাভ করিবেন আশায় নিজের এবং পত্নীর কল্পিত প্রতিমূর্ত্তি দেবালয়ের বারাণ্ডায় খোদিত করাইয়াছিলেন। সোপান হইতে বারাণ্ডায় উঠিতেই সেই যুগল মূর্ত্তিশিরে পদস্পর্শ হয়। তাঁহাদিগের মস্তক অতিক্রম করিয়া কোন প্রকারেই যাওয়া যায় না, এমনিভাবে তাহা খোদিত।

হায়! অদ্য এই পূজা পাইবার উপযুক্ত ব্রাহ্মণ কে? ভারতের অতীত যুগের গৌরবময়

কীর্ত্তির সহিত সেই আরাধ্য ব্রাহ্মণবংশ লোপ পাইয়াছে। এখন কেবল ভাগীরথীর দুই কূলে জীবিত শবমাত্র বিদ্যমান। জীবনের চিহ্নহীন উচ্চমন ব্রাহ্মণবংশের হীনতা দর্শন করিয়াই ব্রাহ্মণ কবি হেমচন্দ্র বিষাদে গাইয়াছিলেন,—

কি হবে রোদন করিলে এখন!
স্বাধীনতা ধন গিয়াছে যখন,
চোরে শিরোমণি করেছে হরণ
তখনি সে সাধু ঘুচে গিয়াছে

আমিও কবির বিলাপের সঙ্গে একতানে বলি,—

নাহি কি সলিল হে যমুনে, গঙ্গে,
তোদের শরীরে উথলিয়া রঙ্গে
কর অপসৃত এ কলঙ্ক রাশি
তরঙ্গে, তরঙ্গে, অঙ্গ, বঙ্গ নাশি
এ ব্রাহ্মণ বংশ ডুবাও জলে।

আগ্রা হইতে আরম্ভ করিয়া দিল্লী পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্বত্র শ্রীরামভক্ত মনুষ্যের পূর্ব্বপুরুষ বানর-কুলের দর্শন পাওয়া যায়। ইহারা পালে পালে গৃহদ্বারে—সুবিধা হইলে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া কতরূপে আপ্যায়িত করে। কখন ছাতা, কখন জুতো, কখন বা ঘটীবাটী আত্মসাৎ করিয়া গৃহস্থের সহিত বন্ধুতা করিতে চায়। এই অযাচিত বন্ধুগণ গৃহস্থদিগের জোর জবরদস্তিতে বশীভূত হইবার পাত্র নহে। এই "হাউস ট্রেসপাসে" ভারতীয় পিনালকোডের ৪৪৮ ধারা প্রয়োগ করিয়া কোন "সেন্ট্রাল জেলে" ইহাদিগকে রাখিয়া দিলে ইহারা সংশোধিত হয় কি না বলা যায় না। মথুরা বৃন্দাবনে ডার্বিনের (Mr. Darwin) শুভাগমন হইলে মনুষ্য যে বানর বংশ সম্ভূত, একথা তিনি অনায়াসেই সআইন ভাবে প্রমাণ করিয়া যাইতে পারিতেন। শুনিয়াছি, পণ্ডিতবরের আদি পিতামহের সহিত আকৃতিগত নিকটতর সাদৃশ্য ছিল। বৃন্দাবন মথুরার বানরগণের দৈনিক কার্য্যকিলাপের বিষয় কোন পশুপ্রিয় দার্শনিক যদি একখানি ইতিহাস লেখেন, তাহা হইলে এই "পুরুষপ্রধান" দিগের রহস্যময় চতুর বিজ্ঞতার বিবরণ সাধারণে কতক জানিতে পারে, নতুবা পশুত্ব ভাবুকতাহীন লেখকদিগের দ্বারা এ জাতির বুদ্ধির উদ্ধার সম্ভবে না।

বিগ্রহ দর্শন করিতে যাইবার পথে অসংখ্য ভিখারী দ্বারা আক্রান্ত হইতে হয়, এবং তাহাদিগকে কিছু না দিয়া এক পদ অগ্রসর হইবার সাধ্য নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক বালিকারা আবার নাচিয়া নাচিয়া ভিক্ষার্থে এই সকল গান করে,—

ধূলা নয়, ধূলা নয়, গোপীর পদরেণু,
এই ধূলা মেখেছিল নন্দের বেটা কানু।

মধুর মধুর বংশী বাজে এই বৃন্দাবন,
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড, গিরি গোবর্দ্ধন।

এ গীত শিশুকণ্ঠে সুললিত-শ্রুতিসুখকর বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পয়সায় না কুলাইলে গীতের পরিবর্ত্তে "লালাবাবুর সদাব্রতে" গিয়া দিনপাত করে। এবম্বিধ প্রিয় আশীর্ব্বাদে (?) পরিতৃপ্ত হইতে হয়, তীর্থস্থানের এই সকল "জাত ভিখারী" অতিশয় বিরক্তজনক। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বস্ত্রাদি পরিয়া রাজপথের সম্মুখে দেবালয়ে যাইবার বিঘ্নস্বরূপ দাঁড়াইয়া থাকে। ইহাদিগকে দেখিয়া দয়া অনুকম্পায় পরিণত হয়। সরকার বাহাদুর অহিতকর কুলি-আইন ইত্যাদি লইয়া চাকরদিগের সন্তোষার্থে মস্তিষ্ক বেশি মাত্রায় ব্যয় না করিয়া যদি এই সকল অকর্ম্মণ্য জাতির নিমিত্ত কোন কার্য্যালয় বা কারখানা,—বিলাতের গরিবের জন্য যেরূপ আছে, খুলিয়া দেন এবং আইন দ্বারা রাজপথে ভিক্ষা নিষেধিত হইয়া যায়, তাহাতে কত স্থায়ী উপকার হয়।

বেলা যখন দুই প্রহর, তখন দেবভোগের শাঁক ঘন্টা কাঁসর নাদে চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, ও আবাল বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ ভিখারীদল, কলরবে লালাবাবুর "সদাব্রতে" ও অন্যত্র ধাবিত হইল। আমবা সেই জনস্রোত ভেদ করিয়া শূন্য বাসায় আসিলাম।

দিবানিদ্রায় ক্লান্তি দূর করিয়া সায়াহ্নে আবাব আমরা বৃন্দাবন ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। পথেই "বংশী বট" নামক জীর্ণশীর্ণ একটী প্রাচীন বটবৃক্ষ। গোপীনাথ ইহাতে নাকি বাঁশী রাখিতেন, তাহা "গোপেশ্বর" শিব। প্রবাদ এই, বৃন্দাবন গোপিনীগণ সহ নটবর মাধব একদা নৃত্যগীতে মত্ত, এমন সময় মহাদেব সেই নৃত্যগীতে মুগ্ধ হইয়া স্বর্গ হইতে নারীরূপে মর্ত্যে অবতীর্ণ হন এবং সেই বিলাস-বলে (Ball) যোগ দেন। কাশীশ্বর নৃত্যগীতে সুনিপুণ, তাঁহার সেই অপার্থিব নাচনে সব সখীগণ চমৎকৃত হইয়া মুখ চাহিতে লাগিল, তখন ভাবে ভোলা নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ছদ্মবেশে রমণীগণের সহিত যে নৃত্য করিয়াছিলেন, সেজন্য লজ্জানুভব করেন, কিন্তু উদারহৃদয় গোপিনীমোহন তাহাতে পরিতুষ্ট হইয়া পার্ব্বতী-নায়ককে গোপেশ্বর নাম দিয়া বৃন্দাবন-ধামে বাস করিতে অনুমতি দেন। এখানে সবই রাধাকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রহিয়াছে, কেবল এই "গোপেশ্বর মহাদেও" সেই একচেটিয়া রাজত্বে অন্যেকত্ব দূর করিয়াছেন। "ব্রহ্মকুণ্ড ও কালিয়াদহ" প্রভৃতি দর্শন করিয়া পরিশেষে আগ্রহ সহকারে "নিধুবন" নিকুঞ্জ বনাভিমুখে চলিলাম। "বসন্তের নিত্যবাস, সঙ্গীতের চিরোচ্ছ্বাস", সুখের পূর্ণ নিকেতন এই বন, বনভূমি নহে। নন্দন পারিজাত পরিমলময় কুসুমকুল প্রস্ফুটিত, লতাপত্রে পরিশোভিত এই কুঞ্জবন অমর বাঞ্ছিত দিব্যধাম। কত ফলপ্রদ বৃক্ষাবলী সাদরে সলজ্জ লতিকা হৃদয়ে ধারণ করিয়া মুগ্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছে। সেই সকল তরুণ শ্যামলপত্র মাঝে কলকণ্ঠ পিককুল কূজনে অদৃশ্যে সঙ্গীত-তরঙ্গ বিস্তার করিয়া মোহে আচ্ছন্ন করিতেছে। তাহারা এ সংসারের জীব নহে। শাপচ্যুত দেবশিশু মনুষ্যমনের সন্তাপ অপহরণ করিতে যেন ঐ নব পল্লবিত তরুশিরে ভর করিয়াছে। শোক জ্বালায় দুঃখী মানব যখন সেখানে যাইবে, তখন এই সুরশিশুগণ স্বর্গের পবিত্র সমাচার সঙ্গীত শুনাইয়া মুক্তির পথ দেখাইয়া দিবে। উভয় কুঞ্জ

ভিতরেই প্রস্তর-গ্রথিত সিংহাসন রহিয়াছে। প্রতি নিশায় পুষ্পমালায় ও দীপাধারে ভক্তবৃন্দ তাহা সজ্জিত করিয়া রাধাকৃষ্ণের অদ্যাপি নিশীথ সমাগমের পরিচয় দেয়। "নিধুবন" ও নিকুঞ্জবন উভয়ের মধ্যেই কুণ্ড আছে। বনবিহারে একদা মাধব-বিনোদিনী ক্লান্তভাবে প্রিয়তমের নিকট শীতল পানীয় চাহিয়াছিলেন। সেই অসময়ে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য কোন উপায় না দেখিয়া মদনমোহন ললিতা ও বিশাখার করস্থিত বংশীদ্বারা কুণ্ড খনন করিয়া প্রণয়িণীর পিপাসা দূর করিয়াছিলেন। তাই এই বিহারভূমে "ললিতা" ও "নিধুবনে" বিশাখা কুণ্ড বিদ্যমান। দুই কুণ্ডই পাষাণ সোপানযুক্ত ও নীল সলিলে শোভাপূর্ণ।

কুঞ্জবনের প্রবেশদ্বারে কপিকুল প্রহরীস্বরূপ বসিয়া থাকে, আহারীয় মিষ্টান্ন দক্ষিণা না দিলে তাহারা কখনও দ্বার ছাড়িযা দেয় না। খাদ্যদ্রব্য দিবামাত্র কেমন আদরে কৃতজ্ঞতা জানাইতে দূরে দূরে সরিয়া যায়, কাহাকেও কিছু বলে না। দুই বনের দুই দল ও দলপতি আছে। কোন্টা কনজার্ভেটিব (Conservative) কোন্টা লিবারেল (Liberal) তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। মাঝে মাঝে লোকে পরিহাসচ্ছলে তাহাদিগের "লড়াই" বাধাইয়া দেয় এবং যে দল জয়লাভ করে তাহার বানরদিগকে দলপতিসহ ভোজন করায়।

আরতি না দেখিয়াই সন্ধ্যার ললিত মধুর সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে "সন্ন্যাসীর আখড়া" হইয়া আমরা সেদিনকার মত কেন, যেন চিরদিনের তরে পুণ্যক্ষেত্র বৃন্দাবনের নিকট বিষাদে সজল নেত্রে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

"ললিত লবঙ্গ লতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীর" বাহিত, চির হাস্যময়ী প্রকৃতিরাজ্ঞীর নিবাস ছাড়িয়া আবার সংসারে আসিতে হৃদয়ের পরতে পরতে নৈরাশ্যের অন্ধকারে ছাইয়া ফেলিল। বসন্তেই বর্ষা আসিল—এখন ভিক্ষা কেবল, প্রভু, তোমার পদতলে চিরনিদ্রা—

গৃহহীন পান্থশালে
কাটে দিন গোলমালে
বিভবের শূন্য গরিমায়,
অশ্রুভরা হাসি মুখে
যন্ত্রণা অনল বুকে
ক্লান্ত নিতি মুক্তি ভাবনায়।

বিদায়

নিস্তব্ধ নিশার শেষভাগে, অস্ফুট চন্দ্রালোকে, নীরব বিষণ্ণ অন্তরে যখন আমরা সুষুপ্ত বৃন্দাবন ও মথুরার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া কীর্ত্তির মহা শ্মশান ইন্দ্রপ্রস্থাভিমুখে যাত্রা করি, জানি না কেন তখন, জননী জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া কোন অজ্ঞাত দূরদেশে যাইতে মন যেমন সহজে অগ্রসর হইতে চাহে না, সেইরূপ সেই তীর্থস্থান পরিহারে আমার হৃদয় ব্যথিত হইল।

অগণিত তারকাপুঞ্জ মস্তকোপরি, নিম্নে কলনাদিনী পুণ্যসলিলা যমুনা এবং পার্শ্বে পার্শ্বে কাঞ্চনচূড় অসংখ্য দেবমন্দির, কিন্তু নিরানন্দ-মানস-জনিত এ সকলই আমার নেত্রে শোভাহীন বোধ হইতে লাগিল। সুচারু যমুনা-সেতুর উপর হইতে নিশীথ অন্ধকারে পশ্চাৎগামী মথুরাপুরী দেখিতে বড় মনোহর এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নিশাবসানের দেব-মন্দিরাগত নহবৎধ্বনি অতীব শ্রুতি-সুখদায়ক। তবে নৈরাশ্যের ঘোর অমাবস্যায় এ সবই যেন কেমন ছায়াময় করিয়া ফেলিল; তাহা আজি বাহ্যজীবনের আধভাঙ্গা স্বপ্নবৎ স্মৃতিতে কখন কখন জাগিয়া উঠে মাত্র।

অশ্ব শকটের বিশাল ঘর্ঘর শব্দ সহসা থামিলে, ট্যাক্স দারোগার (toll officer) জীর্ণ বদন দর্শনে আমার চমক ভাঙিয়া গেল। তখন বুঝিলাম যে, আমরা ষ্টেসনের অতি নিকটে। রজনী প্রভাতেই ষ্টেসনে পৌঁছিলাম।

হাস্যময়ী ঊষার সুস্নিগ্ধ বসন্তমলয়মারুৎ সেবনে যেন অনুপ্রাণিত হইয়া, আবার আমরা দিল্লীগামী দ্রুততর বাষ্পীয় যানে উঠিয়া, নানাপ্রকার দৃশ্যময় গ্রাম নগরী দেখিতে দেখিতে, ঠিক বেলা দ্বিপ্রহরের সময়েই দিল্লী গিয়া অবতরণ করিলাম। এই পথের সকল স্থানের নামগুলিই বেশ সুন্দর। তন্মধ্যে আলিগড় একটী প্রাচীন ঐতিহাসিক ও আধুনিক অতি সমৃদ্ধিশালী স্থান। এই আলিগড়ের বিখ্যাত মৃত্তিকা-দুর্গ ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড লক অধিকার করিয়াছিলেন ও নগরের অনতিদূরে অদ্যাপি তাহার চিহ্ন আছে। এখানে বহু সংখ্যক ধনী মুসলমানের বাস এবং কলেজ প্রভৃতি থাকায় বেশ জ্ঞানালোচনাও এখন হইয়া থাকে। অনেক বাঙ্গালী কার্য্যোপলক্ষে এখানে আসিয়া লোকজনের নিকট সমুচিত সম্মান লাভ করিয়া সগৌরবে রহিয়াছেন।

আলিগড়ের প্রস্তর-বিনিন্দিত মৃন্ময়পাত্রাদি বড় সুন্দর এবং সেজন্যও ইহা সর্ব্বত্র বিশেষ প্রসিদ্ধ; ষ্টেসনে দলে দলে বিক্রেতাগণ সে সকল দ্রব্য সামগ্রী লইয়া আসিয়া দর্শকের দৃষ্টি ও হৃদয় আকর্ষণ করে। কিন্তু অধিকাংশ বাঙ্গালী কেবল তার দরমাত্র করেন, ক্রয় করেন কেবল ইংরাজ স্ত্রী-পুরুষ।

দিল্লী হিন্দু এবং মোগল গৌরব বিকাশের পূর্ণ শেষ নিদর্শন হইলেও, তাহাতে নামিয়া আমরা যেন নিতান্ত-পরিত্যক্ত অনুভব করিতে লাগিলাম ও তখন পাণ্ডাঠাকুরদিগের সময়োচিত সাহায্য ও উপকারিতা আরো গভীররূপে মনে জাগিতে লাগিল। এখানেও হিন্দুর সরাই আছে এবং "ময়ূর সরাই" তন্মধ্যে প্রধান; কিন্তু বাঞ্ছনীয় নির্জ্জনতা অভাবে আমরা সেখানে যাইতে অস্বীকার করিয়া একজন ফিরিঙ্গী পাদরীর ক্ষত্রিয়-রক্ষিত হোটেলের দ্বিতল অংশে বাসা লইলাম। তাঁহার বন্দোবস্তের সুবিধায় আমাদিগের সেখানে কোনই কষ্ট পাইতে হয় নাই। পাদরী সাহেবটী অতি ভদ্রলোক। অযাচিতরূপে সময়মত সকলি পাওয়া যাইত। তাঁহার কিছু ত্রুটি ছিল না।

যদিও বহুদিন হইতে মুসলমান জাতির সহিত আমরা নিকটতম সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ, এবং তাঁহারা আমাদিগের ভ্রাতৃস্থানীয়, যদিও পুরাকালে হিন্দু রাজপুত-কন্যার সহিত মোগল সম্রাটগণের পবিত্র পরিণয়ও হইত, এবং বাদসাহ দরবারে কত উচ্চ উচ্চ রাজপদ অযাচিতে

লাভ করিয়া হিন্দুগণ সম্মানিত হইতেন এবং অদ্যাপিও কত কত রাজন্যবর্গ দিল্লীশ্বরের কৃপায় সর্ব্বত্র-পূজিত হইতেছেন, তবু বলিতে পারি না কেন, এই হোটেলের যবনভৃত্যদিগকে আমি কোনমতেই বিশ্বাস করিতে পারি নাই, এবং তাহাদিগকে স্বকার্য্যে রত দেখিয়াও আমার হৃদয়ে সন্দেহ-জনিত অসুখ অনুভব হইত। বড়ই দুঃখের বিষয়, হোটেলের একজন "আরদালি" মুসলমান সুচারুরূপে আমাদিগের বাহিরের সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়াও আমার বিশ্বাসভাজন হয় নাই।

আমাদিগের হোটেলের অপর অংশে মহারাজ হোলকারের কয়েকজন "মোসাহেব" বাসা লওয়াতে এখানে আমরা আশাতীত নিরাপদ হইয়াছিলাম।

নানা কথায় এক কৌতুকাবহ ঘটনার উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছি। তখন ভিসি (Veasey) সাহেবের অভূতপূর্ব্ব গোপনীয় সারকিউলার "অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে" জারি হয় নাই ও কূটনৈতিক ডফারিণ মহোদয় "ফ্রন্টিয়ার পলিসি" এবং ব্রহ্মজয়ে বিব্রত হইয়া স্বদেশাভিমুখে অকালে অপসৃত হইবেন, ইহাও কেহ জানিত না।[৮] সে যাহা হউক, আমরা ট্রেণ হইতে নামিয়া ষ্টেসনের বাহিরে পা দিবামাত্র সহসা কোথা হইতে একজন দক্ষ পুলিশ কর্ম্মচারী, খাতা হস্তে, লেখনী কর্ণে, নামধামাদি লিখিয়া লইবার অভিপ্রায়ে আমাদিগের সম্মুখে দ্রুতবেগে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা ছদ্মবেশী রুসিয়ান নহি এবং গরিব আমাদিগের দ্বারায় প্রবলপ্রতাপ বৃটিশ সিংহের অপ্রতিহত সাম্রাজ্যের কোনরূপ যে বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা বা আশঙ্কা নাই, এ-কথা বিশদরূপে বুঝিয়াও সে ব্যক্তি, তাহার প্রভুকে মিষ্ট ভাষায় গালি দিতে দিতে সরব বিনয়ে নিজ "ডিউটি" (duty) করিয়া, সেই সঙ্গেই আবার ভাগ্যদোষে এই অসার কার্য্যেও গৌরাঙ্গ প্রভুর নিত্য অপমানের তাড়নায় জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে বলিয়া কত কি আক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহারই প্রমুখাৎ শ্রুত হইলাম যে, দিল্লী রাজসূয় দরবারের পরে বড়লাটের হুকুমে নাকি এই "রূপ" হইয়াছে। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা অপহরণ এবং অস্ত্র আইন বিধিবদ্ধ করিয়া সুনীতি-বিশারদ লীটন বাহাদুর যে কীর্ত্তিধ্বজ উড়াইয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার নাম ভারতে চিরস্মরণীয়।[৯] আর এটা-সেটা টানিবার প্রয়োজন ছিল না।

মদ্যপায়ী যথেচ্ছাচারী বামাচার-সম্প্রদায়ের বিনাশার্থে এবং পাপীর মুক্তি তরে যেমন পুণ্যবতী জাহ্নবী-হৃদয়ের জ্ঞানালোক-প্রদীপ্ত পবিত্র নবদ্বীপ ধামে,—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের 'নদীয়াপুরে' শ্রীগৌরাঙ্গ দেবাবতারের আবির্ভাব, তেমনি লীটন-শাসন-প্রপীড়িত দগ্ধ ভারতে শান্তিবারি সিঞ্চনার্থ মহাত্মা লর্ড রিপনের শুভাগমন হইয়াছিল।[১০] ইংরাজ শাসিত ভারতরাজ্যে, সাম্যের মহামন্ত্রে অনুপ্রাণিত করিয়া নববিধি প্রচার করিতে তিনি ঈর্ষান্বিত স্বজাতির বিরাগভাজন হইয়া, অসময়ে, ব্যথিত অন্তরে ভারতভূমি পরিত্যাগে বাধ্য হইলেন। কিন্তু এখন সে কথা যাউক।

ইন্দ্রপ্রস্থ ও দিল্লী

ধন, মান, সুখ, সম্পদ, বীরত্ব ও পুণ্যময় স্বাধীনতার একত্রীভূত সমষ্টি, স্মৃতির পরম আদরণীয় ও কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ, এই ইন্দ্রপ্রস্থ। ভীমার্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের পবিত্র পদরেণু অদ্যাপি ইহার অণুতে,—প্রত্যেক ধূলিকণা যেন তাঁহাদিগের জীবনকাব্যের পবিত্রতার মধুর কাহিনীর পরিচয় দিতেছে। যুগ যুগান্তরবাহী সমীরণ আজিও যেন ভারতের দ্বারে দ্বারে সেই পূর্ব্বের অতুলনীয় মহিমাগীতি গাইয়া বেড়াইতেছে,—দুর্ভাগ্য দাসত্ব-জঙ্গতপ্রায় আর্য্যসন্তানের পুনর্জ্জীবন দান করাই যেন তাহার অভিপ্রায়। অতীতের সে সঞ্জীবনী সুধা-গীতে যদি আবার ভারতে নবজীবন সঞ্চার হয়, আবার যদি তাহাতে নিদ্রিত ভারতবর্ষ উৎসাহানলে জ্বলিয়া উঠে তবেই চির বিশ্বস্ত বায়ু কৃতার্থ হইবে।

ইন্দ্রপ্রস্থ এবং দিল্লী দুইটি বিভিন্ন নগরী ও অতি সামান্য পথমাত্র ব্যবধান। পরবর্ত্তী আর্য্যপুত্রগণ পূজনীয় ইন্দ্রপ্রস্থের শেষ রেখাও যে আর দেখিয়া জীবন সার্থক করিবেন, সে আশা বড় কম। ভারতের মানচিত্রে তাহার প্রতিকৃতি বহুদিন লোপ পাইয়াছে, কেবল স্মৃতিযোগে ভগ্নপ্রস্তরে ইন্দ্রপ্রস্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

যুগান্তরের সাক্ষী-রূপী এই যে অযুত অযুত রাজপুত বীরের লীলাক্ষেত্র দিল্লী নগরী—এই শরীরী স্বপ্নময় কীর্ত্তির মহা শ্মশানে দাঁড়াইয়া অদ্য যদি আমি অভ্রভেদী স্বরে ক্রন্দন করি, তবে আমার সে মর্ম্মান্তিক করুণ রোদন ধ্বনি কাহার প্রাণ স্পর্শ করিবে? কে আমার হৃদয়ের গভীর বেদনা বুঝিবে বল?

"ভারতে জীবন নাই, শব রাশি রাশি জাহ্নবীর দুই তীরে"। চারিদিকে ভগ্নাবশেষ, সর্ব্বত্র শ্মশান, ধূ ধূ করিয়া চিতানল জ্বলিতেছে, তাহাতে আশা ভরসা, উৎসাহ, উদ্যম অনুদিন পুড়িয়া পুড়িয়া সব ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছে। মনে হয়, কুরুক্ষেত্র মহা সমরে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, আজও যেন সেই জ্ঞাতি-বিরোধরূপ-সর্ব্বগ্রাসানল নির্ব্বাপিত হয় নাই। জীবনের পার্থিব মায়া পরিহার করিয়া "সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্য শ্যামলাং" পবিত্র মাতৃভূমিকে প্রাণ-পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা না করিলে অদ্যকার এ দুর্গতি আর ঘুচিবার নয়।

ছিল বটে আগে তপস্যার ফলে।
কার্য্য সিদ্ধ হতো এ মহীমণ্ডলে।।
এখন সে দিন নাহিক রে আর।
দেব আরাধনে ভারত উদ্ধার—
হবে না হবে না।

ইহাই পরীক্ষিত সত্যস্বরূপ মনে বিশ্বাস করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধারে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। এখনও "বিংশতি কোটি" ভারত সন্তান একমন, এক প্রাণে, সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া

সাধনা করিলে অবশ্যই সিদ্ধ-মনোরথ হইতে পারেন।

দৃশ্যময় মহানগরী দিল্লী সম্বন্ধে নূতন করিয়া কোন কথা বলিবার না থাকিলেও, প্রত্যেক আর্য্যসন্তানের নিকট তাহার কথা প্রতিবারই নূতন। আমার নয়নে এ-স্থান একটি অভিনব পুণ্যতীর্থ।

কাব্য ইতিহাস পুরাণে, কথায় কি উপকথায়, আশৈশব যাহার গৌরব-বৃত্তান্ত শুনিয়াছি, সেই হিন্দু মুসলমানের কীর্ত্তিমান স্মৃতিচিহ্ন, দিল্লীর প্রাচীন সৌধমালা এখনও রমণীয় শ্রীসম্পন্ন ও পূর্ব্ব-ঐশ্বর্য্য-প্রকাশক। আগ্রা এবং দিল্লী যদি একজন পৃথ্বিপতির কল্পনার মানস রাজ্য হইত, কিম্বা অমর-শিল্পী বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং একই উপকরণে ইহা নির্ম্মাণ করিতেন, তবুও আকৃতিগত সৌসাদৃশ্যে ইহারা দুইটী পৃথক সুরপরী। এক জননীর গর্ভজাত দুইটি সন্তান যেরূপ বিধাতার অপূর্ব্ব কৌশলে একাকৃতি-সম্পন্ন নহে, সেইরূপ এই অলৌকিক শিল্পজাত অমরাবতীদ্বয়ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

পুরাতন প্রাসাদনিচয় একদিকে যেমন দিল্লীর অনন্ত বৈভবের পূর্ণতার পরিচয় দিতেছে, অন্যদিকে তেমনি আবার ভগ্ন সমাধি ও ধ্বংসাবশেষ দ্বারা মানব সম্পদের অচিরস্থায়িত্বের কথা নীরবে কহিতেছে। এই জীবন-মৃত্যু বক্ষে ধারণ করিয়া মহানগরী দিল্লী অদ্যাপি দণ্ডায়মান। মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার কলিকাতা আজ ধন, জন, সুখ, সৌভাগ্যপূর্ণ রাজধানী, আর দিল্লী প্রাচীন স্মৃতির গৌরব-রাজ্য, শাপভ্রষ্ট সুরধাম। দিল্লীর ইংরাজ-নির্ম্মিত নূতন অট্টালিকাগুলি কলিকাতার সহিত তুলনায় কিছুই নহে। রাজপথও জনকোলাহল-পরিশূন্য এবং এদিক সেদিক বৃহৎ বৃহৎ প্রান্তর শ্যামল দূর্ব্বাদল ও ছায়াময় তরুরাজি বিহীন,—প্রচণ্ড রবিকরে যেন সব দগ্ধপ্রায়। রাজপথে জলসিঞ্চনের চিহ্নমাত্র নাই। নিম্নে নীলাঙ্গিনী যমুনা, মৃদু কল্লোলিনী, কিন্তু সে কল্লোল মন্থরগমনে জীবনের অপূর্ণ-মানসে, জাগিব জাগিব করিয়া, আবার বিস্মৃতি সহ মিলাইয়া যায়। তাহাতে সুখ নাই, কেবল যন্ত্রণা।

গজদন্ত-বিনির্ম্মিত বিবিধ কারুকার্য্যের সজ্জিত বিপণী রাজপথবাহী দর্শকগণের দৃষ্টি আকর্ষণকারী। সেই বিচিত্র সৌন্দর্য্য দুর্ম্মূল্যও নহে। সকলেই তাহা ক্রয় করিয়া সুখী হইতে পারেন।

"দিল্লীকা-লাড্ডু যো খায়া ওবি পস্তায়া, যো না খায়া ওবি পস্তায়া"—এই রহস্যবাণী বাল্যকাল হইতে শুনিয়াছি। সেই রহস্যময় মিষ্টান্ন-মিষ্টারী-(mystery)-ভেদাভিলাষী আমরা তাহার মধুরতায় সরস রসনা পরিতৃপ্ত করিতে যেরূপ উপহসিত হইয়াছিলাম, তাহা আবার নূতন করিয়া জনসমাজে বলিয়া আর লজ্জা পাইতে চাহি না। সে সাধের 'লাড্ডু' ভ্রান্ত পথিকের দন্ত ও জিহ্বা একবার আস্বাদ করিলে ইহজীবনে কখনও ভুলিতে পারে না। তাহার বাহ্যদৃশ্য চমৎকার, কিন্তু ভিতর বালুকা-পরিপূর্ণ, সুতরাং তাহা যো খায়া ওবি পস্তায়া, যো না খায়া ওবি পস্তায়া, এ-কথা ঠিক।

এখানে রাজকর্ম্মচারী ও রেলওয়ের বাঙ্গালী ব্যতীত আর সবই প্রায় তদ্দেশীয় মুসলমান। ষ্টেসন মাষ্টারদিগের প্রতি ব্যঙ্গপ্রিয় "ধীরাজের গান, বেটাদের আলপাকার চাপকান সব দেখিতে

পাই" দিব্য স্মরণ থাকিলেও সেই বাল্যসুলভ রাগ তাঁহাদিগের উপর আর নাই। এই পর্যটন-বহুদর্শিতায় যাহা দেখিলাম, তাহাতে বাঙ্গালা হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমাঞ্চলের নানা স্থানের বাঙ্গালী ষ্টেসন মাষ্টারদিগকে অতি ভদ্রলোক বলিয়া প্রতীতি জন্মিয়াছে। তবে তাহাদিগের নীচকর্ম্মচারী "রেলের" দুচারিজন বাবু এরূপ সেরূপ বটে। রেলওয়ে ইত্যাদির উচ্চকার্য্যে উচ্চশ্রেণীর ভারতবাসীর সংখ্যা যত বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। অহিফেন প্রভৃতি ডিপার্টমেন্ট এখনও ইংরাজ ফিরিঙ্গীর একচাটিয়া।

চন্দ্র সূর্য্য রশ্মি-হীন, বায়ু-প্রবাহরুদ্ধ অন্ধকূপ-বাসিনী উচ্চবংশীয়া যবন রমণীর মুখ-দর্শন-সৌভাগ্য দিল্লী আসিয়াও আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই, তাই—"হরি হরি কেমন করিয়া বলিব, কেমন সেই মুখখানি।" তবে ভাগ্যবতী মুসলমানীর ট্রেনারোহণের আপাদমস্তক শোচনীয় অবগুণ্ঠন, "ঘেরাটোপ" ভাবিলে এখনও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, কিন্তু আমোদ এই যে, সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তিমতী লজ্জা (আব্রু), দাসী-পরিবেষ্টিতা হইয়া প্লাটফর্ম্মে বিরাজ করে।

ক্রমান্বয়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রথম দিন পরিত্যাগে অসমর্থতা হেতু পরদিবস মধ্যাহ্নেই তীব্র রবিকর উপেক্ষা করিয়াও আমরা দিল্লী সন্দর্শনার্থ শকটারোহণ করিলাম। আমাদিগের মূর্ত্তিমান ছক্র (ছ্যাক্ড়া গাড়ী) সশব্দে লতাপুষ্প সুশোভিত "শিশু কণ্ঠকূজিত" বিগ্রেড জেনারেলের "কুঞ্জ কুটীরাভি" মুখে যখন প্রধাবিত হইল, আর প্রলয়ের ঝঞ্ঝাবাতে যেন দেশশুদ্ধ ধূলিরাশি উড়াইয়া চলিল। জেনারেল সাহেবের নিকট দুর্গ-প্রবেশের পাস সংগ্রহ করা রীতি। সৈনিক বিভাগের উচ্চপদস্থ ইয়োরেসিয়ানরা প্রায়ই অধিকাংশ গর্ব্বান্ধ সিভিলিয়ান অপেক্ষা শত গুণে ভদ্রলোক। বীর শোণিত অকারণে কদাপি উষ্ণ হয় না। অসারে উত্তাপ বেশি—ইহা জগতে কেহই অবিদিত নহেন।

লৌহদ্বার
(গেট)

দুর্গে প্রবেশ করিতে হইলে এই ভীমকায় অভেদ্য লৌহদ্বার অতিক্রম করিতে হয়। ইহা অচল অটলভাবে প্রহরীস্বরূপ দাঁড়াইয়া অদ্যাপি যেন রাজপুরী—কেল্লা রক্ষা করিতেছে। দুর্জ্জয় অনীকিনীর অনিবার্য্য তরঙ্গাভিঘাতে তাহার ঐতিহাসিক বিপুল কলেবরে একটুমাত্র শিথিলতা স্পর্শ করিতে পারে নাই, সে লৌহতনু এমনি সুদৃঢ়রূপে গঠিত যে, অতীতের শত শত বীরবাহুর বজ্র প্রহার এবং সমরোন্মত্ত হস্তীর উৎপীড়ন কেবলমাত্র উদার বক্ষে সহ্য করিয়াছে এবং অবিচলিত রুদ্ধ প্রাণে প্রভুর রাজ্য ঝন্ঝনাৎ শব্দে রক্ষা করিয়া কর্ত্তব্য পালনে রত রহিয়াছে। তাহাকে স্বর্গের প্রথম সোপান, মুক্তির দ্বার বলিতে পারা যায়। এই দ্বারপথে প্রবেশ করিয়া দুর্গ-হৃদয়স্থ বিচিত্র রাজনগরী সহসা চক্ষের উপর প্রভাসিত দেখিলে দ্রবীভূত হৃদয়ও আনন্দে শতধা উথলিয়া পড়ে। বিস্ময় প্লাবিত নেত্র কি ছাড়িয়া কি দেখিবে, তাহা বুঝিতে পারে না,

অনিমেষে চাহিয়া চাহিয়া কেবল মুগ্ধপ্রায় হইয়া থাকে।

কেল্লা

দরবার নিকেতন "দেওয়ানা আম ও দেওয়ান খাস" "রঙ্গমহল মতি মসজিদ" এবং স্নান-সৌধ "হামাম" প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্বনামখ্যাত চারু হর্ম্ম্যে বিরাজিত কেল্লা শারদীয় প্রতিমাসম ত্রিদিব সৌন্দর্য্যে বিভাসিত। কত মণিমুক্তার প্রবাল ভূষণে এই সকল রমণীয় সৌধমালার কমনীয় কান্তি যেন শশাঙ্ক-জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে। এখন যদিও সেদিনের সে পৌর্ণমাসী দীপ্তিনিভ জীবন্ত মধুরিমা আজ নাই, তবুও ধরাতলে এ দ্বিতীয় ইন্দ্রালয় অতুলনীয়রূপে চির প্রস্ফুটিত। এ রাজপ্রাসাদ অদ্য পরিত্যক্ত ও জীবনবিহীন নির্জ্জনতায় বিষাদপূর্ণ। সম্রাটহীন সাম্রাজ্য, প্রাণীশূন্য সুআশ্রম এবং পতি-বিয়োগ-বিধুরা হিন্দুনারী যেমন অশ্রুময় শোকের প্রতিচ্ছায়া, ইহাও তেমনি।

হামাম
(স্নানাগার)

রাজকীয় গৌরবের এবং বাদসাহী বিলাসের চরমোৎকৃষ্ট পূর্ণ নিদর্শন এই অবগাহন মন্দির। শুভ্র মর্ম্মর-বিনির্ম্মিত স্তম্ভময় তিন বৃহৎ মনোহর প্রকোষ্ঠ অতি উপাদেয় প্রস্তরখণ্ডে সুসজ্জিত এবং তাহার প্রতি কক্ষের অন্তরস্থিত কৃত্রিম উৎসময় রম্য সরিৎসহ বহুবিধ নল এমনি সুকৌশলে সংলগ্ন রহিয়াছে যে, তাহাতে বিনা সাহায্যে স্নানকালীন স্বচ্ছ বারি আপনা হইতে নির্গত হয়। কোন নল উষ্ণ, কেহ বা আবার সুশীতল নীরধারা মুগ্ধ প্রাণে বহন করিয়া সরসীমাঝে সম্মিলিত আলিঙ্গনে উছলিয়া পড়ে। সেই লীলাময় স্নিগ্ধোষ্ণ প্রেমপ্রপাতে চারু অঙ্গ ভাসাইয়া জ্যোৎস্নাময়ী বিদ্যাধরীরূপিণী নৃপেন্দ্র-কণ্ঠহার মহিষীগণ যখন জলকেলী করিতেন, তখন সুবাসিত উৎস-সলিলে রূপলহরী আহ্লাদে ছুটাছুটি করিত। চকিত বায়ু গবাক্ষপথে সে সৌন্দর্য্য-চুম্বিত সুরভি মাখিয়া রাজসমীপে বার্ত্তাবহন করিলে, সুবাস-সেবিত সমীরণে প্রিয়তমার সাঙ্কেতিক স্পর্শানুভবে স্বয়ং দিল্লীশ্বরও চঞ্চলচিত্ত হইতেন এবং সভাভঙ্গে প্রেয়সী বেগম সহিত বিলাসাবগাহনে মধ্যাহ্ন প্রণয়োপভোগ করিতেন। জানি না, এই শিল্প চারু চির-বসন্তময় শীতল শিলা-হর্ম্ম্যে সুরভি নির্ঝর-নীরে, প্রিয়জন-মিলিত নিদাঘ মধ্যাহ্ন-স্নান, এ তাপ-দগ্ধ দেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর কোন ভগিনী কল্পনায় অনুভব করিয়া হিংসনীয় মনে করেন কিনা।

ময়ূর সিংহাসন

একে একে হর্ষ বিষাদে আমরা মোগল-গৌরবের চিহ্নগুলি দর্শন করিয়া ক্রমে দুর্গ-পরিহার সময় "ময়ূর-সিংহাসন" দেখিতে গেলাম। "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" পূর্ব্বে যে সিংহাসন আলোকিত করিয়া বসিতেন, সেই দেবদুর্ল্লভ "ময়ূর সিংহাসন" বহুদিবস পারস্যে চলিয়া গিয়াছে। এখন তাহার স্থানে শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরের এক সামান্য সিংহাসন সাক্ষীগোপাল- রূপে রক্ষিত হইয়াছে। রূপগুণসম্পন্ন একমাত্র প্রিয়পুত্র বিয়োগে ধনবতী বিধবার শূন্যগৃহ যেমন উপগণ্ড পোষ্যপুত্রদ্বারা পূর্ণ করা হয়, এও তেমনি। আবার যেমন প্রাণাধিক পুত্ররত্ন জাহ্নবীতীরে জ্বলন্ত চিতায় ভস্মীভূত করিয়া দিয়া, শোকাকুলা জননী, ইহ সংসারে নিজ শিশুর জীবনের ছায়ারূপী পালিত পোষ্যমুখ দর্শনে কখনও দগ্ধ-হৃদয় জুড়াইতে পারেন না, সেই প্রকার পূর্ব্বের সে তপ্ত-কাঞ্চন-গঠিত ময়ূর-শরীরে নানাবিধ মাণিক্য-প্রতিফলিত-বর্ণের অপূর্ব্ব সিংহাসনের বিনিময়ে এ ব্যঙ্গাত্মক শিলাসন ভারতবাসীর নয়নে কেবলমাত্র শোক-চিহ্ন।

সুবর্ণ-খচিত কিঙ্খাপে মৌক্তিকঝালর শ্রেণীর আবরিত চন্দ্রাতপতলে বিচিত্র "বারখাম্বা" বেষ্টিত ময়ূর সিংহাসনে উপবিষ্ট ভারতেশ্বর যেন—

কনক আসনে বসি দশানন বলী

যৎকালে 'পাত্রমিত্র সভাসদ' সহ সেই ভূতলে অতুল সভায়, উৎসবদিনে, আম-খাসে বাদসাহগণ ময়ূরাসনে দরবারে বসিতেন, তখন রত্নরাজির রশ্মিপ্রভায় নিশীথে সূর্য্যোদয় হইত এবং বিভাবরী তামসী অঙ্গে ভানুদীপ্তি নিরীক্ষণ করিয়া বিষণ্ণ মনে যেন অনাশ্রয়ে দিল্লীর সুদূর প্রান্তরে একক ঘুরিয়া ঘুরিয়া পথ খুঁজিয়া বেড়াইত।

জুম্মা মস্‌জিদ

"রত্নসৌধ কিরীটিনী" দুর্গ ছাড়িয়া দিনমণির কিরণমালা-শোভিত জুম্মা মস্‌জিদে যখন পৌঁছিলাম, তখন দিবসের কলরব থামিয়া চারিধারে কেবল নীরব শান্তি বিরাজ করিতেছিল, ক্লান্ত আমরা জুম্মার শীতল সোপানে ক্ষণকাল বিশ্রামার্থে বসিলাম। অসময় ভ্রমণে পশ্চিমের দুরন্ত মার্ত্তণ্ড তাপে আমাদিগের মস্তক বড় ব্যথিত করিয়াছিলাম।

হিন্দুর জগন্নাথ দেবমন্দির এবং মুসলমানের জুম্মা, ভারতীয় সৌধ-জগতে দুই অলৌকিক কীর্ত্তি। এমন বৃহৎ অপরূপ শিল্পময় ভজনালয় ভারতে কুত্রাপি আর নাই। রাজেন্দ্র-দুর্ল্লভ প্রেমজাত 'অপ্রতিম অপার্থিব' তাজ সমাধি পরে, এই পবিত্র জুম্মা মস্‌জিদ্ অমূল্য মর্ম্মর প্রস্তরে তুষার ধবল লাবণ্যে রচিত। শরচ্চন্দ্রের নির্ম্মল কৌমুদীহাস্য কঠিন শিলাখণ্ডে সযত্নে

জমাইয়া যেন জ্যোৎস্নায়, বিরহীর বিজন সঙ্গীতের সুখস্বপ্ন তূলিকায়, স্বর্গ-শিল্পী স্বয়ং ধরণীতে অবতীর্ণ হইয়া, ইহার প্রকাণ্ড বরবপুঃ ললিত পাষাণপটে চিত্র করিয়া গিয়াছেন। বহু যোজন বিস্তৃত করিয়া, উচ্চভূমি অধিকার করিয়া, উন্নত গগনস্পর্শী শিরে জুম্মা মস্‌জিদ্ এমনি সগৌরবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে যে, দিল্লী মহানগরীর সর্ব্বত্র হইতে তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়।*

শুভ্র মস্‌জিদ-প্রাঙ্গণ-সরোবরে পূত যমুনাবারি অন্তঃসলিলে বহিয়া অদৃশ্য-খনিত খাতযোগে ধীরে ধীরে আসিয়া থাকে এবং বর্ষাসমাগমে বারি পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

কামিনীর কমনীয় কণ্ঠ ভূষাহারে,
দ্যুতিমান মধ্যমণি যেমন সুন্দর সেইরূপ

বর্ষানীরে উচ্ছ্বসিত এই মানস-সরসী অপ্রতিম শোভা ধারণ করে। নমাজকালীন বাদসাহগণের, মনের নহে, পাপমালিন্য হস্তপদের প্রক্ষালনার্থে ইহার সৃষ্টি। এখনও কতক পানীয় স্বচ্ছ সলিল ইহাতে দেখিয়া আমরা আগ্রহে তাহা চোখেমুখে সিঞ্চন করিয়া দারুণ তৃষ্ণা এবং পথশ্রান্তি দূর করিলাম।

সেকালের সৌভাগ্যদিনে, বিশেষ কোন পর্ব্বোপলক্ষে, বিংশতি সহস্রাধিক মুসলমান নাকি বাদসাহ সহিত জুম্মা মসজিদে একত্র উপাসনা করিত এবং তাহার ভিতর প্রথিত দুই পৃথক পাষাণ মঞ্চে আরোহণ করিয়া সম্রাটগণ পুরোহিত (মোল্লা)-সহ তারস্বরে সাধারণের নিমিত্ত ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতেন। সাজাহান ও বাহাদুরসার হস্তাক্ষর "কোরাণ সরিফে" এখানে প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে। সুবিখ্যাত জুম্মার নির্ম্মাণ কার্য্য পরিসমাপ্ত করিতে প্রায় বিংশতি বর্ষ এবং দশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে।**

"হেন শান্ত সুপবিত্র আশ্রমে" বাদসাহ আরঙ্গজীব দিবসে একবার যখন রাজকীয় সমারোহে দেবারাধনে আসিতেন, সে সময় দিল্লীর সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্ম উৎসাহিত জনস্রোতে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিত, এবং সম্রাট-দর্শনাভিলাষী সচঞ্চল প্রাণীকল্লোল থামাইতে শান্তিরক্ষকও পরাজয় মানিত।

অদ্যকার এই তমসাচ্ছন্ন নীরব জুম্মা মন্দিরে দাঁড়াইয়া ভূতস্মৃতি-জীবিত আমি অতীতের সে দৃশ্যময় স্বজনতা কল্পনার দিব্যচক্ষে আমার চারিদিকে যেন জীবন্তরূপে ভাসমান দেখিতে পাইলাম। সে শোভার কাল্পনিক চিত্র আমার দ্রবীভূত হৃদয়কে মন্ত্রমুগ্ধবৎ করিয়া তুলিল—প্রাচীন দিল্লী—প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ—প্রাচীন রোম, প্রাচীন এথেন্স—প্রাচীন অযোধ্যা, তোমরা আজ কোথায়?

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ-ক্ষিপ্ত সিপাইগণ সদলে জুম্মার পবিত্রশান্তি ভঙ্গ করিয়া তাহাদিগের

---

*"In all Delhi, the highest building is the Jumma Musjeed, towering above every other object, and seen from every part of the city." *Travels of a Hindoo.*

**"The Jumma Musjeed was commenced in 1629, and finished in 1648. It is said to have cost ten lacs of Rupees." *Travels of a Hindoo.*

উন্মত্ত সহবাসে জুম্মাকে হিংস্রক শ্বাপদ-সঙ্কুল ভীষণ অরণ্যে পরিণত করে এবং তাহাকে ধ্বংসপুরে পাঠাইয়া দুরন্ত সিপাইগণকে বিতাড়িত করিবার সময়োচিত রাগান্ধ পরামর্শ ইংরাজ গবর্ণমেন্ট কার্য্যে প্রতিপালন না করিয়া অবশ্যই সমগ্র ভারতবাসীর নিকট অশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

রজনী সন্দর্শনে আমরাও বাসায় ফিরিলাম। "শুভ্র জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীর" নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সুদুর প্রাসাদশিরে কে তখন গাইতেছিল, তা জানি না, কিন্তু তাহার সে বালকণ্ঠ নৈশ নীলাম্বর প্রতিধ্বনিত করিয়া আমার প্রাণের ভিতর প্রবেশ করিল। তাহাতে এক যুগের সুখ দুঃখের অস্ফুটস্মৃতি জাগিয়া উঠিলে, সকল দিনের প্রিয়দৃশ্য বিস্মৃতি ছায়ায় রাখিয়া দিয়া, সেই সঙ্গীতের স্বরস্রোতে আমি কোথায় ভাসিয়া গেলাম, বলিতে পারি না। সে গীত যে না শুনিয়াছে, তাহার জীবনই বৃথা। বৈষ্ণবকবিগণই যথার্থ প্রেমিক।

(সুহই।)

বঁধু কি আর বলিব আমি,
জীবনে, মরণে, জনমে জনমে,
প্রাণনাথ হৈয় তুমি।
তোমার চরণে আমার পরাণে,
বান্ধিল প্রেমের ফাঁসি,
সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া,
নিশ্চয় হলাম দাসী।

চণ্ডীদাস

(ধান্সী।)

রূপ লাগি আঁখি ঝরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পীরিত লাগি থির নাহি বান্ধে।

জ্ঞানদাস

এই অপূর্ব্ব মহাজন পদাবলী—প্রেমগীতে নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার করে, ভাবুকের চিন্তাস্রোতে নব নব ভাব-লহরী তুলিয়া দেয়, এবং প্রবাস-পীড়িত প্রণয়ীপ্রাণে মিলনের স্পর্শমণি ছুঁয়াইয়া যায়, তখন জাগ্রতে কি স্বপ্নে, প্রিয়-সমাগম-সুখানুভবে কল্পনার মানস-মন্দিরে বিরহীর দগ্ধচিত্ত জুড়াইয়া থাকে। প্রেমের এই পূর্ণ-বিকশিত আত্মহারা সঙ্গীত যদিও আমার নিকট—"A voice, a mystery" তবু, আমি সেই অপরিচিত অদৃশ্য গায়ক কিম্বা গায়িকাকে বলি—

O blessed bird, the earth we pace,
Again appears to be
An unsubstantial, fairy place;
That is fit home for Thee.

Wordsworth.

হুমায়ু মাক্‌বারা
(বাদসাহ হুমায়ুনের সমাধি-মন্দির)

আবার তৃতীয় দিবস আহারান্তে আমরা প্রথমেই সম্রাট হুমায়ূনের বিখ্যাত সমাধিস্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। এই পবিত্র শুভ্র সমাধি-মন্দির প্রণয়িনী ভার্য্যার প্রাণপতি-বিয়োগ-শোকের অমূল্য স্মৃতিচিহ্ন।* পঞ্চদশ লক্ষ মুদ্রায় এবং ষোড়শ বর্ষব্যাপী পরিশ্রম-নির্ম্মিত এই হর্ম্ম্য সমাধি মৃত স্বামীর স্মরণার্থ হামিদাবাণু বেগম কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। সেই সুন্দরী ললনার বৈধব্য-কাতর শোকাশ্রু সুদীর্ঘ নিশ্বাস সহ যেন অদ্যাপি ইহার বর্ষীয়ান অঙ্গের চারু শোভা সম্পাদন করিতেছে। কত যুগান্তের কঠোর বিস্মৃতি তাহার লাবণ্যের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তথাপি সতীর পবিত্র নেত্রবারি মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। বাদসাহ হুমায়ুন যেরূপ দুর্দ্দান্ত ছিলেন, তাঁহার সমাধি-অট্টালিকাও তদ্রূপ। নিরেট খিলানময় সুদুর বিস্তৃত দীর্ঘ কলেবরে ঐতিহাসিক যুগের প্রকাণ্ড পাষাণ মন্দির 'মাকবারা' আজিও অভগ্ন এবং সকলের প্রিয় দর্শন। আভ্যন্তরিক প্রাচীরের ললিত কারুকার্য্যের রমণীয়তা এখনও কিছুমাত্র নষ্ট হয় নাই। তবে শূন্যতার আঁধারে কপোত-কপোতী সুখে নীড় বাঁধিয়া শাবক-কূজনে তাহাকে যেন বিহঙ্গমাশ্রম করিয়া তুলিয়াছে এবং রাজপথের অনিবার্য্য ধূলিকণায় তাহার বাহিরের সৌন্দর্য্য আর এক অভিনব কৃত্রিম বর্ণ ধারণ করিয়াছে।

হুমায়ূন বঙ্গমাতার নিকটও অপরিচিত নহেন। তাঁহারা অদ্যাপি প্রতি নিশায় দুরন্ত বালক বালিকাকে নিদ্রিত করিতে যে "হুমো এলো" বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন, সেই"হুমোই" হুমায়ুন নামের অপভ্রংশ এবং তাঁহার সমাধি মোগল প্রাসাদের আদিকীর্ত্তি।

বেগম ললাম হামিদাও প্রাণেশ্বরের সমাধিশয্যার বাম প্রকোষ্ঠে চির-নিদ্রিতা আছেন। তিনি ব্রাহ্মণকন্যার ন্যায় বৈধব্য-জীবন ব্রতাচারে কাটাইয়া অন্তিমে স্বামীর পার্শ্বে শান্তিলাভ করিয়াছেন। লাবণ্য-গঠিত "তাজমহল" যেমন পতিপ্রেমে, এই "হুমায়ু মাক্‌বারা"ও সেইরূপ পত্নীপ্রেমে উৎসর্গীকৃত অমানুষিক জয়স্তম্ভ।

"হুমায়ু মাক্‌বারা" অনতিদূরে অসংখ্য বেগম, সাজাদা, সাজাদি (রাজকুমার, কুমারী) ও

*"The Mausoleum was created at the cost of fifteen lacs of rupees, in sixteen years, from 1554 to 1570".

অন্যান্য রাজপরিবার শোকের অন্ধকার ছায়াস্বরূপ যত্ন-প্রোথিত সমাধিতলে শায়িত রহিয়াছেন। সেই সকল শিল্পময় সমাধিমঞ্চ কালের ভীষণ বজ্রাঘাতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু সে শ্মশান-মৃত্তিকায় শোক-চিহ্ন এখনও জীবন্তভাবে মূর্ত্তিমান। অসংখ্য পুত্র-শোকাতুরা মাতার, পতি-বিয়োগ-বিধুরা কামিনীর এবং স্নেহময়ী সহোদরার শোকাশ্রু-প্লাবিত ভগ্ন পাষাণস্তূপ নিরীক্ষণ করিয়া শোকার্দ্র হৃদয় স্বতঃই দ্রবীভূত হইয়া যায় ও অনেকের পক্ষে অশ্রুনীর নিবারণ করা কঠিন হইয়া উঠে।

পূর্ব্ব-সৌভাগ্যের দিনে এ সকল ভগ্ন সমাধি নিশীথে দীপালোকে ও দিবসে রাজদত্ত পুষ্প-হারে সুসজ্জিত হইয়া মৃতের গৌরব রক্ষা করিত। এখন তাহা শৃগাল কুক্কুরের আবাসস্থান হইয়া উঠিয়াছে এবং ফুলমালার পরিবর্ত্তে নানাবিধ আরণ্য পাদপ নিচয়ে তাহাকে ছায়াময় করিয়াছে। কোন কোন সমাধির সুবর্ণাক্ষর বিলুপ্তপ্রায়, কাহার বা এখনও দু-চারি অক্ষর পড়িতে পারা যায়। আরব্য, পারস্য ভাষায় লিখিত গুণাবলীর অর্থ আমরা মৌলবীর সাহায্যে কতক বুঝিলাম। একটী সপ্তদশ-বর্ষীয়া বালিকার অলৌকিক প্রতিভাময় দেবত্ব-কাহিনী, তাঁহার জনকের শোকাভিভূত হৃদয়ের স্নেহপূত পবিত্র ভাষায় সংস্কৃতে রচিত পড়িয়া চক্ষে জল আসিয়াছিল। সে গদ্যকাব্য যেন অপূর্ব্ব ছন্দময়ী কবিতার স্বর্গীয় সৌরভে, ছায়াপথে তারকাবৎ ফুটিয়া রহিয়াছে। ছায়াপথ আলোকিত করিয়া সে নাক্ষত্রিক প্রতিভা আজিও দর্শকপ্রাণে রশ্মিকণা প্রতিভাত করিতেছে। তাহা অনন্ত, অমর, অবিনশ্বর দীপ্তিপূর্ণ।

শ্মশান

সেই রাজকীয় অর্দ্ধভগ্ন শ্মশান প্রাঙ্গণ ছাড়িয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে আমরা আর এক ভীষণতম শ্মশানে আসিয়া পড়িলাম। পথ ভুলিয়া হঠাৎ যে এখানে আসিয়াছিলাম এমন নহে, "অনঙ্গপাল দীঘি" দেখিতে এ প্রেতভূমি অপরিহার্য্য। এক শ্মশান পরিহার করিয়া অন্য শ্মশানে আসিলে মনে যে কোনরূপ নূতন শোকানুভব হয় না তাহা কে বলিবে? মৃত্যু-ছায়া প্রতিবারই ঘনীভূত অন্ধকারময় ও সমভাবে সহানুভূতি পাইবার যোগ্য। যাহারা গিয়াছে তাহারা ত পরিজনের হৃদয়ের শান্তি—জীবনের সুখাশা এবং চিরকালের আনন্দ লইয়া স্মৃতির পরতে পরতে শোকাগ্নি জ্বালাইয়া অনন্তে মিশাইয়াছে। তাহাদের বিনিময়ে হাহাকার, অশ্রুবারি এবং অবিরাম দীর্ঘশ্বাস রাখিয়া গিয়াছে মাত্র। মৃত্যুময় শ্মশানক্ষেত্র, ভবনদীর তীর, অন্তিমের বেলাভূমি নিত্যই শোকাচ্ছন্ন।

এখানে অগম্য সমাধি স্তূপাকার ভগ্ন প্রস্তরখণ্ডে কেমন ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে। ভূত প্রেত পিশাচ যেন দিবসেই ইহার চারিদিকে বিকট হাস্যে নৃত্য করিয়া বেড়ায়। জনপ্রাণীর সাক্ষাৎ নাই, কেবল—

পোড়া হাড় ছড়া ছড়ি
মরা নিয়া কাড়া কাড়ি
করিতেছে শ্যালের বিতান

এই ধ্বংসপ্রায় শ্মশানে সংখ্যাতীত অগণ্য মৃত শব চির সমাধিতলে ধূলিশয্যায় শয়ন করিয়াও কালের নিষ্ঠুর হস্তের উৎপীড়ন হইতে শান্তিলাভ করিতে পারে নাই। সময়ের নির্ম্মম অত্যাচার তাহাদিগের বিরাম সমাধি ভঙ্গ করিয়া চলিয়া গিয়াছে! পরবর্ত্তী জীবের নিকট পরিচয় দিবার কোনই চিহ্ন রাখিয়া যায় নাই। কি জানি কেন, এ ভয়ঙ্কর শ্মশান প্রাঙ্গণে পড়িয়া আমার হৃদয়ের অন্তঃস্তল পর্য্যন্ত কাঁপিয়া গেল, স্তম্ভিত হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম, আত্মহারা আমি একপদ অগ্রসর হইতে পারিলাম না। চক্ষের সম্মুখে মৃত্যুর শরীরী করাল ছায়া ভীষণ হইতে ভীষণতর আকৃতিতে যেন ছুটাছুটি করিতে লাগিল। সে অপ্রত্যাশিত ভয়াল দৃশ্যে শৈশব-সুখ-স্মৃতি যৌবনের আশালোক ও আজিকার কল্পনাময় প্রতীক্ষায় ভাবীকাল কোথায় যে আঁধারে ডুবিয়া গেল তাহা বলিতে পারি না। কেবল অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ জুড়িয়া ভীমরূপী শ্মশান সৈকত, জীবনের পরিণাম, ও মনুষ্যের শেষদিন আসিয়া দেখা দিল। সে জীবন আজ আছে, কাল এই শ্মশান-মৃত্তিকায় জ্বলন্ত চিতানলে নির্ব্বাপিত হইবে, তাহা লইয়া এত অহঙ্কার এত গর্ব ও এত বাড়াবাড়ি কি ভাল? বহুদিনের কথা, ঘটনাবশতঃ একবার ভারত স্বাধীনতার শেষ লীলাভূমি পলাসী প্রান্তর দেখিতে গিয়াছিলাম, তখন মহামারি ম্যালেরিয়া জ্বরে রাঢ় অঞ্চল উৎসন্ন যাওয়াতে অসংখ্য জীর্ণ শীর্ণ পীড়িত ব্যক্তি আত্মীয় স্বজনের মৃত শরীর পাষাণে বুক বাঁধিয়া ভাগীরথীর তীরে তীরে সৎকার করিতেছিল এবং জাহ্নবীর তটভূমি শবদাহের জ্বলন্ত চিতাধূমে ও বিয়োগ বিধুর মাতা কন্যা এবং পত্নীর হাহাকার ক্রন্দন রোলে এমন ভয়ানক হইয়াছিল যে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনকালে সেই হুহু শব্দ গর্জ্জিত শ্মশান জীবনের চারিদিকে দেখিয়া দেখিয়া কিশোর হৃদয় যেরূপ কাতর ও অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল, তাহারই সঙ্গে এ ছিন্নভিন্ন অনার্য্য সমাধি প্রাঙ্গণের সাদৃশ্য দর্শনে কেমন অবাক হইয়া গেলাম, শোক দুঃখের স্মৃতি কখনও একেবারে মুছিয়া যায় না—সেই ত দুঃখ। পরলোক বিশ্বাসী ধার্মিক হিন্দুর নিকট শ্মশানে সৈকত যতই সুখমার্গ হউক না কেন, তাহার প্রত্যক্ষ সংশ্রব শান্তিপ্রদ নহে। যদিও—

চিরদিন বিহারিতে ইহ মর্ত্তলোকে
চাহি না আমার, যবে প্রাচীন দশায়
দেহবাস ত্যজে প্রাণ, কে দোষেরে তোকে,
জরাজীর্ণ স্থবিরের তুই রে সহায়।
ইন্দ্রিয় আয়ত্ত নয় শরীর বিকল,
অশীতিপরের বটে মরণ মঙ্গল।

বাউলি
অনঙ্গপাল দীঘি

রাজা দ্বিতীয় অনঙ্গপালকৃত "বাউলি" লম্বায় ১৬৯ ফিট এবং ১৫২ ফিট গভীর ও দেখিতে এক প্রকাণ্ড ব্যাপার। চতুর্দ্দিকে ভগ্ন অট্টালিকা ও পরিত্যক্ত ভূমি, তাহার মধ্যস্থলে এই সুবৃহৎ জলাশয় অদ্যাপি পূর্ণ সলিলে নিদাঘ নবজলধর শোভায় টলমল করিতেছে। মধ্যাহ্নে তাহার বাঁধা ঘাটে স্নানার্থ যাত্রীগণে এত জনতা হয় যে তাহাকে "যোগের গঙ্গাস্নান" মধ্যে গণ্য কবা যাইতে পারে। শুনিলাম দিল্লীর দূর পল্লীস্থ অসংখ্য নরনারী এই উপাদেয় শীতল জল পানে আজিও জীবন ধারণ করে এবং নিত্য নিয়মিতরূপে এখানেই তাহারা অবগাহন করিতে আইসে, ইহার বারি এমন কাচবৎ স্বচ্ছ, দুয়ানি কি সিকি ভিতবে নিক্ষেপ করিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক বালিকাগণ অনায়াসে নিমগ্ন হইয়া তাহা উত্তোলন করে। আমাদেরও গাইড মহাশয়—এ কৌতুক দেখাইবার জন্য কয়েকজন শিশু জুটাইয়াছিলেন, কিন্তু সুকুমারমতি বালকদিগের প্রাণেব বিপদাশঙ্কায় আমি সে ক্রীড়া দর্শনে স্বীকৃত হই নাই। মহম্মদ ঘোরী দ্বিতীয় অনঙ্গপাল পুত্র তৃতীয় অনঙ্গপালের সময় দিল্লী অধিকার কবিলে রাজ পরিবার "লালকোট" দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে, এখনও সেস্থান "কেল্লারায় পৃথ্বরাজ" নামে পরিচিত।

আজবঘর
মিউজিয়াম

শ্মশান স্মৃতির তামসী নিশা কুস্বপ্নে অতিবাহিত করিয়া আবার আশাময় নবোদিত সূর্য্যরশ্মির লাবণ্য-ছটায় "ভ্রমণ" কাব্যের চতুর্থ দিন সমাগমেই আমরা "আজবঘর" দেখিতে গেলাম।

ভারতেশ্বরীর প্রমোদ উদ্যানে (Queen's Gardens) লতাপুষ্প তরুরাজি পরিবেষ্টিত এই সুরম্য প্রাসাদ "আজবঘর" তৎকালে অবরুদ্ধ থাকায় আমরা তাহার দ্বার উদঘাটন পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা না করিয়া কেবলমাত্র বাহ্য শোভা সন্দর্শনে পরিতৃপ্ত মানসে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করি।

বাদসাহদিগের পূর্ব্ব সম্পদের নিদর্শন স্বরূপ মণিময় কারুকার্য্যের বলয়, শিরস্ত্রাণ এবং জরির বিনামা ও বেগমগণের নত "হয়কল" "বাজুবন্দ" ও অঙ্গুরীয় প্রভৃতি দিল্লীর "মিউজিয়ামে" দর্শনীয়রূপে রক্ষিত আছে নাকি, শুনিলাম।

কুতবমিনার

চিত্রময়ী মায়ানগরী দিল্লী মহাকাব্য স্বরূপ, সংক্ষিপ্ত জীবনের গণনীয় দিবসে তাহা পাঠ সমাপ্ত করা বড় আয়াসসাধ্য কার্য্য। এ কাব্যের " পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে" যে দীপ্তিমান অপ্রতিম মাধুরী তাহা ভাষায় প্রকাশিত হয না, কারণ বিষয় মহৎ, ভাষা দরিদ্র, সুতরাং কি আর বলিব? দিল্লীর যাহা কিছু দর্শনীয় সবই ত দেখিলাম কিন্তু ভগ্ন স্বাস্থ্য নিবন্ধন জগৎ বিখ্যাত "কুতবমিনার" দর্শনসুখে বঞ্চিত আমি দূর হইতে কেবল তাহার রমণীয় দৃশ্যে নয়ন তৃপ্ত করি, নীলাম্বরস্পর্শী উচ্চতম প্রাসাদশির হইতে তাহাকে অস্তগামী ভানুকরে নিরীক্ষণ করিয়া হৃদয়ে যে অলৌকিক ভাবোদয় হইয়াছিল, এখন যেন তাহা কেমন অস্পষ্ট ছায়াময় সুখস্বপ্নবৎ বোধ হয়। দূরতা প্রযুক্ত বাস্তবিকতাও অদ্য নিস্ফল স্বপ্ন হইয়া গিয়াছে।

"কুতবমিনার" সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা ৫ই ফাল্গুনের "সুরভি পতাকা" হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"কুতবমিনার শিল্প জগতে অদ্বিতীয় বিজয়স্তম্ভ। ইহা অধুনা ২৩৮ ফিট উচ্চ, কথিত আছে এককালে ইহার উচ্চতা ৩০০ ফিট ছিল, কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না, ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে মিনার ২৫০ ফিট১১ ইঞ্চ উচ্চ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল। জগতের নানাদেশে নানাবিধ অত্যুচ্চ স্তম্ভের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, এলেকজন্দ্রিয়া নগরে পম্পের স্তম্ভ ; কেরোনগরে হুষণের মসজিত ; রুষ-রাজধানী সেন্টপিটসবর্গে এলেকজন্দ্রিয়ান বিজয়স্তম্ভ—এই সমস্ত স্তম্ভের কথা পাঠক ইতিহাসে পাঠ করিয়াছেন ; কিন্তু দিল্লীর কুতব-মিনারের সহিত তুলনায় ঐ সমস্ত অসামান্য স্তম্ভও অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়।

মিনারের তলদেশ একটী বিশাল বহুভুজ ; ইহাতে সর্ব্বসমেত ২৪টী ভুজ। সেগুলি সর্ব্বসমেত ১৪৭ ফিট বিস্তৃত। ভুজসমূহের শিরোদেশে স্তম্ভ উন্নত, তাহা ক্রমে সূক্ষ্মাগ্র হইয়া অনন্ত নভোমণ্ডলে উত্থিত হইয়াছে ; যেদিন যে মহাত্মা এই অদ্ভুত স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই দিন অনন্ত কালসাগরে কবে বিলীন হইয়াছে ; কিন্তু কুতবমিনার মানব গৌরবের অবিনশ্বর নিদর্শনরূপে সুদীর্ঘ কালের জন্য উদ্যত রহিয়াছে, রাজার পর রাজা পৃথ্বীরাজের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ভারতের অদৃষ্ট চক্র পরিচালনা করিয়াছেন, আবার অখণ্ডনীয় বিধিলিপির অনুসারে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া অনন্ত কালসাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন ; আফ্গান, পাঠান, তাতারীয়, মোগল, দুরাণী কোথায়? অতীত সাক্ষী ইতিহাসের প্রতিপত্রে তাহাদের অতীত গৌরব কাহিনী দেখিতে পাওয়া যায়; দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তাহারা সকলেই এই বিরাট স্তম্ভের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক আত্মজীবনের অকিঞ্চৎকরত্ব ভাবিয়া একদিন না একদিন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে?

কুতবমিনার পাঁচটী তলে বিভক্ত; এক একটী তল এক একটী পাথরের বারাণ্ডা দ্বারা বেষ্টিত। তৃতীয়তল পর্যন্ত ইহা সুন্দর আরক্ত প্রস্তরে গঠিত; তদূর্দ্ধ ভাগ ধবল মর্ম্মর নির্ম্মিত। দূর হইতে এই বিচিত্র স্তম্ভের শোভা অতীব মনোহর। ইহার চতুর্দ্দিকে অসংখ্য অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ ভূতলে বিলীন হইবার উপক্রম করিতেছে, মসজিদের পর প্রাসাদ, প্রাসাদের পর

অট্টালিকা, তাহার পর প্রাকার কালের কঠোর লৌহদণ্ড প্রহারে চূর্ণিত হইয়া যেন ইহার চরণতল চুম্বন করিতেছে! দূরে সূর্য্যতনয়া কালিন্দী ভারতের শোক সঙ্গীত গাইতে গাইতে প্রবহমান হইয়াছে।

কথিত আছে, কোন হিন্দু নরপতি স্বীয় দুহিতার যমুনা দর্শনের নিমিত্ত এই প্রকাণ্ড অট্টালিকা স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু একথা কতদূর সত্য তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারা যায় না। কুতবমিনারের স্থাপনকর্ত্তাকে এবং কোন [শিল্পীই] বা ইহা নির্ম্মাণ করিয়া যান; অদ্যাপি তৎসম্বন্ধে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্তম্ভের চতুর্থতলের দ্বারদেশে খোদিত আছে "শ্রীবিশ্বকর্ম্মপ্রসাদাৎ চাহগুদেব পালস্য পুত্রেণ শ্রীমন্নান পালেন রচিত।" নানপাল এই অদ্বিতীয় অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া শিল্পজগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। কুতবমিনার যতদিন জগতের সমস্ত অট্টালিকা ও স্তম্ভের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করিবে ততদিন প্রত্যেক ভারতবাসী ভক্তিকুসুমাঞ্জলির দ্বারা স্থপতি-বিদ্যা-বিশারদ নানপালের স্মৃতিচিহ্ন পূজা করিবে। ভারতীয় পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে কুতবমিনার সম্বন্ধে দুইটী মত দেখিতে পাওয়া যায়। একদল বলেন ইহা হিন্দু নৃপতি দ্বারা স্থাপিত; অপর দল মুসলমানকে ইহার স্থাপয়িতারূপে সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন।" (সুরভি পতাকা)

স্বদেশাভিমুখে

অতীত সৌভাগ্যের স্মৃতিরূপী প্রাসাদময় দিল্লী ও আর্য্য বীরত্বের পবিত্র শেষ রেখা ইন্দ্রপ্রস্থ পরিহার করিতে মন যে দ্রবীভূত হয় নাই এমন নহে, তবুও যেন এই পরিত্যক্ত সুরপুরী দর্শনে অমিশ্রিত আনন্দ উপভোগ অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই। তাহার প্রত্যেক শিলাখণ্ডে, ধূলিকণায় ঐতিহাসিক যুগের গৌরবচিহ্ন জাগ্রত দেখিয়া, হৃদয় কেমন ব্যথিত হইয়া যাইত। হতভাগ্য মনুষ্য সুখাপেক্ষা শান্তির ভিখারী, তাই এ মহানগরী ছাড়িতে এত অধীরতা হইয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট প্রভাতেই আমরা তাহার নিকট বিদায়—হয়ত চিরদিনের তরেই বিদায় গ্রহণ করিলাম। কিন্তু অনিশ্চিত জীবনের ভবিষ্যৎ অজ্ঞাত অন্ধকারে নিহিত থাকায় অপ্রসন্না ভাগ্যদেবী আবার কবে যে কোথায় লইয়া ফেলিবেন তাহা অদ্য কেমন করিয়া বলিব ?

হায় সেই ত সকল,
পূর্ব্ব গৌরবের স্থল,
এই ত ভারতভূমি প্রিয় নিকেতন ;
এই সেই পুণ্যস্থান শোভার সদন।
কেনরে আঁধারময়,
কেন অচেতনপ্রায়,
নাহি কেন রবিকর ভারত আগারে?

নির্জ্জীব ভারত কাঁদে দর দর ধারে।
সেই বাট সেই মাঠ
সেই সরোবর ঘাট,
সেই সমুদায় আজ করি দরশন,
তবে কেন দেখি সব বিষাদে মগন।
সেই রবি সেই শশী,
সেই দিবা সেই নিশি,
সকলি নিয়ম মত চলেছে তেমন
কেন আর্য্যসুত সব মোহে অচেতন!
বহিতেছে সমীরণ,
ফুটিছে কুসুমগণ,
হাসিছে তারকা ওই সুনীল অম্বরে,
গাইছে বিহগকুল মোহিত অন্তরে।
চলিতেছে ভাগীরথী,
বহিছে যমুনা সতী,
মৃদু মৃদু কল কলে নিনাদ করিয়া,
উন্মাদিনী দুই বোন যৌবনে মাতিয়া।
হিমালয় বিন্ধ্যগিরি,
মস্তক উন্নত করি—
গগন পরশি গর্ব্বে আছে দাঁড়াইয়া
ভারত গৌরব কেন গেলরে নিবিয়া।
আসিছে বসন্ত কাল
বিস্তারি রূপের জাল,—
সকলি ত রহিয়াছে পূর্ব্বের মতন,—
শরতের শশী আসি হাসায় ভুবন।
তবে কেন নিদ্রাগত
ভারতবাসীরা যত,
জাগে নাকি পূর্ব্ব কথা কাহারো অন্তরে,
না ছিঁড়িবে মোহপাশ জাগিয়া অচিরে।
জ্ঞানমান বীর্য্য বল
কোথায় সকল বল,
পিতা পিতামহ কীর্ত্তি ভুলিলে কেমনে,
কলঙ্ক কালিমা কেন ঢালিলে জীবনে,

নাহি শাস্ত্র আলোচনা,
নাহি ষড় - দরশন,
অনন্ত কালের গ্রাসে গিয়াছে সকল,
ভগ্নপ্রায় রহিয়াছে গৌরব কেবল।
অযোধ্যা হস্তিনাপুরি,
ভগ্নাশিলা সারি সারি
রহিয়াছে পড়ে আজ শোক নিদর্শন
হায় ! মানবের কীর্ত্তি নশ্বর এমন !
চাহি না দেখিতে আর
সেই সব শোকাধার,
আজি যাহা দেখিতেছি ভারত ভবনে,
দেখিলে শোকের শেল বাজে এ জীবনে।
ভঙ্গ হোক কীর্ত্তিচয়
একেবারে হোক ক্ষয়,
এক বিন্দু অশ্রু নাহি ঝরিবে কখন
স্মৃতিসহ সমুদায় দিব বিসর্জ্জন।
ভুলে যাই সমুদায়
নিষ্ফল স্বপন প্রায়,
গভীর তরঙ্গ তুলি তুমি ভাগীরথি !
ভারতের হতকীর্ত্তি নাশ, স্রোতস্বতি,
সহে না এ সব জ্বালা;
এই ভগ্ন কীর্ত্তিমালা,
জাগাইতে পূর্ব্ব স্মৃতি বিষাদ ভাণ্ডার,
ভারত হৃদয়ে যেন থাকে না গো আর।
এই সব নিরখিয়া
ফাটিয়া যাইছে হিয়া,
তাই বলি সমুদায় হোক ভস্মময়,
পুড়িয়া ভারতকীর্ত্তি হোক শীঘ্র ক্ষয়,
ওহে রবি শশী তারা,
তিমির নাশক যারা,
ভারতে আসিয়া কর করো না বর্ষণ,
গভীর তিমির জালে লুকাও কিরণ।
হতবীর্য্য, হতবল,

নির্জ্জীব পতঙ্গদল
কাঁদিছে ভারতমাতা বক্ষেতে লইয়া,
শত স্রোতে অশ্রুধারা যাইছে বহিয়া,
সহে না. সহে না আর,
বিষাদের চিরাধার,
দেখিব না চক্ষু মেলি কীর্ত্তি নিদর্শন
কালি যেন সকলই হয়রে স্বপন।

আর্য্যাবর্ত্তে বঙ্গ-মহিলা (২য় প্রস্তাব) *

বক্‌সার

এই সেদিন দিল্লী পান্থশালায়, অদ্য আবার বক্সার,—ডুম্‌রান মহারাজ ভবনে আমরা অতিথি। কুসুমকানন পরিশোভিত পুণ্য-প্রবাহিণী ভাগীরথীর উপকূলে মহারাজের রমণীয় উদ্যানগৃহে সাব্‌ডিভিসান আফিসার বাস করেন। সরকার বাহাদুর অতি সামান্য অর্থে তাহা ভাড়া লইয়াছেন। এমন সুন্দর সমুদায়, ঠিক যেন প্রকৃতিব স্বপ্নরাজ্য। বাঙ্গালার সহিত তাহার আকৃতিগত সাদৃশ্য দেখিয়া আমার আরও ভাল লাগিত। লতা, পল্লবে, ফুলে, ফলে এবং অবিরাম নিনাদিত জাহ্নবীর সঙ্গীত তরঙ্গভঙ্গে ও দীর্ঘ তরুরাজির নবপল্লবিত শাখায় শাখায় বালকণ্ঠ পাপিয়ার মধুর ললিত তানে কেমন এক অভিনব সৌন্দর্য্য উচ্ছ্বাস চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিতেছে। সে অপার্থিব শোভার কণিকামাত্র অনুভবে কল্পনা-প্রিয় হৃদয় এমনি মুগ্ধ হইয়া যায়, যে সবটা একত্র উপভোগ করা হয় না। প্রিয়জনের সৌন্দর্য্য যেমন একসঙ্গে নয়ন ভরিয়া দেখিবার সৌভাগ্য কখনও প্রেমিকের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, সে রূপের সে অঙ্গে যখন নেত্র নিপতিত হয়, মোহিত মন তাহাতেই বিভোর হইয়া যায়, প্রত্যেক অবয়বের নূতন পৃথক সত্তা ভোগ করিবার শক্তি থাকে না, এও যেন তেমনি।

দেখিতে না দেখিতে কোথায় দিয়া সে সপ্তাহ চলিয়া গেল, তাহা ত অনুমানও করিতে পারিলাম না। সে স্বপ্নমাখা সাতদিন আমার নিকট সুখের এক মুহূর্ত্ত এখন। জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীর অবসানে নিদ্রাভঙ্গে শুইয়াই মুক্ত বাতায়নপথে পতিত-পাবনী জাহ্নবী দর্শনে যেন জীবন সার্থক হইত। আবার প্রবাস-সন্তাপহারী ও নিত্য বাঞ্ছিত সেই প্রিয়পাত্র, প্রত্যহ প্রভাতে হাস্যসখী প্রিয়তমা সখীর ন্যায় আমাকে আলিঙ্গন করিত, স্বদেশের হৃদয়ময় স্নেহ বিদেশের এককতাকেও সুখময় করিত এবং প্রতি সমগ্র দিনের মাঙ্গলিক পূর্ব্বসূচনা বলিয়া আমার নিকট প্রতীত হইত।

---

* প্রসন্নময়ীর আর্য্যাবর্ত্ত সংক্রান্ত মূল লেখায় প্রথম প্রস্তাবের কোনও উল্লেখ নাই।

দিবাভাগে গবাক্ষদ্বারে আনমনে দাঁড়াইয়া সেই মধ্যাহ্নের তীব্র রবিকরে ক্ষেপনী-বিক্ষিপ্ত কল্লোলিনী জাহ্নবী সলিলে রজত-রশ্মির লহরী লীলায় জীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কোথায় ভাসিয়া যাইত। সেই ঐন্দ্রজালিক অপূর্ব্ব দৃশ্য, সে কবিত্বের পূর্ণ বিকাশ এবং পবিত্রতার উচ্ছ্বসিত ভাব কেবল ভাগীরথীর পবিত্র প্রাণেই সম্ভবে। যখন দিনমণির অস্তাচল গমনে, সিন্দূর-শোভায় চারিদিক লোহিত হাস্যে চিত্রিত হইত, তখন গঙ্গাতীরে মলয়ানিল সেবনে, স্বাস্থ্যের পূর্ণতা লাভে জীবনের অতীত বৎসর যেন পুনর্লব্ধ হইত। সন্ধ্যা সমাগমে, নিদাঘালয়ে (Summer Home) চিন্তার বিশ্রামে, "জ্যোৎস্নার শ্বেত মোহে,'—আশা স্বপ্নময় সুখানুভবে, অজ্ঞাতে কোথায় দিয়া যে বিভাবরী দর্শন দিত তাহা আমি ত স্মরণ করিতে পারি না।

গভীর নিশীথে সেই নিকেতন প্রান্তে দাঁড়াইয়া চন্দ্রকর-বিভাসিত জাহ্নবীর উথলিত নৈশশোভা সন্দর্শনে এবং পরপারের শিবমন্দির তটলগ্ন তরণী নিচয়ের নাবিকগণের সবল সঙ্গীত (লক্ষ্ণৌ ঠুংরি) শ্রবণে, আমাতে আমি কতবার হারাইয়া গিয়াছি। যে দেশে এমন মহিমাময়ী ভাগীরথী নিত্য প্রবাহিতা, শির উপরি এই শশি-মাখা তারকিত অনন্ত নভোমণ্ডল, আশেপাশে প্রকৃতির এত মুক্ত সৌন্দর্য্যরাশি এবং প্রত্যেক ভাবুক প্রাণ তাহা উপভোগ করিতে চির সৌভাগ্যশালী, সে দেশে জন্মিয়াছি বলিয়া কেন অদ্য বিলাপ করিব! কি জানি অন্যত্র সুবর্ণ সিংহাসনে রাজরাজেশ্বর হওয়া অপেক্ষা গঙ্গাতীরে পর্ণকুটীরবাসী হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে হয়।

জেলা না হইয়াও বক্সার একটী ক্ষুদ্র সহর। রাজপথ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও প্রস্তরময়। পূর্ব্বকালের সৈনিক নিবাস বাঙ্গালোগুলি অতি পরিপাটী, আধুনিক উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীগণ তাহাতেই বাস করেন, ভাড়া অতি সুলভ। নানাবিধ আহারীয় দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, কিছুরই অভাব নাই। স্কুল, ডাকঘর ও রেলগাড়ী প্রভৃতি সভ্যতার অংশরূপে যাহা যাহা মনুষ্যের প্রয়োজনীয়, তাহা সব আছে। দুইজন হাকিম ও একজন মুন্সেফ এই সাবডিভিশনের বিচারকার্য্যে নিয়োজিত থাকেন।

এখানকার প্রসিদ্ধ সরকারী অশ্বশালে বহুবিধ অশ্ব সুশিক্ষিত করিয়া নানাদিকে প্রেরিত হইয়া থাকে। এমন বৃহৎ অশ্বালয় ভারতবর্ষে আর নাই। দস্যুভয় এখনও এখানে বিলক্ষণ আছে। ভোজপুরীরা প্রায় অধিকাংশ ডাকাত। কোন একজন বড় ঘরানা নাকি গোপনে তাহাদিগের সহায়তাও করেন। ব্রিটিশ সুশাসনের অধীনেও প্রসিদ্ধ ডাকাত তাঁতিয়া ভিলের ন্যায় সুদক্ষ ডিটেকটিভ পুলিসের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া থাকেন, কেহ কেহ এইরূপ মনে করে।[১১]

দ্বিতীয় প্রস্তাব* (বক্‌সার)

বক্সার ঐতিহাসিক স্থান বিশেষ, এখানে অনেকগুলি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পলাসি ক্ষেত্রে প্রথম

---

* ইহার প্রথমাংশ "নব্যভারতে" প্রকাশিত হইয়াছিল।

ও হিন্দুস্থান প্রবেশের পথ পরিষ্কৃত করিতে বক্সারে দ্বিতীয় বার যুদ্ধে যে সন্ধিপত্র লিখিত হইয়াছিল, তাহাতে সম্রাট সাআলম্‌কারা, এলাহাবাদ ও দোয়াব, সুজাউদ্দৌলা অযোধ্যা, এবং ইংরাজগণ বঙ্গ বেহার ও উড়িষ্যা প্রাপ্ত হন। নবাব কাশীমআলি খাঁর বাসস্থানের শেষ চিহ্ন অদ্যাপি এখানে দেখিতে পাওয়া যায়।[১১] উচ্চতর ভূমির উপর বক্সারের বিখ্যাত বিখ্যাত কেল্লা বিদ্যমান্ ছিল। সে সকল ইতিহাসের কথা অধিকাংশ ব্যক্তিই অবগত আছেন।

হিন্দুদিগের দর্শনীয় ঋষি বিশ্বামিত্রের পুণ্যময় তপোবন এখানেই ছিল। শ্রীরামচন্দ্র বিশাল হরধনু ভঙ্গ মানসে অযোধ্যা হইতে গমনকালীন ঐ তপোবনে নিশাযাপন করিয়াছিলেন। ইহারই অনতিদূরে তাড়কা রাক্ষসীর বন ও সীতানাথ তাড়কা নিধন করিয়া, যেখানে সেই রাক্ষসীতনু নিক্ষেপ করেন, তাহা "তাড়কানালা" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দুরন্ত রাক্ষসী তাড়কা-হত্যা পরে, রঘুবীর রামচন্দ্র পুণ্যবতী জাহ্নবী স্নানে পবিত্র কলেবর হইয়া, বক্সারে যে শিবপূজা করিয়াছিলেন, সেই "রামেশ্বর শিবলিঙ্গ" আজিও আছে। প্রবাদ এই, নারীগণ কামনা করিয়া, এ শিবের মস্তকে বারিসিঞ্চন করিলে, পরকালে নাকি রামের ন্যায় অজেয় বীর পতি প্রাপ্ত হন। আশা করি, কামনার এই রামচন্দ্র, প্রিয়তমা পত্নীকে আর বনবাসে পাঠাইয়া বীরত্ব দেখান না।

এখানকার সেন্ট্রাল জেল অতি প্রকাণ্ড প্রাচীর বেষ্টিত ও রমণীয় পুষ্পোদ্যানে সুশোভিত। ইংরাজ ফিরিঙ্গী অপরাধীগণই ইহার প্রধান অধিপতি। এটা কারাগাররূপী রাজপ্রাসাদ ও স্বাস্থ্য-নিকেতন। কতক ইংরাজ এবং বহুসংখ্যক ফিরিঙ্গী গুণনিধিরা এদিকে শ্বশুরালয়ে "জামাই ভোজনের" সুখে উদর পরিতোষ-পূর্ব্বক পূর্ণ স্বাস্থ্য উপভোগে "ছাতি লাঠি" সম্বলিত জীবনের চিরদারিদ্র্য ভুলিয়া যায়। কিন্তু অন্যদিকে, জীর্ণ শীর্ণ অর্দ্ধভুক্ত হতভাগ্য "নেটিভ" বন্দীরা "ঘানি" টানিয়া অকালে অন্তিমের পথে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে থাকে।

উদার সাম্যনীতি এই প্রকারই! রাজ্যে যাহাই হউক, ভগবানের নিকটে জাতিগত বর্ণভেদ নাই। সেখানে শ্বেত কৃষ্ণ "একই মূল্য বহন করে"।

চৈত্র মাসের প্রথমেই এখানে অসহনীয় উত্তাপ। বেলা এক প্রহর অতীত হইতে না হইতে এমন অগ্নিবৎ ঝটিকা বহিতে থাকে যে, তাহাতে লোকজন বাহির হইতে পারে না। সে বায়ুর সহিত আবার অসীম ধূলিকণা মিশিয়া চরাচর যেন অন্ধকার করিয়া ফেলে। কৃষক এ সময় ক্ষেত্রে পরিহার করিয়া যায় ও শেষ রাত্রি হইতে প্রভাতকাল পর্য্যন্ত বাহিরে কর্ম্ম করিয়া থাকে মাত্র। দিবাভাগে পর্ণকুটীরে কোনরূপে দিনাতিপাত করে।

এ অঞ্চলের "আঁধি" এক ভয়ানক ব্যাপার। তাহার সম্মুখে পড়িলে, কাহারও আর নিস্তার নাই। সে দিগ্ব্যাপী ধূলারাশি যখন সজোরে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া চলিতে আরম্ভ করে, তখন কে কোথায় আশ্রয় লইবে, তাহা ভাবিয়া পায় না। এই এক আশ্চর্য্য যে, পশ্চিমের অগ্নিময় উত্তপ্ত বাতাসে জল রাখিয়া দিলে, তাহা তুষারনিভ শীতলতা প্রাপ্ত হয় এবং সেই

স্নিগ্ধ বারিপানে যেন সর্ব্বাঙ্গ জুড়াইয়া যায়। উপাদেয় ইন্দারার সলিল ও স্বাস্থ্যকর বায়ু, বঙ্গ-বাসীর ম্যালেরিয়াগ্রস্ত শরীরকে যেন পুনর্জ্জীবিত করিয়া তুলে।

গ্রীষ্মকালে মক্ষিকার উপদ্রবে দিবসে আহার করা এদিকে একটু মুস্কিল কাণ্ড; তবে, রুটি ও "ছাতুখোরের" দেশ, সেই যাহা সুবিধা।

আরা

নানাবিধ প্রতিকূল ঘটনায় ও দারুণ অসুস্থ ভগ্ন শরীরের জন্য, আরা আগমনের প্রথম স্মৃতিটা তেমন সুখকর নহে। একে প্রবাস, তাহাতে আবার ভদ্রলোকের বাসযোগ্য গৃহাভাব, কাজে কাজেই সপ্তাহখানেক আমরা বড় অব্যবস্থিতভাবে একরূপ পান্থশালায় কাটাইয়াছিলাম, তারপর, আরার প্রান্তভাগে একটী ক্ষুদ্র বাগান-বাটী ভাগ্যে মিলিয়া গেল। চারিদিকে রম্য পুষ্পোদ্যান ও বিবিধ প্রকার সুরম্য ফলময় বৃক্ষরাজি, এবং তাহার সম্মুখে রাজপথ ও পশ্চাৎভাগে প্রীতিকর কৃত্রিম সরিৎ (কেনাল) থাকায়, আমাদের ছোটখাট বাসস্থানটি দিব্য সুখ-প্রদ ছিল। অনেক সময় কল্পনা ও স্মৃতিতে গত জীবনের ঘটনাগুলি কেমন হৃদয়রঞ্জন বোধ হয়। অতীতের সেই "সব বর্ত্তমানে" এবং অদ্যকার সেই "অতীতে" কত প্রভেদ! প্রাণে যাহা ছিল, সবই তেমনি আছে, তবু কি যেন নাই, প্রতিকার্য্যে এমনই একটী অভাব ও শূন্যতা; তাই বলিতেছিলাম, বিগত জীবনের স্মৃতি বড় মনোহর।

আরা সহর হইয়াও তেমন দীর্ঘায়তন নহে, এবং সিপাহি-বিপ্লবের একটী প্রধান রঙ্গ-ভূমি বলিয়াই উল্লেখযোগ্য, নতুবা এখানে এমন কিছুই নাই, যাহাতে মনুষ্যচিত্ত স্বতই আকৃষ্ট হইতে পারে। এখানে অহিফেনের আবাদ আছে। যখন তাহা প্রস্ফুটিত ফুলভারে অবনত ও হাস্যময় হইয়া উঠে, তখন যেন সমুদয় ক্ষেত্র-ভূমি এবং ক্ষুদ্র আরা-নগরী, এক অভিনব শোভায় পুনর্জ্জীবিত হইয়া থাকে। সেই পুষ্পময় দৃশ্য অতি সুন্দর।

আরা-কেনালের সঞ্চিত বারি লইয়া, বেহার-অঞ্চলের প্রজাদিগের জীবন, অনিবার্য্য কলহে মহা অশান্তিতে পরিণত হইয়াছে। এই যৎসামান্য খালের জলই কৃষকের জীবনাবলম্বন। তাহা আবার সরকার হইতে (high rate) "হাইরেটে" জমা লইয়া, গরিব প্রজাগণ দিন দিন সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িতেছে। একেই বলে, ধনেপ্রাণে সর্ব্বনাশ। "বেওয়ারিস" ভারতের অর্থে, সাহাবাদে, এই "ইরিগেসন্"-কার্য্যপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ ও উপদ্রব নিবারণ করিবার জন্য, যে কমিশন সংগঠিত হইল, তাহার পরিণাম ফল, "যে আঁধারে সেই আঁধারে"।

এদিকের প্রজাগণের অবস্থা অতীব শোচনীয়। তাহারা জীর্ণশীর্ণ ভগ্নপ্রায় কুটীরে, মলিন শতধা-ছিন্ন বস্ত্র পরিয়া, স্ত্রীপুত্রসহ অর্দ্ধাশনে কোনওরূপে বাঁচিয়া আছে মাত্র। এই প্রকাণ্ড দেশ দারিদ্র্যানলে দিন দিন দ্রুতবেগে দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। অসংখ্য দীন দুঃখী দিবসে একবার মাত্রও পূর্ণহার পায় না, তাহার উপর আবার প্রতি বৎসর বিধাতার বিড়ম্বনায় দুরন্ত

দুর্ভিক্ষ আসিয়া, চারিদিকে হাহাকার ধ্বনি তুলিয়া দেয়। দিনান্তে কয়জন তাহার প্রতিবিধান চেষ্টা করিয়া থাকেন? দেশে ত এত হিতৈষীর কোলাহল শুনিতে পাই, কিন্তু এই সকল দুঃখের প্রতীকার অতিশয় বিরল।

সাহাবাদ

আরা-হাউস্

আরার অন্যতম নাম সাহাবাদ। এই সাহাবাদেই ক্ষুদ্রকায় "আরা হাউস্" অবস্থিত। বিদ্রোহক্ষিপ্ত সিপাহিদিগের উন্মত্ত হত্যা হইতে, সেই সময় জীবন রক্ষার্থে "আরা-হাউস্" সুকৌশলে নির্ম্মিত হয়। আরার অনতি-দূর-পল্লী জগদীশপুরে, অশীতিবর্ষীয় রাজপুত বীর কুমারসিংহ, যখন প্রচুর সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, ব্রিটিশরাজত্ব ধ্বংস-কল্পনার ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, তাহার কিছু পূর্ব্বেই, শ্বেতাঙ্গ রাজকর্ম্মচারিগণ, স্ত্রী পুত্র লইয়া আরাগৃহে নির্ব্বিঘ্নে আশ্রয় গ্রহণ করে। দিনের পর দিন, গোলমালে চলিয়া যাইতে লাগিল, তবুও কোনও দিক্ হইতে কোনও প্রকার সাহায্য আসিল না, এবং খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় জল ক্রমে ক্রমে নিঃশেষিত হইয়া আসিল দেখিয়া, ইংরাজেরা নিতান্ত চঞ্চল এবং ধৈর্য্যচ্যুত হইতে লাগিল ও শ্বেতাঙ্গিনী মহিলার মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দনধ্বনিতে সেই জনতাপূর্ণ আশ্রম, দারুণ ভীষণ ভাব ধারণ করিল। তৎকালে কতিপয় প্রভুভক্ত সাহসী শিখ সৈনিকের অদম্য বীরত্বের সহায়তায় ও তাহাদেরই স্বহস্তজাত সঙ্গীন-খনিত কূপোদক এবং আটার রোটিকায়, ইংরাজগণ সপরিবারে আসন্ন মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। বিদ্রোহীদিগের দলপতি কুমারসিংহের সর্ব্বকনিষ্ঠ অমরসিংহ, দুইবার আরা আক্রমণ করিয়াছিলেন, প্রথম জয়লাভের পর, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য যুবক, দ্বিতীয়বার আবার যখন "লড়িতে" যায়, সেই সময় হঠাৎ অসংখ্য ব্রিটিশ সৈন্যের সমাগমে ও তোপনাদে, সিপাহিরা অচিরাৎ সেনাপতি-সহ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে এবং এইরূপে "আরা-হাউস্" নিরাপদে বিপন্মুক্ত হয়।[১৩]

কুমারসিংহ

কুমারসিংহ রাজবংশ-সম্ভূত ও কনিষ্ঠ সন্তান বলিয়া, রাজত্ব না পাইয়া, "জায়গিরদার" ও "বাবু" উপাধি পাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রকাণ্ড অট্টালিকার এবং বিচিত্র শিবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি জগদীশপুরে দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও বেহারপ্রদেশে তাঁহার নাম সম্মানের সহিত নিত্য উচ্চারিত হইয়া থাকে। সেই বিপথগামী বীর পুরুষের মৃত-স্মৃতি, অনেক জীবিত

প্রেত-রহস্য

আমরা আবার যে অংশে বাস করিতাম, আগেই বলিয়াছি, সে স্থানটি সহর হইতে বিলক্ষণ দূরে। কতকগুলি ভোজপুরী গোপজাতির বসতি থাকায়, নিতান্ত বাধ্য না হইলে, কেহ ভ্রমেও সন্ধ্যার পরে ইচ্ছাপূর্ব্বক সে পথে চলিত না। একে ভোজপুরীরা দুরন্ত ডাকাত, তাহাতে বিষম যাদুকর, তাহার উপর আবার ভয়ানক প্রেতযোনির উপদ্রবের ভয়; কাজে কাজেই, সে স্থানটি একপ্রকার পরিত্যক্ত ছিল। অবসরমতে, আমরাও সুবিধা হইলেই, হিন্দুস্থানী, তেওয়ারী, পাঁড়ে প্রভৃতি ভৃত্যবর্গের নিকট নূতন নূতন অদ্ভুত প্রেতকাহিনী শুনিতাম,—প্রত্যয় অপ্রত্যয়ের কথা স্বতন্ত্র।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে, অসহ্য গ্রীষ্মাতিশয্যপ্রযুক্ত পশ্চিমে, রাত্রিকালে গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া লোকে নিদ্রা যাইতে পারে না। শুক্লপক্ষ, রজনী প্রায় তৃতীয় প্রহর, চন্দ্রালোকে আকাশ পৃথিবী যেন এক হইয়া গিয়াছে, উভয়ের ব্যবধান যে কত, তাহা তখন নির্ণয় করা অৰ্দ্ধ-জাগ্রত ব্যক্তির পক্ষে অতীব কঠিন। ঠিক্ স্মরণ নাই, কিসের একটা শব্দ শুনিয়া, হঠাৎ আমার ভাঙ্গা-ভাঙ্গা নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে, কেমন সব গোলমাল বোধ হইতে লাগিল। তখন আমি শয্যায় উঠিয়া বসিলাম। অমনি বাসার সম্মুখবর্ত্তী ঘন বিস্তৃত আম্রকাননের দিকে চোখ পড়ায়, চমকিয়া অনেকক্ষণ অন্যমনে স্থিরভাবে সেইদিকে চাহিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল,—সেই বিশাল আম্রকাননের অস্ফুট জ্যোৎস্নামধ্যে, শুভ্র-বস্ত্র-পরিহিতা এক অৰ্দ্ধ-অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া, সজোরে আম্রশাখা টানিতেছিল। তাহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়া, আমার আশঙ্কা ও কৌতূহল আরও বাড়িয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি আমি বাহিরে আসিয়া, জনৈক প্রৌঢ় রাজপুত ভৃত্যকে গাঢ় নিদ্রা হইতে ডাকিয়া কাণ্ডখানা কি, দেখিবার জন্য ঘটনাস্থলে যাইতে বলিলাম; সে কিন্তু কিছুতেই সম্মত হইল না। কথাবার্ত্তা ও মনুষ্যের শব্দ পাইয়া, সেই নিশাচরী ছায়াবৎ মুহূর্ত্ত মধ্যে কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গেল, বুঝিতেও পারিলাম না; মনে বিষম ধাঁধাঁ রহিয়া গেল। পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়াই শুনিলাম, আমাদের পশ্চাতের আবাসগৃহের পশ্চাদ্বর্ত্তী খালে, একজন স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করিয়াছে। তখনই আমাদিগের নিকট নিশীথ-প্রেত-রহস্য দিব্য পরিষ্কৃত হইল। দাসদাসী-মহলে, এই ঘটনার ভীতি-জনক ভ্রান্তি, বহুকাল তেমনি রহিয়া গেল, এবং তাহারা সকলে একবাক্যে বলিত যে, "ভূতে ভুলাইয়া ঐ বধূকে জলে ডুবাইয়া মারিয়া ফেলিয়াছে।"

ভৃত্যবর্গ, সেইদিন হইতে প্রাণান্তেও রাত্রিকালে একক কোনওখানে একপদও নড়িত না।

পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা এমনই ভূতভয়ে ভীত ও আড়ষ্ট যে, নবপ্রসূত শিশুকে, অপদেবতার দৃষ্টি হইতে বাঁচাইবার জন্য, সূতিকালয়ের চারিপার্শ্বে দিবারাত্রি বন্দুক আওয়াজ করিয়া, নিরুপায় প্রসূতির প্রাণ ওষ্ঠাগত করে। এ বিষয়ে পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী এবং দরিদ্রের প্রভেদ অতি অল্প।

আরা - ত্যাগ

আরার পূর্ণ একবর্ষের স্মৃতি কেমন নিস্তব্ধ মানসময়। দীর্ঘকাল একক-বাসে স্বজনবিরহিত-হৃদয় স্বতঃই গৃহমুখে ছুটিতে চাহে। কিন্তু ভগ্ন স্বাস্থ্যের অন্ধকার-ছায়া আবার যখন জীবনপ্রভাতের সুখসূর্য্য ঢাকিয়া ফেলে, তখন বিজ্ঞের ন্যায় হেতু দর্শাইয়া আত্ম-সংযম করিতে হয়। বান্ধব-দর্শনেচ্ছা অন্তঃকরণে যতই কেন বলবতী হউক না, তথাপি আমি বুঝিয়াছিলাম যে, সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য-লাভের জন্য, বাধ্য হইয়া, আরও কিছুদিন আমায় প্রবাসভোগ করিতেই হইবে। সেই নিমিত্ত, বহু দিবস ক্রমাগত বিদেশের এক স্থানে থাকার অসুখ-জনক ভার দূর করিবার জন্য, বর্ষাব প্রারম্ভেই আমি বেহারের অন্যান্য স্থান সকল দেখিতে আরা ত্যাগ করিলাম।

শোণ নদ

সাহাবাদের অব্যবহিত পরেই বিপুলকায় শোণ নদ প্রবাহিত। তাহার সেই প্রকাণ্ড-কলেবর বর্ষার বারি-সংযোগে আরও যখন বর্দ্ধিত হয়, তৎকালে তাহার অনিবার্য্য ঝটিকা-গতি ও সিন্ধুবৎ অসীমতা দেখিয়া মন অভূত-পূর্ব্ব-ভাবে স্তম্ভিত হইয়া যায়। মনুষ্যের দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করিয়া, শোণের স্বচ্ছ জলরাশি কেবলই ছুটাছুটি করিতে থাকে, তাহার যেন পারাপার নাই। দূরে বা নিকটে কোনও লোকালয় দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং তীরভূমি তরুচ্ছায়াশূন্য বালুকাক্ষেত্রে ধূ ধূ করে। তাহার চারিদিকে মরুময় সাহারা প্রচণ্ড রৌদ্রে পুড়িয়া যাইতেছে,—স্নিগ্ধভাব কোথাও নাই,—মধ্যে কেবল বিস্তৃতশরীর শোণ নদ পড়িয়া আছে। রোগ, শোক, জরা ও মৃত্যু তাহাকে কখনও যেন ছুঁইতে পারে না। এমনই অপার্থিব পবিত্রতা। ভাগীরথী পতিতপাবনী পাতকী তরাইতে মর্ত্ত্যভূমে অবতীর্ণা; কিন্তু বাণভট্টের "হর্ষচরিতে" শোণনদসম্বন্ধে উল্লেখ থাকিলেও, পুরাণে এমন কোন বাক্য নাই যে, তাহার বিন্দুমাত্র সলিলস্পর্শে যুগ যুগান্তের সঞ্চিত, বহুবিধ পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।[১৪] তবে ইহলোকের ব্যাধি, তাহার শীকরবাহী সমীরণ সেবনে ও বারিপানে আরোগ্য হয়।

সেতু

ব্রিটিশ-শিল্প শোণসেতুর অপূর্ব্বকাহিনী; ইতিপূর্ব্বেই আমার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিয়াছিল। অদ্য সেই প্রশংসিত শরীরী সেতু সচক্ষে দর্শন করিয়া আমি চমৎকৃত ও অবাক হইলাম কিনা,বলিতে পারি না; তবে তাহার বিশাল বিস্তৃতি অনেকক্ষণ আমার শূন্য-দৃষ্টি আকর্ষণ

করিয়াছিল মাত্র। মস্তকোপরি অনন্ত নভোমণ্ডল এবং ধরাতলে এই সকল উদার নদনদী যখন মানবমনের চিন্তাশক্তির উপর আধিপত্য করিতে থাকে, তখন আর পার্থিব দুঃখজ্বালা কাহারও অন্তরে স্থান পায় না। সসীম ক্ষুদ্র হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা নীরবে কোথায় যে ভাসিয়া গিয়া মহান উচ্চভাবে সমস্ত বিশ্ব পরিপ্লাবিত করিয়া ফেলে, তাহা কয়জন ভাবিয়া থাকে?

পাটলিপুত্র

শোণের জলদৃশ্য নেত্র হইতে অপসারিত না হইতেই, আমাদের শব্দায়মান বাষ্পীয়রথ চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের রাজধানী, পুরাতন পাটলিপুত্র ও বর্ত্তমান পাটনায় আসিয়া পৌঁছিল। প্রাচীন ও নবীন সংমিশ্রিত পাটনা-নগরী, এখন বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ-শতাব্দীর মধ্যভাগে* রাজা অজাতশত্রু কর্ত্তৃক পাটলিপুত্র সংস্থাপিত হয়। ইতিহাসে তাহার বিশদ বর্ণনা না থাকিলেও, অজাতশত্রু যে পাটলিপুত্রের আদি নির্ম্মাতা, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। চন্দ্রগুপ্ত নৃপতির রাজত্বের অন্য কোনও ঐতিহাসিক ঘটনা এখানে আমার বলিবার প্রয়োজন না থাকিলেও, তাঁহার মন্ত্রি-প্রবর, প্রাচীন ভারতের মেকিয়াভেলি, চাণক্য পণ্ডিতকে বিস্মৃত হওয়া, (বিশেষতঃ স্ত্রী জাতির পক্ষে) অতীব সুকঠিন।[১৫]

মহিলামাত্রকেই তিনি নিতান্ত অবিশ্বাস ও ঘৃণা করিতেন। সেইজন্য, নখী ও শৃঙ্গধারীর সহিত; তাঁহার কল্পনাজাত নারীগণের তুলনা করিয়া গিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্তের বহু পরে, বৌদ্ধরাজ অশোক বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি কামনায়, পাটলিপুত্রে অনেকগুলি মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রচারকগণ তাহাতেই নিরাপদে বাস করিয়া দেশ দেশান্তরে ধর্ম্ম-প্রচার করিতেন। সে পুরাতন পাটলিপুত্র এখন ইতিহাসের কাহিনীর ন্যায়, ভগ্ন চিহ্নে বিলীন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ইংরাজ-নগরী বর্ত্তমান পাটনা, শোভাহীন, মলিন ও চির গোলযোগময়। ক্রেতা ও বিক্রেতার কর্কশ কণ্ঠনাদে এবং উড্ডীয়মান ধূলিকণায় সেখানে তিষ্ঠান দায়। ভীষণ মহামারী বিসূচিকা এবং বসন্ত, বৎসরে দুই একবার নিয়মিতরূপে আসিয়া, অধিবাসীর সর্ব্বনাশ করিয়া যায়। তাহার রাজপথে দুর্ভিক্ষের বিকট-ছায়া যেন নিত্য বিচরণ করিতেছে এবং চতুষ্পার্শ্বে অর্দ্ধ-ভগ্ন মৃন্ময় কুটীরবাসীর শতচ্ছিন্ন মলিনবস্ত্র ও রুক্ষ্ম-কেশ দারিদ্র্যের জীবন্ত ও মূর্ত্তিমান্ চিত্র দেখিয়া মনে সহসা আতঙ্কের সঞ্চার হয়।

পাটনা ছাড়িয়া কতক পথ দূরে দানাপুরে ব্রিটিশ-সৈনিক-নিবাস বা ক্যান্টনমেন্ট আছে। এলাহাবাদ ও কাণপুর হইতে প্রয়োজনমত কখন কখন অসংখ্য ইংরাজ সৈন্য, অফিসার সহ আসিয়া সেখানে অবস্থিতি করে।

---

*It was in the middle of the sixth century before Christ that Ajatashatru founded the city of Pataliputra (*Travels of a Hindoo*, Vol I).

ছোটখাট দানাপুর সহর, শ্বেতাঙ্গের বাসস্থান বলিয়া, দিব্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও কুসুমকাননে সুশোভিত। আমরা দ্রুতবেগে একে একে ঐ সকল ও কর্ডলাইন ছাড়িয়া, পথে লক্ষ্মীসরাইয়ে নামিয়া, বক্রদিকে লুপমেলে মুঙ্গেরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। মোকামায় গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া মুঙ্গের যাওয়াই নিয়ম; কেবল আমারই অনবধানবশতঃ তাহা ঘটিয়া ওঠে নাই, কাজে কাজেই লক্ষ্মীসরাইয়ে নামিতে হইয়াছিল।

মুঙ্গের

প্রসন্নসলিলা ভাগীরথীর তটভূমে বিরাজিত, ক্ষুদ্র মুঙ্গের দেখিতে অতি রমণীয়; আলেখ্যবৎ মনোহর। তাহার দুই পার্শ্বে চিরযৌবনা পুণ্যময়ী জাহ্নবী এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলশ্রেণী। নবদূর্ব্বাদলশোভায় যেন প্রকৃতির অঙ্গে মিশাইয়া রহিয়াছে। মুঙ্গের ক্ষুদ্র হইয়াও বিলাসী-সম্রাটের রাজপ্রাসাদে এবং গঙ্গাতীরে অবস্থিতি নিবন্ধন, পবিত্রতাপ্রিয় হিন্দুর নিকট অতীব আদরের সামগ্রী। মুঙ্গেরের পূর্ব্বতন নাম "মুদ্গলপুর"। কিন্তু কিরূপে যে পরে তাহা মুঙ্গের নামে অভিহিত হইল, সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে পারি না। এখানেও কোন পুরাতন ভগ্ন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না,—তবে দুর্গের পূর্ব্বদ্বারে, অদ্যাপি কতকগুলি লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধমূর্ত্তি বিদ্যমান থাকায়, তাহার প্রাচীনতার বিষয়ে নিঃসন্দেহ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চারি বৃহৎ-দ্বারযুক্ত মুঙ্গের দুর্গের অতীত গৌরব এখন আর নাই—এই দ্বারচতুষ্টয়ের প্রধান "লাল দরওয়াজা", সময়ের কঠোর আঘাতে মলিন হইয়া গিয়াছে,—আছে কেবল স্মৃতি—"সেই বিলুপ্ত স্মৃতির চিহ্ন জাহ্নবী যমুনা" আজিও হিন্দুর অন্তরের অন্তরতমপ্রদেশ জুড়িয়া রহিয়াছে মাত্র।

দুর্গস্থিত কৃষ্ণ-প্রস্তরের চারু ভজনালয় সম্পদহীন শূন্যতায় একক পড়িয়া আছে এবং সুলতান সুজার রম্য রাজধানী ইংরাজ বণিকের আবাসস্থান হইয়াছে। এই রাজপ্রাসাদ হইতে প্রেয়সী বেগমদিগের গঙ্গাস্নান করিবার প্রস্তরময় পথ, এখন ভগ্নতায় বিলীন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অবগাহনের সেই শিলাঘাট অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

এখানকার জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর ও সেইজন্য বৎসর বৎসর দেশ দেশান্তর হইতে অনেক পীড়িত ব্যক্তি আরোগ্য-লাভার্থে এখানে আসিয়া থাকে এবং অবসরপ্রাপ্ত অধিকাংশ বৃটিশ-সৈনিক-পুরুষ সপরিবারে এখানেই জীবনের অবশিষ্টভাগ অতিবাহিত করে। অনতিবৃহৎ মুঙ্গের-সহরের পথঘাটগুলি অতি পরিপাটী এবং ভাগীরথীবক্ষ হইতে তাহার প্রস্তর-ঘাট—দেবালয় ও পুরাতন বৃক্ষরাজি-পরিবেষ্টিত দেশীয় পল্লী দেখিতে অতিশয় প্রীতিকর। এ স্থানের অধিবাসীর সংখ্যা মধ্যম রূপ এবং আধুনিক সভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ স্কুল, কাছারী ও জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট, সবই পূর্ণ-মাত্রায় আছে।

এখানে কাষ্ঠবিনির্ম্মিত নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর খেলনা ও শ্বেতাঙ্গিনী মহিলার দেহভূষণ অলঙ্কারাদি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

মুঙ্গেরবাসী হিন্দুর গৃহদেবতা—কালীরূপা "চণ্ডীমাতা", সহরের প্রান্তভাগে, একরূপ পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকিয়াও, অধিবাসীগণের নিকট নিয়মমত দৈনিক পূজা পাইয়া থাকেন এবং পর্ব্বদিনে সেখানে বহুবিধ লোকের সমাগম হয়।

সীতাকুণ্ড

সীতাকুণ্ড মুঙ্গের হইতে অল্পমাত্র ব্যবধান, সেখানে যাইবার অর্দ্ধপথ যাইতে না যাইতে, পাণ্ডাগণের করকবলিত হইতে হয় এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত যাত্রীদিগের হস্ত একবারে অর্থশূন্য না হয়, ততক্ষণ আর নিস্তার দেয় না, এমনই অর্থপিশাচ জাত!

জনহীন প্রাচীরাবৃত শ্যামল প্রাঙ্গণমধ্যে সীতাকুণ্ড পবিত্র আত্মগৌরবে অবিশ্রান্ত উথলিয়া পড়িতেছে। তাহার উষ্ণ, নির্ম্মল, বারিকণা নিরূপম দর্পণের ন্যায় এমন স্বচ্ছ যে, তাহার ভিতর সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যেন প্রতিফলিত হইতেছে, তাহাতে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর কোনও বস্তু নিক্ষেপ করিলেও পুনর্ব্বার তাহা অনায়াসে পাওয়া যায়। সীতাকুণ্ড কাহারও দান গ্রহণ করেন না।

ছায়াময়, দীর্ঘ তরুশ্রেণী ও অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালা পরিশোভিত সীতাকুণ্ড, অতৃপ্তনয়নে শতবার দর্শন করিয়াও হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না, তাহার কেমন যে অপূর্ব্ব মাধুরী ও মহিমা, দেখিলেই দেবত্বের কথা মনে পড়ে, এবং বোধ হয়, সীতা রাবণ-গৃহ হইতে উদ্ধার পাইয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশপূর্ব্বক অলৌকিক সতীত্বের উজ্জ্বলতম প্রমাণ যেন এইখানেই দিয়াছিলেন! তাহা আপন নেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়া অন্তঃকরণে এক অভিনব অভূতপূর্ব্ব ভক্তিরসের উদয় হয়। সীতাকুণ্ডের চারিপার্শ্বে, রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের নামধেয় আরও চারিটি কুণ্ড আছে, কিন্তু তাহা কোনও অংশেই উল্লেখযোগ্য নহে।

সুভাগ্যবশতঃ এখানে আসিয়া আবার আমি জ্বরভোগ করিতে থাকি এবং সেই নিমিত্ত সীতাকুণ্ড ব্যতীত, সহরের অন্যান্য স্থান সমূহ ভাল করিয়া দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইয়া উঠে নাই।

জামালপুর

কয়েকদিন মাত্র বন্ধুগৃহে সমাদরে অতিবাহিত করিয়া, রেলপথে আমরা ভাগলপুরাভিমুখে রওনা হই। মুঙ্গের হইতে অশ্বযানে ভাগলপুর যাইবার সুবিধা আছে; তথাপি, "টানেলের" মধ্য দিয়া কিরূপে ট্রেন যাতায়াত করে, তাহা দেখিবার জন্য, দিনমানেই আমরা মুঙ্গেরপরিত্যাগ করি।

জামালপুর কল-কারখানার নিমিত্ত প্রসিদ্ধ এবং ছোটখাট সহর হইয়াও তাহা পল্লীগ্রাম বিশেষ। এখানে অনেকগুলি অট্টালিকা ও বড় বড় কারখানাগৃহ থাকায়, স্থানটি দিব্য শ্রীসম্পন্ন বলিয়া মনে হয় এবং ভদ্রলোকের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী এখানে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। কার্য্যোপলক্ষে অনেক বাঙ্গালী দীর্ঘকাল এখানে আসিয়া বাস করায়, তাঁহারা একপ্রকার এখানকার স্থানীয় লোক হইয়া গিয়াছেন, দেশের সঙ্গে তাঁহাদের সংস্রব একেবারে নাই বলিলেও চলে। জামালপুরের কারখানার প্রসাদাৎ, বহুবিধ ফিরিঙ্গী সাহেব এখানে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে এবং "বাবু" প্রতিবাসীদের সহিত তাহাদের কোনও মনোমালিন্য লক্ষিত হয় না।

এ স্থানও অতিশয় স্বাস্থ্যপ্রদ এবং সময়ে সময়ে পীড়িত ব্যক্তিগণ, পরিবর্ত্তনের জন্য আসিয়া আশানুরূপ ফললাভ করে।

টানেল

অর্দ্ধক্রোশব্যাপী পাহাড় কাটিয়া, বহু পরিশ্রম ও বহু অর্থব্যয়ে, ইংরাজ বাহাদুর এই "টানেল" প্রস্তুত করিয়া, বাষ্পীয়রথ গমনাগমনের আশ্চর্য্য সহজ উপায় করিয়াছেন। "টানেলের" ভিতর সূচিভেদ্য অন্ধকার এবং দিবসে প্রচণ্ড সূর্য্যকরেও সেখানে বিন্দুমাত্র আলোকরশ্মি প্রতিভাত হয় না। আঁধারের এমন একটা ভীষণ ভাব যে, তাহাতে শকট প্রবেশ করিবামাত্র পথিকের মনে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। ইতিপূর্ব্বে নূতন যখন এই পথে গাড়ী যাইতে আরম্ভ করে, তখন নাকি দস্যুকর্ত্তৃক আরোহীগণের সর্ব্বস্ব অপহৃত হইত এবং ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র আসিয়া সবলে বেগগামী শকটেও তাহাদের প্রাণ-সংহার করিত!

"টানেলের" গাত্র হইতে মৃদু মৃদু ঝরঝর শব্দে নিরন্তর বারিকণা নির্গত হওয়াতে, উত্তপ্ত গ্রীষ্মকালেও তাহার মধ্যে পৌষের শীত অনুভূত হয়।

রচনাগুলির প্রকাশতথ্য পরিচিতিতে উল্লেখ করা আছে।

৪

বারাণসী

প্রিয়ম্বদা দেবী

আমরা যখন ষ্টেশনাভিমুখে যাত্রা করিলাম, তখন হেমন্তের স্বল্পায়ু দিন শেষ হইয়া গিয়াছে; পশ্চিম আকাশে ম্লানাভ রক্তরশ্মির আর কিছুমাত্র চিহ্ন নাই, মহানগরীর পথে পথে দীপালোক জ্বলিয়া উঠিয়াছে। পূজার ছুটি—অসংখ্য যাত্রী বৎসরান্তে কর্ম্মের অবসরে মাতৃভূমির পুণ্য তীর্থ, রমণীয় নগর নগরীর সহিত ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ের জন্য অগ্রসর হইয়াছে। হাবড়ার ষ্টেশনে জনতা দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম, কি নিবিড়, একটিকে ঠেলিয়া দিলে দশটি পড়িয়া যায়। চারিদিকে মহা কলরব. কিছুই স্পষ্ট শোনা যায় না, অনবরত অট্টশব্দ। সময় হইয়া আসিল, ঘন্টা বাজিল, রেল মহাউৎসাহে ছুটীয়া চলিল। হুগলী, বর্দ্ধমান, আসানসোল ছাড়াইয়া চলিলাম। নওয়াদি; একবার উৎসুক হইয়া বাহিরে মুখ বাড়াইয়া বসিলাম। মনে পড়িল বাল্যকালে একবার এ-পথে গিয়াছিলাম; গাড়ী যখন ষ্টেশনে পৌঁছিয়াছিল তখন ঊষাকাল, উদয়োন্মুখ সূর্য্যের সুকুমার অরুণালোকে শৈলবেষ্টিত শ্যামপল্লীটি বড়ই সুন্দর দেখিয়াছিলাম, সে ছবি ভুলিতে পারি নাই। কিন্তু এই শুক্লপক্ষ তৃতীয়ার ক্ষীণ চন্দ্রালোকে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। রাত্রি গভীর হইল, সহযাত্রী সকলে ঘুমাইয়া পড়িলেন, বাতায়নের ধারে বসিয়া দেখিতে লাগিলাম তরঙ্গায়িত প্রান্তর রেলের পশ্চাতে ছুটিয়া চলিয়াছে, হেমন্তকুজ্ঝটিকায় অদৃশ্যপ্রায়। ঊর্দ্ধে স্বচ্ছনীলু আকাশে স্থির উজ্জ্বল সপ্তর্ষিমণ্ডল; স্বর্ণমণ্ডিত যুক্তবৃষশঙ্গের ন্যায় ঈষৎ বঙ্কিম তৃতীয়ার চন্দ্র, লঘুশুভ্র বাষ্পরেখার মত অতি দুর ছায়াপথ, পুরাতন সুখস্মৃতির ন্যায় ক্ষীণছবি অথচ চিরস্থায়ী। বাষ্পীয় রথ ছুটিয়া চলিল, তুমুল শব্দ, অপ্রতিহতগতি।

প্রভাত হইয়াছে, চারিদিকে উজ্জ্বল নির্ম্মল সূর্য্যালোক শিশিরসিক্ত প্রান্তরগুলিকে সুন্দরতর করিয়া তুলিয়াছে—শীতল মধুর বায়ু আপক্ক শালিধান্যক্ষেত্রে শ্যামল বন্ধুর তরঙ্গ খেলাইয়া চলিয়াছে। রেলপথের নীচে মাঠের ভিতর দিয়া একখানি অল্পপরিসর পথ দেখা যাইতেছে, তাহারি উপর দিয়া একটি ক্ষুদ্র নগ্নকায় বালক বৃহৎকায় মহিষে আরোহী হইয়া চলিয়াছে—আরোহী এবং বাহক উভয়েই দিব্য নিশ্চিন্ত, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মহিষটি একবার শান্ত দৃষ্টিতে ঊর্দ্ধশ্বাস অট্টশব্দ বাষ্পীয় রথখানিকে দেখিল। অদূরে ঘনচ্ছায় আম্রবৃক্ষের নীচে দুইটি প্রকাণ্ড হাতী বাঁধা রহিয়াছে, সেখানে ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক পল্লীবাসীর ভিড় জমিয়াছে। রেল সশব্দে শোণপুলের উপর চড়িল, নিম্নে বহুদূরবিস্তৃত ধূসরাভ বাষ্পবর্ণের বালুকারাশি, তাহারি মাঝে মাঝে স্বচ্ছ তরল রজত জলধারা আঁকিয়া বাঁকিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া প্রাচীন শোণনামের বড়ই প্রতিকূলাচরণ করিতেছে। বেলা পড়িতে লাগিল, আরা, বক্সার, দিলদারনগর ছাড়াইয়া

ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ষ্টেশনগুলি বড় সুন্দর পরিষ্কার পরিপাটী। দুইদিকে বারান্দার ধারে ধারে ফুলগাছ, বাহারে পাতার গাছ, দুর্ব্বামণ্ডিত একপ্রান্তে শ্বেত মর্ম্মরখণ্ড সকল দিয়া ষ্টেশনের নাম লেখা, আশেপাশে সাদা রাঙা কালো পাথরগুলি কেমন বিবিধ বিচিত্র আকারে সজ্জিত। মোগলসরাই, রেলগাড়ী বদল হইল। এইবারে গঙ্গাপার হইয়া কাশী। আগ্রহে বাতায়ন হইতে মুখ বাড়াইয়া বসিলাম, পুলের মধ্যপথে দেখিতে পাইলাম গঙ্গাতটে অভ্রভেদী মর্ম্মর সৌধশ্রেণী, ত্রিশূল চিহ্নিত মন্দিরের চূড়া, বায়ুকম্পিত ধ্বজমালা, স্নানঘাটের অসংখ্য সোপানাবলী—মুহূর্ত্তের বিস্মিত অপূর্ণ দৃষ্টি—বাষ্পীয় রথ ছুটিয়া অগ্রসর হইল, সে কাহারো উৎসুকচিত্তের অতৃপ্তি ও ব্যগ্রতা মিটাইবার জন্য অপেক্ষা করে না।

তৃতীয়ার ক্ষীণ চন্দ্র দিনে দিনে পরিপূর্ণতর হইয়া উঠিয়াছে, আজ বিজয়া দশমী। গঙ্গা-বক্ষে নৌকা হইতে প্রতিমা বিসর্জ্জন দেখিতে আসিয়াছি। সবেমাত্র সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। আকাশে অপূর্ব্ব বর্ণ সমাবেশ—জাহ্নবীবক্ষে সূর্য্যের শেষ রশ্মিপাতে সমস্ত জলরাশি রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। নৌকায় উঠিবার কালে প্রথমেই চোখে পড়িল গুটিকত জবা গাঁদা দোপাটীর ফুল, খানকতক বিল্বপত্র;—তটান্তের ফেণমিশ্রিত বারিরাশির উপর ভাসিয়া চলিয়াছে—কোন ভক্তের পূজার নির্ম্মাল্য, মনের মধ্যে একটি মঙ্গল ভাবের সূচনা করিয়া দিল। চারিদিকে ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য তরণীমালা প্রতিমা বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে, আরোহীসকল অধিকাংশই আমাদের স্বদেশী বাঙ্গালী—এদেশবাসী দুর্গামূর্ত্তিপূজার পক্ষপাতী নহে। ঢাক, ঢোল, শঙ্খ, ঘন্টা, কাসর, বাদ্যের মহাসমারোহ। বাঁশী বেহালা সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরেরও অভাব নাই। সূর্য্যের শেষ রশ্মি মিলাইয়া গিয়াছে, আকাশে উজ্জ্বল বিরল নক্ষত্রসভা, মধ্যভাগে শুক্লপক্ষের পূর্ণপ্রায় চন্দ্র, গঙ্গাবক্ষে তাহার ছায়া পড়িয়াছে, গঙ্গার জল জ্যোৎস্নালোকে ঝিকিমিকি করিতেছে, তরণীমালার আতসবাজির ছায়াও পড়িতেছে। এই তুবড়ির অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ উৎস, এই দীপকের দীপ্ত শুভ্রালোক—প্রতিমার মুখে, মুকুটে শত উজ্জ্বল হারমণ্ডিত বক্ষঃস্থলে পড়িয়া শ্রী দ্বিগুণতর মনোরম করিতেছে। প্রতিমাসকল দশাশ্বমেধ ঘাটে বিসর্জ্জিত হইবে—সে বহুদূর, রাত্রি হইয়া গিয়াছিল, আমরা ফিরিলাম। উৎসবের আলোক সমারোহ জনতা বাদ্য গীত হাস্য কলরব ক্ষীণতর হইয়া গেল—সঙ্গী রহিল আকাশের উজ্জ্বল চন্দ্র, ক্ষেপণীর ঐক্যতান উত্থান পতন শব্দ। ক্রমে একটি সুগোল গম্ভীর মিষ্ট কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। কথাগুলি স্পষ্ট নয়, কিন্তু মনে হইতে লাগিল যেন অনুস্বরান্ত সংস্কৃত গাথা—সহযাত্রী একজন বলিলেন নিশ্চয়ই অদূর মন্দিরদ্বারে বসিয়া কোন সন্ন্যাসী সামগান করিতেছে। নৌকা গম্যস্থানে পৌঁছিল—সোপান বাহিয়া উপরে রাজপথে উঠিতেছি; আবার সেই কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল, এবারে আর কথাগুলি অস্পষ্ট নয় — "চানাচোর গরমাগরম।"

প্রভাতকাল, নির্ম্মল আকাশ মেঘলেশহীন, অতি স্বচ্ছ সুনীল — অপ্রখর সুন্দর সূর্য্যালোক নেত্রসুখকর। প্রচ্ছায়শীতল পথ বাহিয়া চলিয়াছি; থাকিয়া থাকিয়া শিউলি ফুলের মধুস্নিগ্ধ গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে — মাঝে মাঝে দু'একখানি ঘাসে ছাওয়া বাঙ্গলা, সম্মুখে দুর্ব্বামণ্ডিত ভূমি। এ স্থানটি কাশীর বহির্ভাগ, সৈন্যনিবাস, সিক্রোল। দু'একটি মন্দির দেখিতে পাইলাম,

পথ ক্রমশঃ ধূলিবহুল, আমরা অসিঘাটের সন্নিকট। এখানে নিজ কাশী ষ্টেশন, এখান হইতে নৌকা করিয়া সমস্ত কাশীর দৃশ্য সুন্দর দেখা যায়। নৌকা বহিয়া চলিল, প্রাচীন ভারত মূর্ত্তিমান হইয়া আমাদের সম্মুখে দেখা দিল—শুভ্র মর্ম্মর সৌধ—কার্নিশে, বাতায়নপার্শ্বে, গবাক্ষপথে কারুকার্য্য, কোথাও মৎস্য, কোথাও ময়ূর, কোথাও সিংহ-ব্যাঘ্র খোদিত; স্থির অটল কঠিন গঠন, যেন ধ্বংস নাই, কত যুগ আছে, আরো কত যুগ থাকিবে। মন্দিরের পর মন্দির, ক্ষুদ্র বৃহৎ, কোনটি শ্বেত, কোনটি রক্ত-প্রস্তর নির্ম্মিত; কোনটির গঠন আমাদের দেশের শিবমন্দিরের মত, কোনটি অষ্টকোণ, শীর্ষদেশে স্বর্ণকলস স্থাপিত, সম্মুখদ্বারে প্রকাণ্ড ঘন্টা লম্বমান—কোথাও শ্বেতমর্ম্মরনির্ম্মিত বিশ্বেশ্বরবাহন নন্দীর মূর্ত্তি স্থাপিত; বেণীমাধব মন্দিরের আকাশস্পর্শী চূড়া পঞ্চক্রোশী কাশীর প্রত্যেক কোণ হইতে দেখিতে পাওয়া যায়— মানমন্দির, অট্টালিকার পর অট্টালিকা, কোনটি গোয়ালিয়ারের, কোনটি জয়পুর রাজের, কোনটি নাগপুরের পেশওয়ার। একটি মন্দির দেখিলাম ব্রহ্মদেশীয় প্যাগোডার মত, সেটি নেপালরাজের স্থাপিত। নদীবক্ষ হইতে সুবিস্তৃত সরল সোপানরাজি উর্দ্ধে উঠিয়াছে, ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া রাজপথে মিলিয়াছে, কোথাও মন্দিরদ্বারে শেষ হইয়াছে। জলের নিকট ঘাটে বৃহৎ তালপত্র ছত্রের ছায়ায়, স্নাত শুদ্ধদেহ ব্রাহ্মণ পূজায় বসিয়াছেন; সুগৌরবর্ণ, উন্নত ললাটে চন্দনরেখার ত্রিপুণ্ড্ররচনা, পরিধানে রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্র, সম্মুখে পূজার আয়োজন ধূপ দীপ নৈবেদ্য শঙ্খ ঘন্টা, প্রভাতের সদ্য বিকশিত কুসুমরাজি। এই তালপত্র ছত্রগুলি কাশীর বিশেষত্ব, ইহার নীচে বসিয়া ব্রাহ্মণ নদীর ঘাটে পূজা করেন, দোকানী কেনাবেচা করে, মালাকর ফুল বেচে, কেহ বা চন্দন গঙ্গামৃত্তিকা লইয়া বসিয়া থাকে, স্নানশেষে এক পয়সা দিলে ললাটে অলকা তিলকা আঁকিয়া দেয়। দেখিলাম একটি ব্রাহ্মণ স্নানরত—জলে আকণ্ঠ মগ্ন হইয়া উর্দ্ধমুখে সূর্য্যস্তব পাঠ করিতেছেন, সেই "কশ্যপের মহাদ্যুতি"র উদ্দেশ্যে যে অঞ্জলি প্রেরণ করিতেছেন তাহারি সলিল সূর্য্যালোকসম্পাতে উজ্জ্বল তরল হীরকশোভায় জাহ্নবীবক্ষে ঝরিয়া পড়িতেছে। ঘাটের আর অন্ত নাই, সোপানাবলী কি সুন্দর ঋজু অনতি-উন্নত প্রশস্ত—আরোহণ অবরোহণ স্বল্পায়াসসাধ্য। একটি ঘাটে দেখিলাম অনেকগুলি নারী একত্রে স্নান করিতেছে—শ্বেত পীত নীল লোহিত শ্যামল ও কৃষ্ণ কত বিবিধ বর্ণেরই শাড়ী। কেহ মৃত্তিকা দিয়া মাথা বসিতেছে কেহ গাত্র মার্জ্জনা করিতেছে। কেহ বা সোপানে পা দুখানি ঘষিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিতেছে, একটি তরুণী আজানু জলে দাঁড়াইয়া গঙ্গায় কলসের আঘাতে ঢেউ খেলাইয়া একটি উজ্জ্বল কাংস্যঘট পূর্ণ করিতে করিতে গ্রীবা হেলাইয়া হাস্যমুখে সখীর সহিত বাক্যালাপ করিতেছে, এমনি সুন্দর সুকুমার ভঙ্গীটি,—একটি মারহাট্টি বালিকা মাথায় পূর্ণঘট, সোপানে সোপানে উঠিয়া সম্মুখের মন্দিরদ্বারে অদৃশ্য হইয়া গেল। একখানি ভগ্ন ঘাট দেখিলাম—গুর্জ্জররাজের অসমাপ্ত কীর্ত্তি—মহারাজ বহু ব্যয়ে ঘাট বাঁধাইয়া দিতেছিলেন, প্রায় শেষ হইয়াছিল, এমন সময় একদিন অপর পারে একখানি বৃহৎ বারুদের নৌকায় আগুন লাগিয়া, মহাশব্দে নৌকাখানি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া চারিদিকে উড়িয়া যায়। সেই প্রচণ্ড বায়ু বেগাঘাতে অসমাপ্ত ঘাটখানি একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। খোদিত প্রকাণ্ড স্তম্ভাবলী সোপানশ্রেণী চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, দেখিলে দুঃখ হয়। উত্তুঙ্গ পঞ্চতল

অট্টালিকাশ্রেণীর ঊর্দ্ধে সুনীল আকাশ, শ্বেত তাম্র ধূসরবর্ণের অসংখ্য পারাবত উড়িয়া বেড়াইতেছে—কোথাও মন্দিরপার্শ্বে বৃক্ষচ্ছায়ে সুখাসীন পান্থমণ্ডলী। একটি ঘাটের পার্শ্বে দেখিলাম একটি প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ পূজা সাঙ্গ করিয়া বসিয়াছেন, নিকটে দুইটি বালক বালিকা—বোধ হয় তাহারা ভাই বোন, উভয়েরই গৌরবর্ণ, সুন্দর মুখশ্রী। বালকের চন্দনাঙ্কিত ললাট, পরিধানে হরিদ্বর্ণের বেনারসী জোড়, গলায় ফুলের মালা, হাসিয়া হাসিয়া কি বলিতেছে—বালিকাটি ব্রাহ্মণের মুখ ফিরাইয়া লইয়া কি দেখাইবার চেষ্টা করিতেছে, ছোট্ট একখানি হাত বাড়াইয়া স্থান নির্দ্দেশ করিতেছে—পরিধানে গোলাপী ঘাঘরা, মাথায় গোলাপী ওড়না, চোখে কাজল, তুলিকাঙ্কিত বঙ্কিম ভ্রূর মধ্যে একটি সোনালি টিপ। উভয়ের চেষ্টা একই সময়ে ব্রাহ্মণের মনোযোগ আকর্ষণ করিবে। দুইখানি কচি মুখ, চিত্তাকর্ষক স্নেহের দৌরাত্ম্য, পার্শ্বে প্রশান্ত প্রসন্ন ব্রাহ্মণমূর্ত্তি। এখানে ব্রাহ্মণের পরিচয় আবশ্যক করে না, দেখিলেই চিনিতে পারা যায়, সকলেরই প্রায় উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, সুন্দর মুখশ্রী। এই বর্ণের একটু বিশেষত্ব আছে, এরূপ সুস্থ রক্তাভ চম্পক গৌরবর্ণ বঙ্গদেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। আর চিনিতে পারা যায় পাণ্ডাদিগকে—দিব্য স্থূল পরিপুষ্ট দেহ, নিশ্চিন্ত হৃষ্টমুখ—অপর্য্যাপ্ত আহার এবং সুপ্রচুর অবসরের পরিচায়ক।

শুক্লত্রয়োদশীর জ্যোৎস্নাপ্রফুল্ল রাত্রি। পথে দীপালোক নাই। কাশীর মিউনিসিপালিটি পয়সার সাশ্রয় করিতে জানে—অকারণে জ্যোৎস্নারাতে পথে আলো জ্বলে না। পথ নির্জ্জন, উভয় পার্শ্বের সঘনপল্লব বৃক্ষশ্রেণীর মণ্ডলাকার শীর্ষদেশ চন্দ্রালোকে চিক্কণ উজ্জ্বল, ভূমিতল আলো-ছায়াঙ্কিত, কোথাও শুভ্র জ্যোৎস্নাধারা, কোথাও শ্যাম অন্ধকার। বরুণার বালুকারাশি, তটান্তবাহী বনশ্রেণী; দূর প্রান্তরে শস্যক্ষেত্র জ্যোৎস্নাপাতে অস্পষ্ট বাষ্পাকুল, অপার। নদীবক্ষে ক্ষীণ জলস্রোত ঈষৎ বায়ুকম্পিত, বীচিচঞ্চল, ধূর্জ্জটীর জটচ্যুত ত্রিধারার ন্যায় নির্ম্মল। বরুণাপুল পার হইয়া নগরাভিমুখে অগ্রসর হইলাম—পথের দুই ধারে প্রস্তর নির্ম্মিত, দৃঢ় কবাটসন্নদ্ধ, বাতায়ন-বিরল গৃহশ্রেণী। কক্ষ প্রাচীরে কোথাও গবাক্ষ, কোথাও সূক্ষ্ম কারুকার্য্যখচিত জালায়ন—কোথাও দ্বিতল কক্ষের সম্মুখে অনতিপ্রসর চারু অলিন্দ, মর্ম্মর জালায়নবেষ্টিত। পথে লোকের ভিড় এতটা নাই, সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে—তীর্থাধীশ্বর বিশ্বনাথজীর আরতিকাল আগতপ্রায়, সকলেই সেইদিকে গিয়াছে। আমরাও সেই পথের যাত্রী। মন্দির রাজপথের বহুদূরে, সে পথে শকট চলে না, পদব্রজে যাইতে হয়। দুইধারে মিষ্টান্নের দোকান, আরো দূরে অগ্রসর হইয়া মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইলাম। আশে পাশে তেত্রিশ কোটি দেবতার বাস। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, শনি, রবি, অশুভ-শুভ কোন গ্রহই বাদ যান নাই। কেহ অমঙ্গল দূর করেন, কেহ মঙ্গল বিধান করেন, সকলকেই পয়সা দেও। প্রাঙ্গণ পার হইয়া একটি বারান্দায় আসিলাম, সেখানে একটি প্রকাণ্ড ঘণ্টা লম্ববান, যাত্রীগণ সেটিকে নাড়িয়া দিতেছে। অসাধারণ ভিড়, পদে পদে বাধা, কোনরূপে আমরা দেবতার পীঠস্থানের নিকটবর্ত্তী দ্বারের সম্মুখে বসিবার স্থান পাইলাম। তখনো আরতির বিলম্ব আছে—বিশ্বনাথজীর সন্ধ্যাস্নান হইতেছে। একজন পাণ্ডা শিবলিঙ্গের মস্তকে দুধ ঢালিতেছে, এক মণ দুধ ঢালিয়া তাহার পর

চন্দনানুলেপন, সেটি সমাধা হইলে আরতি আরম্ভ হয়। চারিদিক হইতে শিব শিব শম্ভো, শম্ভো শম্ভো শিব শব্দ উত্থিত হইতেছে—পূজারিপ্রধান একজন বয়োবৃদ্ধ সন্ন্যাসী, গৌরবর্ণ, সুদীর্ঘ জটাভার কুণ্ডলাকারে মস্তকের উপর সন্নদ্ধ, ললাটে যজ্ঞীয় টীকা, রক্তচন্দনের ত্রিপুণ্ড্ররচনা, কণ্ঠে এবং প্রকোষ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা, আরো দশজন ব্রাহ্মণ আরতি দীপগুলি সম্মুখে করিয়া বসিয়া আছে। শ্বেত এবং রক্তচন্দনে মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি যখন অদৃশ্যপ্রায় হইয়া উঠিল তখন আরতি আরম্ভ হইল। প্রত্যেকের হস্তে এক একটি পঞ্চ প্রদীপ, কর্পূরমিশ্রিত ঘৃতে পঞ্চাশটি বর্ত্তিকা জ্বলিয়া উঠিল, অতি শুভ্র স্নিগ্ধ আলোক। সমবেত কণ্ঠে স্তোত্র আরম্ভ হইল "জয়দেব জয়দেব।" গভীর গম্ভীর একতান সঙ্গীত; তাহারি মধ্যে একটি উচ্চ তরুণ বালক-কণ্ঠ অতি করুণ স্বরে ধ্বনিত হইতে লাগিল। একজন সুপুরুষ পাণ্ডা একান্তে দাঁড়াইয়া চামর ব্যজন করিতেছে, উন্নত দীর্ঘ পরিপুষ্ট দেহ, বক্ষে বাহুমূলে ললাটে চন্দনলেখা—উজ্জ্বল শ্যাম মুখশ্রী; আয়ত ঘনপক্ষ্মনেত্রে বিলাসীর ন্যায় ঈষৎ শ্রান্ত কৌতুক দৃষ্টি। ঠিক আমাদের সম্মুখে একটি অতি স্থূলোদর পাণ্ডা মহাদেবের তাণ্ডবনৃত্যের অনুকরণে নৃত্য করিতেছে। শুনিলাম ইনি চিরকুমার, বিশ্বনাথজীর দ্বারবানের কাজ করিয়া থাকেন। তাঁহার লম্ফঝম্পে শরীরের মাংসস্তূপ কাঁপিয়া উঠিতেছে, কখনো ভক্তিতে আত্মহারা হইয়া মহা উল্লাসে নৃত্য করিতেছে, কখনো অনুতাপদগ্ধ, মুক্তিপ্রার্থী অপরাধীর ন্যায় আপনাকে অতি নিষ্ঠুর ভাবে লাঞ্ছনা করিতেছে—কিন্তু এ অভিনয়-মাত্র, ভক্তি এবং অনুতাপ দুয়েরই অভাব। চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিপাত করিতে ত্রুটি হইতেছে না, কে কোথায় দক্ষিণা দিতেছে, কোথায় একটু মিনতি, একটু সুবিধারকম তোষামোদ করিলে প্রণামী কিঞ্চিদধিক পাওয়া যাইতে পারে, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য আছে। মন্দিরের মধ্যে এখনও আরতি চলিতেছে, তালে তালে পঞ্চাশটি প্রদীপ উর্দ্ধে, নীচে, মণ্ডলাকারে বঙ্কিম রেখায় ঘুরিয়া আসিতেছে; অতি সুদৃশ্য, প্রত্যেকেই অতি সুন্দর ভঙ্গীতে আরতি করিতেছে—কিন্তু ভক্ত যে আনন্দে বিহ্বল হইয়া আপনার প্রিয় দেবতার অর্চ্চনা করে, মুখে সে আনন্দের ভাব নাই, এ কেবল বেতনভোগীর নিত্যকর্ম্ম। কোথায় সে উচ্ছ্বসিত প্রীতি, আত্মবিস্মৃত ভক্তি, একমাত্র যাহাই কেবল দেবযোগ্য উপহার—এবং যাহা দেখিয়া আপন হৃদয়কে ভক্তিনম্র করিয়া লইবার আশায় এত দূর এত আগ্রহে আসিয়াছিলাম!

মণিকর্ণিকার ঘাট, এখানকার মহাশ্মশান। শুনিয়াছি এখানে চিতাবহ্নি কখনো নির্ব্বাপিত হয় না—অপর নাম আনন্দ কানন। যথার্থ এখানে মৃত্যুর বিভীষিকা নাই, সম্মুখে উদার গঙ্গা, আশেপাশে মন্দির, স্নানঘাট, নৌকায় করিয়া আরোহীসকল আসিতেছে, যাইতেছে, যাত্রীগণ স্নান করিতেছে, উৎসবের হাসি বাঁশী মন্দিরের পূজার শঙ্খ বাজিয়া উঠিতেছে, তাহারি মাঝখানে ইহলোকের শেষ সংস্কার সাধিত হইতে থাকে। প্রতিদিনের কলরব, জীবনের নিত্য কর্ম্মস্রোত অতি সহজ অবাধগতিতে ইহারি চারিদিকে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে—তাই মনে হয় যেন জন্ম মৃত্যুর মধ্যে কোন মহৎ ব্যবধান নাই—আবর্ত্তমান কালস্রোতে জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখ বিরহ মিলন একই অবিরাম গতিতে ভাসিয়া আসিতেছে, বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই! মৃত্যু সুখেরই মত স্বাভাবিক, বিরহ মিলন দুই-ই অবশ্যম্ভাবী।

আজ ধূলিবহুল নাগরিক পথ ছাড়িয়া যেদিকে চলিয়াছি তাহার দুই ধারে আম্রবীথিকা; আমলকী বৃক্ষের শ্রেণী; মাঝে মাঝে এক একটী ইঁদারা, দুই একখানি বাগান বাড়ী, ক্রমশঃ যখন আরো অগ্রসর হইলাম তখন বাঁধা পথও নাই —মাঠের ভিতর দিয়া আঁকাবাঁকা ভাঙ্গা-চোরা রাস্তা, দুইধারে শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র, কোথাও অবিরল নিবিড় অড়হর ঘনশ্যাম; কোথাও সর্ষপ, পীতাভ পুষ্পে উজ্জ্বল—প্রভাত বায়ু বীজনে কাঁপিয়া উঠিয়া অতি ললিত ভঙ্গীতে হেলিয়া দুলিয়া পড়িতেছে। পথে লোক বড় বেশী নাই, মাঝে মাঝে দু একটী কৃষক কাজ করিতেছে — তরঙ্গায়িত বিশাল প্রান্তর সুদূর দিগন্তে মিশিয়াছে, আকাশে সুন্দর সূর্য্যালোক, চারিদিকে পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা। সারনাথ একটি পুরাতন বৌদ্ধ বিহার—উপরে একটি মণ্ডলাকার স্তূপ—ভূগর্ভে অনেকগুলি কক্ষ আছে—কিন্তু মাঝে মাঝে বড় দস্যুভয় হয়—দস্যুগণ চারিদিকে লুণ্ঠন উপদ্রব করিয়া সেইখানে লুকাইয়া থাকিত, তাই ইংরাজ সেই সকল কক্ষে যাইবার পথ একেবারে গাঁথিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। সারনাথ বিহার অতি ক্ষুদ্রাকার ইষ্টক এবং প্রস্তর-খণ্ডে গঠিত—কিন্তু নির্ম্মাণপ্রণালী এমনি নিপুণ এবং কঠিন যে আজ দুই সহস্র বৎসর একই ভাবে আছে,—এতদিনে কেবল দু একখানি ইষ্টক শিথিল হইতেছে, তবুও ভাঙ্গিয়া পড়িতে আরও দু এক শতাব্দী লাগিবে। ফাটলে দু একটি গাছ গজাইয়াছে, তাহাতে ছোট ছোট বেগুনি রংএর ফুল ফুটিয়াছে, এই প্রকাণ্ড পাষাণ স্তূপের পার্শ্বে সেগুলিকে অতি মৃদু সকরুণ দেখাইতেছে। প্রাচীর গাত্রে বিকশিত এবং স্ফুটোন্মুখ পদ্মসকল খোদিত—কোথাও খোদিত অক্ষরে লেখা আছে "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ"। ইহার নিকট একটি শুষ্ক পুষ্করিণী, চারিদিকে পুরাতন মঠের ভগ্নাবশেষ ছড়াইয়া আছে। মাঠে ত্রিশূলাঙ্কিত পুরাতন তাম্রমুদ্রা, ভগ্ন,অর্দ্ধভগ্ন অনেক প্রকার মূর্ত্তি মাঝে মাঝে খুঁজিয়া পাওয়া যায়—রাখালগণকে দু চার পয়সা দিলে খুঁজিয়া দেয়। অনেকগুলি সুন্দর মূর্ত্তি উদ্ধার করিয়া কাশীর কালেজে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। নিকটেই একটি জৈন মন্দির, বোধ হয় আধুনিক। তাহারি মধ্যে বুদ্ধদেবের মর্ম্মর নির্ম্মিত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত — সিদ্ধার্থ পদ্মাসনে ধ্যানস্তিমিত নেত্রে বসিয়া আছেন, ললাটে ওষ্ঠাধর প্রান্তে একটী প্রশান্ত স্নিগ্ধ হাস্যজ্যোতি। চারিদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া শ্রান্ত হইয়া একটি গাছের ছায়ায় বসিলাম—চারিদিকের অতি সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া দেখিয়া মনে হইল "তোমারি আরতি করে নিখিল ভুবন"—উন্মুক্ত নীলাকাশ, উদার প্রান্তর, শ্যাম শস্যক্ষেত্রে সুন্দর সূর্য্যালোক, বিহঙ্গের কলগান—এই ত বিশ্বদেবের আরতির যোগ্য আয়োজন।

মধ্যাহ্নকাল; দুর্গাবাড়ীর নহবৎখানায় অতি সুমিষ্ট সুরে রসুনচৌকী বাজিতেছে। দেবীর ভোগের সময় সমাগত। মন্দিরের সম্মুখে অনেকগুলি ফুলের দোকান —চন্দনসুগন্ধি করবী, আনীল অপরাজিতা, সুকুমার দোপাটী, রক্তবর্ণ জবা, স্বর্ণবর্ণ গাঁদা—অনেক ফুল অনেক দূর্ব্বাশীর্ষ, বিল্বপত্রের স্তূপ। রসুনচৌকীর করুণ সুর, ফুলের সুগন্ধ মনটাকে আর্দ্র করিল, নম্র মস্তকে মন্দিরে প্রবেশ করিলাম, কিন্তু ভিতরে গিয়াই ভক্তিভাব চলিয়া গেল। পাণ্ডাগণের কি লুব্ধ আগ্রহ, দর্শনী দেও, প্রণামী দেও, পূজা কর, ব্রাহ্মণ ভোজের কিছু দেও। কেবলি দরকষা, আবেদন, মিনতি আর তোষামোদ। দুর্গাবাড়ী রাণীভবানীর কীর্ত্তি —মন্দিরটি সুন্দর সুগঠিত।

আর যতগুলি প্রতিমা দেখিলাম তাহাদের মধ্যে এ প্রতিমাটির গঠন অপেক্ষাকৃত পরিপাটি। এককালে এখানে শত, দুইশত বানর থাকিত, তাহাদের উপদ্রবে যাত্রীগণ অস্থির হইয়া উঠিত; আজকাল তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প, বিংশতির অধিক হইবে না। কিছু আহার্য্য ছড়াইয়া দিলে তাহারা সকলে আসিয়া উপস্থিত হইল। একটি বানরীর বুক জড়াইয়া ধরিয়া তাহার ক্ষুদ্র শিশুটি স্তন্যপান করিতেছে। ছোট্ট একটি রাঙামুখে অতি ছোট ছোট দুটি কাল পুঁথির মত উজ্জ্বল চোখে ফিরিয়া ফিরিয়া আমাদিগকে কৌতূহল দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। কোনও নিষ্ঠুর, একটি বানরের হাতের কিয়দংশ কাটিয়া দিয়াছে; বানরটি অতি করুণ দৃষ্টিতে আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া সেই অক্ষম হাতখানি দেখাইতে লাগিল। মন্দির প্রাঙ্গণের চারিদিকে সাধু সন্ন্যাসীর থাকিবার স্থান। দেখিলাম অনেকে স্নান সমাপন করিয়া পূজা করিতেছে, কেহ চণ্ডীপাঠ করিতেছে—কিছু দিলে দাতার কল্যাণের জন্য সারাদিন চণ্ডীপাঠ করিয়া থাকে।

পথে পথে মন্দিরের পর মন্দির দেখিয়া চলিয়াছি। পথ সঙ্কীর্ণ, প্রস্তর নির্ম্মিত, সুচ্ছায়-শীতল, উভয় পার্শ্বে অতি উন্নত গৃহশ্রেণী সূর্য্যালোক রোধ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। এমন আঁকাবাঁকা, এত মোড় ফিরিতে হয় যে চিনিয়া ফিরিয়া আসা কঠিন।

কালভৈরব কাশীর দ্বারপাল; তাঁহার ভীষণ কৃষ্ণমূর্ত্তি। কিছু দক্ষিণা দিয়া তাঁহার মন্দিরে চামর প্রহার সহ্য করিলে যমদণ্ড হইতে মুক্তি পাওয়া যায়; এ জীবনে আর প্রিয়বিচ্ছেদ-দুঃখ ঘটে না।

বালগোপালের মন্দির—সমস্ত কাশীতে কেবল এই একটিমাত্র বৈষ্ণব মন্দির। প্রবেশ-দ্বারেই আমাদের গলদেশ হইতে দুর্গাবাড়ীর মালাগুলি খুলিয়া ফেলিতে হইল—বৈষ্ণব মন্দিরে শাক্ত কিম্বা শৈব মন্দিরের কোন চিহ্ন লইয়া প্রবেশাধিকার নাই। গোপালজীর মধ্যাহ্ন বিশ্রামের সময় সন্নিকট; আমাদিগকে ত্বরান্বিত হইয়া প্রবেশ করিতে হইল। ভিতরে গিয়া দেখিলাম অতি সুন্দর একটি স্বর্ণনির্ম্মিত দোলনায় বালগোপাল শুইয়া আছেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ মণিমুক্তাখচিত। সম্মুখে স্বর্ণ, রৌপ্য, হস্তিদন্ত, রঞ্জিতকাষ্ঠ-নির্ম্মিত বিচিত্র সুন্দর আকারের বহুবিধ খেল্‌না—রাশীকৃত নীল পীত স্বর্ণ পট্টবস্ত্র, স্বর্ণাঞ্চল উত্তরীয়, সুগন্ধ মালতীমালা, শিখিপুচ্ছ চূড়া মুরলী কিছুরই অভাব নাই। একটি বৃদ্ধ গায়ক আর কয়েকটি বালক তানপুরার সুরে একটি ভজন গাহিতেছে। বৃদ্ধের মুখে এমন একটি ভক্তিগদ্‌গদ ভাব। মন্দিরের পূজারি গোঁসাইজী, যেন একখানি ছবি;—গৌরবর্ণ যুবক— কুঞ্চিত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশ গ্রীবামূল বেষ্টন করিয়া আছে—অলকগুচ্ছ শুভ্র ললাটের উপর পড়িয়াছে। তুলিকাঙ্কিত দীর্ঘ বঙ্কিম ভ্রূযুগল, নাসায় তিলকরেখা, নেত্রে শান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টি, অতি কোমল কমনীয় মুখ। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের দেবতা, সৌন্দর্য্য তাঁহার অধিষ্ঠান ভূমি, তাই তাঁহার মন্দিরে সবই সুন্দর দেখিলাম। এ মন্দিরে দর্শনী কিম্বা প্রণামী দিতে হইল না। শুনিলাম চাহিয়া লয় না, যাহা কিছু ইচ্ছা করিয়া দেও তাহাই গ্রহণ করে। এ পর্য্যন্ত যত মন্দিরে গিয়াছি, সেখানে দর্শনী প্রণামীর জন্য এত উৎখাত হইতে হইয়াছে যে আপনা হইতে কিছু দিবার কথা মনে হয় নাই, গোপালজীর অতুল ঐশ্বর্য্য, সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দু রাজন্যবর্গ তাঁহার পূজক।

সুসজ্জিত বৃহৎ কক্ষ দীপালোকে উজ্জ্বল. কাশীর শ্রেষ্ঠ গায়িকা গাহিতে আসিয়াছে। গায়িকা সুন্দরী নহে, বেশ বিন্যাস সুন্দর, সুরুচির পরিচায়ক। সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে গায়িকা গাহিতেছে "আওত ব্রজচন্দলাল, এয়সি ছবি বনিয়া।" রাধিকা দেখিতেছেন, কুঞ্জপথে শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন, অতি সুমন্দগতি; অতি মধুর বিশ্বমোহন মূর্ত্তি। রাধিকার সেই দেখায়, মুখের উপরে কত ভাবেরই ঢেউ খেলিয়া যাইতে পারে, গায়িকার মুখে সেইসকল ভাবগুলি প্রকাশ পাইতেছে। কখনো লজ্জা, কখনো ঔৎসুক্য, কখনো গর্ব্ব,—আমার যেমনটি এমনটি আর নাই, কখনো স্নেহার্দ্র সকরুণ দৃষ্টি, কখনো অভিমান, কখনো ব্যাকুলতা, দীর্ঘদিন যাহার প্রতীক্ষা করিয়া কাটিয়াছে সে কেন এত ধীরে আসে। কেবলমাত্র কটাক্ষপাতে, ওষ্ঠপ্রান্তের ঈষদ্ধাস্যে, ভ্রূযুগলের আকুঞ্চনে, গ্রীবার ভঙ্গীতে দর্শকের মনে এমন বিবিধ বিচিত্র ভাবের সঞ্চার করিয়া দেওয়া ত কম ক্ষমতার পরিচয় নহে। অথচ চেষ্টার লেশমাত্র নাই। কত বৎসরের শিক্ষা এবং একাগ্রসাধনায়, ভাবের প্রকাশগুলি এমন অকৃত্রিম সুন্দর হইয়াছে জানিতে কৌতূহল হয়। শুনিলাম বহু বৎসরের শিক্ষার ফল, বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া আজও পর্য্যন্ত প্রতিদিন নিয়মিত দুই তিন ঘন্টা অভ্যাস করিতে হয়। গায়িকার বয়স অন্যূন চত্তারিংশৎবর্ষ হইবে।

দ্বিপ্রহরে পথে ধূলা উড়িয়া পড়িতেছে—প্রখর রৌদ্র, উত্তর পবনে শুষ্কপত্র উড়িয়া চলিয়াছে। বরুণাপুল পার হইয়া আমরা ষ্টেসনাভিমুখে চলিয়াছি। সেদিন জ্যোৎস্নালোকে বরুণার উভয় তটে যে সুকুমার সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিলাম আজ আর তাহা নাই।

রেল সশব্দে গঙ্গাপুলে উঠিল—আর একবার বাতায়নে মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, ঊর্ম্মিবহুলা জাহ্নবী রৌদ্রালোকে দীপ্ত গলিত রজতধারা, সুন্দরী কাশী, সেই সৌধশ্রেণী, সেই সোপানাবলী, সেই বেণীমাধবের স্বর্ণধ্বজা। চারিদিক হইতে উচ্চকণ্ঠে হিন্দুস্থানী যাত্রীগণ বলিতে লাগিল—"জয় কাশীজীকি জয়, জয় বিশ্বনাথজীকি জয়, জয় মহারাণী অন্নপূর্ণাজীকি জয়!" আমরাও নম্র মস্তকে চিরন্তন পুণ্যতীর্থভূমি বারাণসীকে নমস্কার করিলাম।

ভারতী, ভাদ্র, আশ্বিন ১৩০৭

৫

পারস্যে বঙ্গ-রমণী

বম্বে হইতে পারস্য উপসাগর (এস্ এস্ — চাকলা)

শরৎরেণু দেবী (রায়)

৫ই আগষ্ট, বৃহস্পতিবার, শুনিলাম যে, পারস্য উপসাগরের মেল-জাহাজ পরদিন ভিক্টোরিয়া ডক হইতে ছাড়িবে। প্রথমে এইরূপ স্থির ছিল যে, আমার স্বামী একাকীই যাইবেন; কিন্তু পরে, আমারও তাঁহার সঙ্গে যাওয়া স্থির হইল শুনিয়া, অতিশয় আনন্দিত হইলাম; কারণ, কখন সাগরের জাহাজে চড়ি নাই। তারপর বাঙ্গালীর মেয়ের পারস্য-দেশ-ভ্রমণ, ইহাও সচরাচর ঘটে না। অতিশয় উৎসাহের সহিত জিনিসপত্র গোছাইতে লাগিলাম। আমি রাস্তায় জাহাজের রাঁধুনির রান্না ভাত-তরকারি খাইব না, সেজন্য যথেষ্ট পরিমাণে ফল ও মিষ্টান্নাদি লইবার বন্দোবস্তও হইল। দেখিতে দেখিতে সেদিন কাটিয়া গেল। পূর্ব্বে কয়দিন হইতেই বম্বেতে খুব বৃষ্টি হইতেছিল; কিন্তু আমাদের যাত্রার দিন, শুক্রবার সকালে, একেবারে বৃষ্টি থামিয়া গেল; আকাশ পরিষ্কার হইল; রোদ উঠিল।

৬ই আগষ্ট, শুক্রবার। —আজ সকাল হইতেই জিনিসপত্র বাঁধাবাঁধি হইতে লাগিল। আমাদের পাশের ঘরে একটি গুজরাটী পরিবার ছিল। আমরা যাইব শুনিয়া তাহারা বড়ই দুঃখিত হইল। স্বামীর সঙ্গে বহু দূরদেশে যাইতেছি এবং স্বামীর সুখ-দুঃখের সর্ব্বদা অংশভাগিনী হইতে পারিব বলিয়া অনেকে আমাকে সৌভাগ্যবতী বলিয়া উল্লেখ করিল। এই অল্পদিনের মধ্যেই তাহারা সকলেই আমাদের বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিত।

বেলা ২ টার সময় দুইখানি ভিক্টোরিয়া করিয়া আমরা 'কালবা দেবী' হইতে যাত্রা করিলাম। প্রথমেই B. I. S. N. Company'র—সমুদ্রের ধারের আফিসে গিয়া টিকিট খরিদ করিয়া লওয়া হইল। বম্বে হইতে মেহোমেরা ২য় শ্রেণীর একখানি টিকিটের ভাড়া মায়-খোরাকী ১২০ টাকা; আমরা জাহাজের খাবার খাইব না, সেইজন্য আমাদের ৯৬ টাকা লাগিল। সেখান হইতে আবার আমরা গাড়ী করিয়া ডকে আসিলাম। আসিবার সময় বম্বের বাড়ীঘরগুলি যেন অতি সুন্দর বলিয়া মনে হইতে লাগিল; বোধ হয় অনেকদিন দেখিতে পাইব না বলিয়াই হউক, বা বম্বে ছাড়িয়া যাইতেছি বলিয়াই হউক, এইরূপ মনে হইতেছিল। ১৬নং ভিক্টোরিয়া ডকে, আমাদের লইয়া যাইবার জন্য "এস, এস, চাকলা" দাঁড়াইয়া ধূম উদগীরণ করিতেছিল। জাহাজের সিঁড়ির নিকট লোকে লোকারণ্য। কত লোক,—হিন্দু, মুসলমান, সাহেবের ভিড়। আমাদের মালগুলি গাড়ী হইতে নামান হইল। একজন মুটে বলিল, 'কাষ্টম' আসিয়া আমাদের

জিনিসপত্র পাস করিলে তবে মাল উঠান হইবে। আমার স্বামী কাষ্টম অফিসারকে ডাকিয়া আনিলেন। সাহেব একেবারে মসীবর্ণ। স্বদেশী সাহেব হইলেও আমাদের হায়রাণ না করিয়াই, মালের উপর খড়ি দিয়া Passed লিখিয়া দিলেন; জিনিসপত্র জাহাজে উঠিল; সঙ্গে-সঙ্গে আমিও জাহাজে গিয়া উঠিলাম। জাহাজ ছাড়া অবধি উপরে থাকিব, সেইজন্য একধারে ডেক-চেয়ার পাতিয়া বসিয়া রহিলাম। অনেক সাহেব উঠিল, মেমেরাও তাহাদের রাখিতে আসিল; অনেক ফিরিঙ্গি ও গোয়ানিস সাহেবও উঠিল। স্ত্রীলোক খুব কমই উঠিল, মাত্র কয়েকজন মহারাষ্ট্রী স্ত্রীলোক ডেকে উঠিল ও একজন মুসলমান স্ত্রীলোক আপাদমস্তক আলখেল্লায় আবৃত করিয়া জাহাজে উঠিল। ২য় শ্রেণীতে দেশী কি বিলাতী স্ত্রীলোক একেবারেই ছিল না।

আমাদের জাহাজখানি তিনতলা। একতলায় ডেক-যাত্রীগণের ও খালাসীদের থাকিবার স্থান। এবং মেন ডেকের মধ্যস্থলে জাহাজের Engine Room ও ২য় শ্রেণীর কামরা ও খাইবার Saloon ও মেন-ফোরডেকে (Main foredeck) কতকগুলি সৈন্য যাইতেছিল। ডেকের যাত্রিগণকে উপরের Twin deck-এ Hatch-এর উপর বা foredeck-এও যাইতে মানা ছিল না; তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের বসিবার বা বেড়াইবার স্থান একেবারেই ছিল না, কারণ দ্বিতীয় শ্রেণীগুলি এঞ্জিনঘরের পিছনে বলিয়া ভয়ানক গরম। প্রত্যেক ক্যাবিনে তিনটি করিয়া Berth ও একটিমাত্র Port-Hole. ক্যাবিনে থাকা ভয়ানক কষ্টকর। তাহার উপর দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্যাবিন হইলেও ক্যাবিনের ভিতর বৈদ্যুতিক পাখার বন্দোবস্ত ছিল না; বিছানাআদির বন্দোবস্তও অতি জঘন্য। জাহাজের কর্ত্তৃপক্ষের এসব বিষয়ে ঔদাসীন্যের জন্য যাত্রীগণকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। প্রথম শ্রেণীর ক্যাবিনগুলি উপরে Twin deck-এর উপর। ঐ সকল ক্যাবিনের নিকটেই Engineer-দের Cabin। আমাদের জাহাজে ৫ জন Engineer ও ৫ জন Officer ছিল; তাহা ছাড়া দেশীয় লস্কর প্রায় ৭০/৮০ জন। এরা সকলেই হিন্দু গুজরাটী; জাহাজের কাপ্তেন ও অফিসারগণের ও ডাক্তারের ক্যাবিন Bridge deck-এর উপর। Persian Oil Companyর প্রায় ৬০/৭০ জন কর্ম্মচারী এই জাহাজে যাইতেছিল; সেইজন্য দ্বিতীয়শ্রেণীতে একটিও Berth খালি ছিল না। আমাদের নাম লেখা Berth-গুলিও অন্য লোক আগে হইতে আসিয়া দখল করিয়াছিল। Steward, এমন কি Chief Officer-কে বলিয়াও আমরা আমাদের Berth পাইলাম না। বেলা ২ টায় জাহাজ ছাড়িবার কথা ছিল; কিন্তু বেলা সাড়ে তিনটায় জাহাজ ছাড়িল। জাহাজ ছাড়িবার আগে কতকগুলা সাহেব জাহাজের রেলিংয়ের নিকট হুড়াহুড়ি করিতে-করিতে একজনের মাথা হইতে টুপি সমুদ্রের জলে পড়িয়া গেল। তখন তাহার হাসিখুসি বন্ধ হইয়া গেল; সে মুখ চুণ করিয়া বলিতে লাগিল, "আমার টুপির দাম ১৭ টাকা।" অনেক গৌরাঙ্গ ডেকের উপর দাঁড়াইয়া-ছিলেন, টুপিটা তুলিয়া দিতে কেহই সাহায্য করিলেন না। পরে একজন কালা ভারতবাসী জলে ঝাঁপ দিয়া সাহেবের আর্দ্র টুপিটি তুলিয়া দিয়া একটি আধুলিমাত্র উপার্জ্জন করিল।

জাহাজ ছাড়িয়া দিল। আমারা ক্যাবিনের Berth পাই নাই; সেজন্য Hatch- এর

উপর জায়গা করিয়া বসিলাম। Steward বলিয়াছে একটু পরে সে আমাদের ক্যাবিন ঠিক করিয়া দিবে। জাহাজ ছাড়িবার ঘন্টাখানেক পরে আমার মনে হইল যে, জাহাজ বোধ হয় সমস্ত রাস্তা এইরকম যাইবে, কারণ জাহাজ তখনও একটুও দুলিতেছিল না। পূর্ব্বে যখন ঢাকায় যাইতাম, তখন ঐরূপই চলিত; অবশ্য ঢাকার জাহাজ অপেক্ষা এই জাহাজ অনেক বড়। সে জাহাজ পদ্মায় চলিত এবং এই জাহাজ সমুদ্রে চলিতেছে; তথাপি এ জাহাজ দুলিতেছে না। শুনিয়াছিলাম যে, সমুদ্রে জাহাজ খুব দোলে, কিন্তু এ জাহাজ দুলিতেছে না দেখিয়া আমি আমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "জাহাজ ত দুলিতেছে না? ইহা ত ঠিক ঢাকার জাহাজের মতই চলিতেছে।" তিনি বলিলেন, গভীর সমুদ্রে যখন আসিবে তখন জাহাজ দুলিবে। দেখিতে দেখিতে বম্বের পাহাড় ও Reefs আর দেখা গেল না। ক্রমেই আমরা অকূল সমুদ্রে আসিয়া পড়িলাম। সন্ধ্যা হইল, জাহাজ চলিতে লাগিল। এখনও দুলে নাই। আমার স্বামী আমাকে ঘন ঘন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে, আমার গা-বমি-বমি করিতেছে কিনা। প্রকৃতপক্ষে তখন আমার গা-বমি-বমি করে নাই; তবে যখন বড় বড় ঢেউয়ের ধাক্কায় আমাদের জাহাজ নড়িতেছিল, তখন আমার গায়ের ভিতরে শিহরিয়া উঠিতেছিল। আমাদের নিকটেই একটি নববিবাহিত গোয়ানিস খৃষ্টান-দম্পতী Mohammerah-য় যাইতেছিল।[১] রাত্রিতে হাওয়া বাড়িল; বৃষ্টিও সামান্য দুই-একপসলা হইল। আমি বেশ ঘুমাইলাম। তার পরদিন সকালেও আমাদের ক্যাবিন ঠিক হইল না। আমার স্বামী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি নীচে যাইতে পারিব কিনা। তখন যদিও আমার গা-বমি-বমি করিতেছিল না, কিন্তু জাহাজ অত্যন্ত দুলিতেছিল বলিয়া চলিবার সময় আমার পা ঠিক থাকিতেছিল না। আমি স্নানাগারে গেলাম। উহা নীচে দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্যাবিনের নিকট। সেখানে অতিরিক্ত গরমের জন্যই হউক বা অপর কোন কারণেই হউক আমার বমি হইল; এবং সেই থেকে Sea-Sickness সুরু হইল। উপরে ডেকে আসিলাম। মাথা খুব ঘুরিতেছে। স্বামী আমায় ধরিয়া আনিয়া বিছানায় শোয়াইলেন। দিনের মধ্যে অনেকবার বমি করিলাম। আজ বাতাস খুব বাড়িয়াছে ও জাহাজও দুলিতেছে। আমি প্রায় সমস্তদিন অনাহারে চোক বুজিয়া পড়িয়া রহিলাম। আজও আমাদের Berth পাওয়া গেল না। শুনিলাম, কাল আমাদের জাহাজ করাচি পৌঁছিবে। রাত্রিতে বাতাসও বাড়িল, বৃষ্টিও হইতে লাগিল। এইরকম ভাবে আমাদের দিন কাটিতে লাগিল। আমরা মনে করিলাম আমরা ক্যাবিনে জায়গা পাইব না। রবিবার সকালে আমার স্বামী আমাকে আসিয়া বলিলেন যে, আমাদের ২য় শ্রেণীতে বার্থ পাওয়া গিয়াছে। আমার কিন্তু ক্যাবিনে যাইতে ইচ্ছা হইতেছিল না; কারণ ক্যাবিন যে খুব গরম, তা আমি নীচে স্নানাগারে ২/১ বার গিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আমার স্বামী আপত্তি শুনিলেন না; আমাকে ধরিয়া-ধরিয়া নীচে ক্যাবিনে লইয়া গেলেন। যাইবার সময় আমার মাথা অত্যন্ত ঘুরিতে লাগিল; গা-বমি-বমিও বৃদ্ধি পাইল। ক্যাবিনে গিয়া শুইয়া পড়িলাম। যাহা মনে করিয়াছিলাম তাহাই—ক্যাবিন অত্যন্ত গরম। মাত্র একটি পোর্ট-হোল, সমুদ্রের ঢেউ বড় বেশী। পোর্ট-হোল খুলিয়া রাখিলে ক্যাবিনে জল আসে, তাই পোর্ট-হোলটিও বন্ধ। উপরে খুব হাওয়া ছিল। একেবারে বন্ধ ক্যাবিনে আসিয়া শরীর খুব অসুস্থ বোধ করিতে

লাগিলাম; কয়েকবার বমিও করিলাম। স্বামী আমার নিকটে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। বমি বন্ধ করিবার জন্য নেবু ইত্যাদি শুঁকিয়াও বমির হাত হইতে নিস্তার পাইলাম না। কিরূপে দুইদিন পরে আমাদের ক্যাবিনে জায়গা পাওয়া গেল, পরে আমার স্বামীর নিকট জানিতে পারিলাম। বম্বে হইতে ২৪/২৫ জন গোয়ানিস ও পার্সী ইন্‌জিনিয়ার চাকরী লইয়া মেহোমেরা যাইতেছিলেন। প্রথমে আমি যেখানে ডেকে শুইয়াছিলাম, সেখানে একজন পার্সী আসিয়া আমার স্বামীর সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়াছিলেন। ক্রমে অন্যান্য পার্সীর সহিতও আমার স্বামীর আলাপ হইল। খুব সম্ভব, তাঁহারা তাঁহাদের সঙ্গী Engineer-দের গিয়া আমার অবস্থা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। Mr. Andrews নামক একজন Engineer অগ্রণী হইয়া আমার স্বামীকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা ২টি বার্থ ছাড়িয়া দিতে রাজী আছেন এবং তাঁহারা ইচ্ছা করেন যে, আমি ও আমার স্বামী তাঁহাদের বার্থ অধিকার করি। প্রত্যেক ক্যাবিনে ৩টি করিয়া বার্থ। আমাদের ক্যাবিনে অপর একটি বার্থে Mr. Boother নামক একজন মান্দ্রাজী খৃষ্টান ছিলেন। তিনি থাকাতে আমাদের উপকার বই অনুপকার হয় নাই। তা ছাড়া তিনি সমস্ত দিন বাহিরে বাহিরে ঘুরিতেন এবং রাত্রে গিয়া Bridge-এর নীচের ডেকে শুইতেন। তিনি প্রায়ই আমার খবর ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতেন। শুধু তিনি নহেন, সকল Engineer-ই ঠিক যেন আত্মীয়ের ন্যায় প্রতি মুহূর্ত্তে আমার খবর আমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন ও আমাকে খাইতে দিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। আমার স্বামী মাঝে মাঝে আমাকে সোডা ও দুধ চামচে করিয়া দিতে লাগিলেন, কিন্তু খাইবার পর মুহূর্ত্তেই বমি হইয়া সমস্ত উঠিয়া যাইতে লাগিল। দিন গেল, রাত্রি আসিল, আমার শারীরিক ভাব সেইরূপই রহিল।

সোমবার সকালে ঘুম ভাঙ্গিতেই শুনিলাম যে, আমরা করাচি পৌঁছিয়াছি। আজ প্রথমে বাথরুমে গিয়া স্নান করিতে পারিলাম ও উপরের ডেকে গিয়া ডেক-চেয়ারে বসিলাম। বেলা ১২টায় আমরা জাহাজ হইতে নামিয়া, ছোট বোটে করিয়া করাচী সহর দেখিতে চলিলাম। জাহাজের গায়ে সিঁড়ি লাগান ছিল। সেই সিঁড়ি দিয়া অনায়াসে নামিয়া নৌকায় উঠিলাম। অন্য সময় হইলে ঐরকম সিঁড়ি দিয়া নামিতে ভয় হইত; কিন্তু এখন আর আমার ভয়-ডর বেশী নাই। নৌকা করিয়া গিয়া আমরা কিয়ামারী নামক স্থানে নামিলাম। বম্বে ছাড়িবার পর আজ এই প্রথম মাটিতে পা দিলাম। বেলা ১২ টার সময় রৌদ্র খুব বেশী; তবে কয়দিনের পর মাটিতে নামিতে বড় আনন্দ হইল। আমরা নৌকা করিয়া এই করাচি বন্দরে আসিতে একখানি Cruiser ও অন্য ২/১ খানি জাহাজও দেখিলাম। করাচির বন্দর যে স্থানে, সেই স্থানের নাম কিয়ামারী। এখান থেকে ট্রাম একেবারে সহরের Market পর্য্যন্ত গিয়াছে। ট্রামগুলি ইলেক্‌ট্রিক হইলেও খুব ছোট; চারিদিক খোলা; বসিবার স্থানগুলিও অপরিসর; বম্বে বা কলিকাতার ট্রাম অপেক্ষা অনেক অংশে নিকৃষ্ট—ভাড়া অবশ্য এক আনা। এখানে আমাদের ভারতবর্ষের মুদ্রা সিকি, দুয়ানি, পয়সা সবই চলে। আমরা একখানি 1st Class Victoria ভাড়া করিয়া সহর দেখিতে গেলাম। বন্দর পার হইয়া কিছুদূরে একটি সুন্দর পোল পার হইলাম। পোলের নীচে খালে সমুদ্রের জল আসে, উহাতে লোকেরা স্নানাদি করিতেছে। বেশ বাঁধান ঘাট আছে।

পোল পার হইয়া কতকগুলি সুন্দর বাঙ্গলা দেখিতে দেখিতে একটি উচ্চ 'টাওয়ার'-এর নিকট আসিলাম। উহার উপরে ঘড়ি আছে। ক্রমে অপরিসর গলি-রাস্তা দিয়া সহরের বাজারে আসিলাম। ছোট ছোট দোকান ও অপরিসর রাস্তা; বাড়ীগুলির জানালা ইত্যাদি অনেকটা আমাদের কলিকাতার ফ্যাসানের। হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান দোকানদার ও অধিবাসীর সংখ্যাই যেন বেশী বলিয়া আমার মনে হইল। রাস্তা এত ছোট যে, একখানির বেশী গাড়ী রাস্তা দিয়া যাইতে পারে না। মাঝে-মাঝে দুই-একখানি খাবারের দোকানও দেখিতে পাইলাম। মলিন ছিন্নবাস পরিহিত মিষ্টান্ন বিক্রেতাকে উপবিষ্ট দেখিয়াই বুঝিলাম যে, সে হিন্দু ও সিন্ধি। জিনিসপত্রের দাম এখানে বম্বে অপেক্ষা অনেক বেশী। লেমন সিরাপ কিনিলাম। দোকানদার অবশ্য উৎকৃষ্ট লেমন সিরাপ বলিয়াই আমাদের দিল এবং উৎকৃষ্ট লেমন সিরাপের দামও লইল। হ্যারিকেন ইত্যাদি দর করিয়া জানিলাম, বম্বের দিগুণ দাম। ক্রমে গাড়ী করিয়া ফলের বাজারে গেলাম। আঙ্গুর ৫/৬ আনা সের ও বেশ বড় বড়; আমও বম্বের চেয়ে সস্তা। অনেক রকম নূতন ফল দেখিলাম; এ সকল ফল কলিকাতায় বা বম্বেতে দেখি নাই। কিছু ফল কিনিয়া টোঙ্গা ভাড়া করিয়া পুনরায় কিয়ামারী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। বেলা ২টার সময় আবার করাচি বন্দরে ফিরিয়া আসিলাম। আমাদের নৌকা ঘাটেই ছিল। নৌকায় উঠিয়া আমার স্বামী নৌকাওয়ালাকে কোয়ারেণটাইন্ ষ্টেসনে যাইতে বলিলেন। বম্বে হইতে আসিবার সময় আমাদের ডাক্তারী পরীক্ষা হয় নাই; করাচিতে হইবে শোনা গিয়াছিল। কোয়ারেণটাইন্ ষ্টেসনে যাওয়া কিন্তু আমাদের বৃথা হইল; কারণ বেলা ৩টার পূর্ব্বে চিকিৎসক কোয়ারেণটাইন ষ্টেসনে আসেন না। আমরা বিফল-মনোরথ হইয়া জাহাজে ফিরিয়া আসিলাম।

করাচি বন্দর থেকে ফিরিয়া আসিবার পর বেশ ভাল বোধ করিতে লাগিলাম; তবে ক্যাবিনের ভিতর দুপুরের সময় যে অসহ্য গরম! বেলা ৩টায় একখানি ছোট ষ্টীমারে করিয়া জাহাজের খালাসী ও অন্যান্য দেশীয় কর্ম্মচারীবৃন্দ ও খানসামা, কুক ইত্যাদি সকলে কোয়ারেণটাইন ষ্টেসনে গেল; ডেক প্যাসেঞ্জারদেরও তার পরের বারে ঐ ছোট ষ্টীমারে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য লইয়া গেল। তাহারা যখন সকলে ফিরিয়া আসিল, তখন দেখা গেল ডাক্তারী পরীক্ষায় পাসের চিহ্ন-স্বরূপ তাহাদের হাতের এক স্থানে একটি করিয়া রবার-ষ্ট্যাম্পের ছাপ; উহাতে লেখা আছে Passed। করাচি হইতে অনেক লোক জাহাজে উঠিল; ৫/৬ জন পাঞ্জাবী স্ত্রী-পুত্র লইয়া জীবিকা উপার্জ্জনের নিমিত্ত পার্সিয়ান গাল্ফে যাইতেছে। তাহা ছাড়া অনেক হিন্দুস্থানীও উঠিল; তাহারা অধিকাংশই মজুরী করিতে বসরা যাইতেছে। বিকালে আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিল না। আজ আমি আহারাদিও করিতে পারিলাম; রাত্রেও ঘুমাইলাম। আজ আর Sea-Sickness নাই। পরদিন ঘুম ভাঙ্গিতেই বুঝিতে পারিলাম যে, জাহাজ চলিতেছে; শুনিলাম ভোরবেলা জাহাজ করাচি থেকে ছাড়িয়াছে। অল্পক্ষণ জাহাজ চলিবার পরই আবার জাহাজ দুলিতে লাগিল, আমিও আবার আগেকার মত বমি করিতে আরম্ভ করিলাম। খাইবার মধ্যে খালি কনডেন্স মিল্ক ও সোডা খাইতে লাগিলাম; তাহাও বমি করিতে লাগিলাম। বিকালে যখন কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ার আমার খবর লইতে আসিলেন, তখন তাঁহারা শুনিলেন যে, আমি

আজ অনেকবার বমি করিয়াছি। শুনিয়া তাঁহারা আমাকে নূন-জল খাওয়াইতে বলিলেন; নূন-জল খাইলে একবার বমি করিয়া আর বমি হইবে না। বমির হাত হইতে নিস্তার পাইব বলিয়া আমি নুন-জল খাইতে রাজী হইলাম। তাঁহারা তখন এক গ্লাস খাঁটী সমুদ্রের নীলবর্ণ নুন-জল আনিয়া দিলেন। তখন Mr. Andrewsও আসিলেন। তিনি এক গ্লাস খাইতে বারণ করিলেন; আমি আধ গ্লাস খাইলাম। তখন কেহ আমাকে অল্প খাইবার, কেহ বেশী খাইবার, কেহ কিছু না খাইবার ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু Mr. Andrews দুধ ও সোডা খাওয়াইবার জন্য বলিয়া গেলেন। তাহার পর ঘন-ঘন আসিয়া তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে আমি বমি করিয়াছি কি না; কিন্তু আমি নুন-জল খাওয়ার পর হইতে সেদিন ত বমি করিলামই না, তাহার পরদিনও বমি করিলাম না।

১০ই আগষ্ট ভোরে আমরা করাচি ছাড়িয়াছি; ১১ই আগষ্ট বেলা ১১টা-১২টার সময় আমরা মস্কাট বন্দরে পৌঁছিলাম। এ বন্দরটি সুন্দর, যদিও জেটী নাই। নৌকা করিয়া জাহাজে আসিয়া উঠিতে হয়। সমুদ্রের নিকট অনেকগুলি সুন্দর-সুন্দর বাড়ী দেখিতে পাইলাম। আমাদের জাহাজ তীরের নিকটেই থামিল। আমাদের দেশে জেলের ডিঙ্গির চেয়েও কম চওড়া এক-রকম লম্বা-লম্বা নৌকায় করিয়া লোক জাহাজে আসিতে লাগিল। জাহাজের একজন সাহেব ডাকের ব্যাগ লইয়া জাহাজের জালি-বোটে করিয়া সহরে গেল। যেখানে আমাদের জাহাজ থামিল, তাহার অনতিদূরেই সমুদ্রতীরে একটি উচ্চ দুর্গের মত প্রাচীর-দেওয়া গম্বুজ। উহার উপরে পতাকা উড়িতেছে। উহা Flag-station মনে করিয়াছিলাম। এখান থেকে ফল কিছু কিনিব ভাবিয়াছিলাম; কিন্তু ঐ স্থানে এ সময় কোন ফলই পাওয়া যায় না। মস্কাটী হালুয়া, মাছ, খেজুর ও মদ বিক্রি করিতে পার্সিয়ানরা জাহাজের উপর আসিল। সমুদ্রের তীরে পাহাড়ের গাত্রে খোদিত অনেকগুলি নাম দেখিতে পাওয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, কোন জাহাজ প্রথমবারে মস্কাটে আসিলে ঐরূপভাবে জাহাজের নাম খোদা হয়। ঐরূপ অনেকগুলি নাম খোদা আছে। ঐ খোদাই করিবার জন্য লোক নিযুক্ত আছে। ঐরূপ খোদাই করিবার উদ্দেশ্য কি, বুঝিলাম না। করাচি হইতে এক সিন্ধি যুবক ব্যবসা করিবার উদ্দেশে বসরা যাইতেছে। সে আমাদের এক টিনের গোল বাস্কে করা এক বাস্ক করাচি-হালুয়া দিল। উহা খাইতে মিষ্টি, তাই খাইতে পারিলাম না। এই যুবক আমাদের প্রতি অতি অল্পদিনেই আকৃষ্ট হইয়া পড়িল ও বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ ও যত্ন করিতে লাগিল।

মস্কাট হইতে জাহাজ ৫টার সময় ছাড়িল। এখান হইতে জাহাজের দোলা বন্ধ হইল; সমুদ্রও বেশ শান্ত, আমিও দারুণ sea-sickness হইতে আরোগ্যলাভ করিলাম। এইখানে উল্লেখ করা উচিত, অপরিচিত দেশী খ্রীষ্টান ইঞ্জিনিয়ার Mr. Andrews ও অন্যান্য সকলে আমার sea-sickness-এর সময় দিনে ৪/৫ বার করিয়া খবর লইতেন। তাঁহারা আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী; কিন্তু তাঁহাদের যত্ন ও সহানুভূতি আমরা জীবনে ভুলিতে পারিব না।

১৪ই আগষ্ট বেলা ২টার সময় আমরা বুশায়ার নামক স্থানে পৌঁছিলাম। এখানে ১৪

জন পার্সিয়ান বন্দীকে সশস্ত্র প্রহরীরক্ষিত করিয়া আমাদের জাহাজে আনা হইল। এই কথা শুনিয়া দেখিতে গেলাম। তাহাদের অধিকাংশই ব্যবসাদার শ্রেণীর লোক, ২/১ জন নীচজাতীয় লোক; একজন চাকুরীজীবী কেরাণীও উহার মধ্যে ছিল। তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, তাহারা ইংরেজরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য সাধারণকে উত্তেজিত করিয়াছিল। খানিক পরে তাহাদের পুনরায় জাহাজ হইতে নামাইয়া দেওয়া হইল। তাহারা অন্য জাহাজে করিয়া বসরা চালান যাইবে বলিয়া শুনা গেল। অনেক লোক বুশায়ার হইতে জাহাজে উঠিল। আমাদের ক্যাবিন হইতে উঠিয়াই যে ডেক, সেই ডেকে ডাকের Sorting বিভাগের কর্ম্মচারীরা জাহাজে উঠিয়া ডাক sort করিতে আরম্ভ করিল। ২/১ দিন রাত্রে ক্যাবিনে অসহ্য গরম হওয়াতে আমরা ডেক-চেয়ারে রাত্রি কাটাইয়াছিলাম; কিন্তু এখন উপরের Deck-এ এত ভিড় যে, ক্যাবিনে প্রাণ আই-ঢাই করিলেও উপরে এত পুরুষের ভিড়ের মধ্যে যাইয়া বসা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব।

বুশায়ার হইতে জাহাজ ছাড়িয়া তার পরদিন অর্থাৎ ১৫ই আগস্ট রবিবার, বেলা ৪টার সময় আমরা মেহোমেরা পৌঁছিলাম। বুশায়ার হইতে আমার স্বামীর খুব জ্বর হওয়াতে আমি বড়ই ভয় পাইয়াছিলাম। নামিবার সময়ও তাঁহার খুব জ্বর ও মাথার বেদনা ছিল। আজ সকালে জাহাজের ডাক্তার আসিয়া আমার স্বামীকে ঔষধ দিয়া গেলেন। আমরা ঘুমাইতেছিলাম, ক্যাবিনে দুপুরে আগুনের মত গরমে কোনদিন ঘুমাইতে পারি নাই; কিন্তু আজ এত গরমেও যে আমরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, ইহা খুব আশ্চর্য্যের কথা। যখন জাহাজ মেহোমেরা পৌঁছে তখন আমরা নিদ্রিত। একজন ইঞ্জিনিয়ার আসিয়া আমাদের জাগাইয়া বলিলেন যে, আমরা মেহোমেরাতে পৌঁছিয়াছি। আমরা তাড়াতাড়ি করিয়া উঠিয়া, নামিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমার স্বামী জ্বরে ধুঁকিতে-ধুঁকিতেই উঠিলেন। জিনিসপত্র তার আগেই সিন্ধি যুবকের চাকরের সাহায্যে ঠিক্ করা ছিল। আমার স্বামী নৌকা ও কুলীর ব্যবস্থা করিতে উপরে গেলেন, আমি ক্যাবিনে রহিলাম। প্রায় ১৫ মিনিট পরে জাহাজের ভোঁ বাজিল। তখন আমি ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেলাম; ভাবিলাম হয়ত আমরা নামিতে পারিলাম না। জাহাজ এখনি ছাড়িয়া দিবে; নীচে হয়ত আমাদের মালপত্রও নামান হইয়াছে; আমার স্বামী নৌকায় নামিয়া গিয়াছেন। এইসব নানা ভাবনায় আমি কাতর হইয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিলাম।

প্রায় আধ ঘন্টা পরে আমার স্বামী আমাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। জিনিসপত্র সিন্ধি যুবক কতক নিজে কতক কুলি ও জাহাজের বয়ের দ্বারা লইয়া গেলেন। আমার স্বামী নামিবার সিঁড়ির নিকট ছিলেন, দেখিলাম। তাঁহার নিকট জানিলাম যে, তিনি নৌকা ঠিক করিতে পারেন নাই। নামিবার মাত্র একটি সিঁড়ি; সেই সিঁড়ি দিয়া ডেক প্যাসেঞ্জার, 2nd class, 1st class প্যাসেঞ্জার ও তাহাদের মালপত্র নামিতেছে; সুতরাং সিঁড়িতে অতিশয় ভিড় ও ঠেলাঠেলি। আমার স্বামীর শারীরিক কাতর অবস্থা দেখিয়া ঐ দয়ার্দ্র-হৃদয় সিন্ধি যুবক আমাদের একখানি নৌকা করিয়া দিয়া, আমাদের জিনিসপত্র নৌকায় নামাইবার জন্য কুলী ইত্যাদি ঠিক করিয়া দিলেন। আমরা দুইজনেই ভগবানকে একমনে ডাকিতেছিলাম; বোধ হয়

তাহারই ফলে সিন্ধি যুবক অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের সাহায্য করিতেছিলেন। জাহাজ ছাড়িতে ৫ মিনিট আছে, এমন সময়ে আমরা তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া নৌকায় নামিয়া গেলাম। আমরাও নৌকায় উঠিয়াছি, এমন সময়ে জাহাজের সিঁড়িও উঠাইয়া লওয়া হইল। আর এক মিনিট দেরী করিলে আমাদের জাহাজে থাকিয়া যাইতে হইত। অনেক আরোহী মেহোমেরায় নামিতে পারিল.না; একজন গোয়াবাসী খ্রীষ্টান ভদ্রলোক ও তাঁহার স্ত্রী নামিতে পারিলেন না। আমাদের ক্ষুদ্র তরণী একটু দুরে যাইতে না যাইতেই জাহাজ মৃদুমন্দ-গমনে অগ্রসর হইল। প্রায় ২৫/৩০ জন মেহোমেরাতে নামিবার আরোহী, তাড়াতাড়ি জাহাজ ছাড়িয়া দেওয়াতে, নামিতে পারিল না। এখানে নামিবার সময় আমাদের সর্ব্বপ্রধান অসুবিধা এই হইয়াছিল যে, আমরা, কি নৌকার মাঝি কি আরব বা পার্সীয়ান কুলী, কাহারও কথা বুঝিতে পারিতেছিলাম না। আমাদের নৌকা ছাড়িবার সময় Mr. Di Sa—পূর্ব্বলিখিত গোয়াবাসী ভদ্রলোক—তাঁহাকে ও তাঁহার স্ত্রীকে আমাদের নৌকায় লইবার জন্য ইঙ্গিত করায় আমাদের নৌকাওয়ালাকে বলাতে সে আমাদের নৌকা পুনরায় জাহাজের নিকট লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু জাহাজ ছাড়িয়া দেওয়াতে তাঁহারা নামিতে পারিলেন না। জাহাজের 2nd officer আমাদের নৌকা জাহাজের নিকট দেখিয়া শীঘ্র দূরে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন এবং নৌকাওয়ালাও কৌশল সহকারে নৌকার গতি ফিরাইয়া জাহাজ হইতে দূরে লইয়া আসিল। যেখানে আমরা নামিলাম, উহা কারূণ নামক নদী, কিন্তু কারূণ ও ইউফ্রেটিসের সঙ্গমস্থান বলিয়া ঐখানে নদী অত্যন্ত গভীর ও নদীর টান প্রবল। বলা বাহুল্য, এইরূপ নদীর উপর যদি আমাদের ক্ষুদ্র তরণী জাহাজের ধাক্কা খাইত বা পিছনের ঢেউয়ে পড়িত, তাহা হইলে কারূণের জলের ভিতরেই আমাদের চিরনিদ্রায় অভিভূত হইতে হইত। আমাদের জাহাজের যাঁহারা মেহোমেরাতে নামিয়াছিলেন, সকলেই আমাদের আগে চলিয়া গিয়াছেন। একে বিদেশ, তারপর আরব মাঝিদের কথা একবর্ণও বুঝিতে পারিলাম না। তাহারা আমাদের কোথায় লইয়া যাইতেছে, তাহাও জানি না। আমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, আমরা কাষ্টম হাউসে যাইতেছি। ২৫/৩০ মিনিট পরেই হোগলার ছাউনি দেওয়া দুইখানা ঘর দেখা গেল। উহাই কাষ্টম হাউস। আমাদের সঙ্গী ইঞ্জিনিয়ারেরা সেখানে মালপত্র সহ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, দেখিলাম। সেখানে আসিয়া দেখিলাম সকলের মুখে দারুণ দুঃখের চিহ্ন, সকলেই সহানুভূতি-সূচক বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন। পরে উহার কারণ জানিয়া আমরাও সাতিশয় দুঃখিত হইলাম। জাহাজের যে সমস্ত পাঞ্জাবী স্ত্রী-পুত্র লইয়া পার্সিয়ান গাল্‌ফে আসিতেছিল, তাহারা জাহাজ হইতে এইখানে অবতরণকালে নৌকার অভাবে একটি জনপূর্ণ বালামে (নৌকায়) উঠিতে বাধ্য হয়। হঠাৎ ঐ নৌকা একপেশে হইয়া একেবারে উবুড় হইয়া যায় ও নৌকার স্ত্রী-পুরুষ বালকবালিকা জিনিসপত্রের সহিত জলমগ্ন হয়; ঠিক সেই সময় জাহাজের 2nd officer, Postal mail bag পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার জালিবোটের একজন মাল্লা জলে ঝাঁপ দিয়া ২ জন পাঞ্জাবী ও একটি বালককে জল হইতে তুলিয়াছিল; অবশিষ্ট ৩টি স্ত্রীলোক ও একটি ক্ষুদ্র শিশুকন্যা আসবাবপত্রের সহিত জলমগ্ন হয়; তাহাদের নৌকার মাঝিরা সাঁতার দিয়া পলায়ন করে। ঐ

হতভাগ্য স্ত্রীলোকগণকে ও ক্ষুদ্র শিশুকে বাঁচাইবার জন্য কেহই চেষ্টা করে নাই। আমাদের জাহাজ তখন নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল। ইচ্ছা করিলে জাহাজ হইতে জালিবোট পাঠাইয়া দিয়া বা Life Belt- এর দ্বারা চেষ্টা করিলে হয়ত হতভাগিনীরা অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইত। কিন্তু হায়, কেহই সে চেষ্টা করে নাই। কঠিন নিয়তি সুদুর ভারত-ভূমি হইতে এই সকল হতভাগিনীকে পারস্য দেশে লইয়া আসিয়া "কারূণের" জলে তাহাদের অকালমৃত্যু ঘটাইল। ঐ স্ত্রীলোকদিগের গাত্রে প্রায় ১০০০ টাকার স্বর্ণের গহনা ছিল; আমার বিশ্বাস, ঐ অলঙ্কারের ভারে তাহারা হাত-পা নাড়িয়াও জীবনরক্ষার চেষ্টা করিতে পারে নাই। ঐ ৩ জন স্ত্রীলোকের মধ্যে একজন নববিবাহিতা বালিকা ছিল; তাহার বয়স ১৫/১৬ বৎসর। সে তাহার স্বামীর সহিত আসিয়াছিল। স্বামী রক্ষা পাইল, কিন্তু তাহার স্ত্রী অতলে জীবন বিসর্জ্জন দিল।

আমি ঐ হতভাগ্য পুরুষদিগকে ও বালকটিকে দেখিলাম। গভীর দুঃখ, শোকে আমাদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। খানিক পরেই একজন হ্যাটকোটধারী জীব আসিয়া আমাদের বাক্স-পেঁটরা খোলাইয়া কাষ্টম লইবার মত জিনিস আছে কি না, দেখিতে লাগিলেন। খানিকটা ঘাঁটাঘাটি করিয়া আমাদের জিনিসপত্র ছাড়িয়া দিলেন, এবং আমার স্বামীকে বলিলেন, "তোমাদের প্রত্যেককে ৪।।০ টাকা করিয়া শুল্ক দিতে হইবে।" এটা যে কিসের জন্য, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এ বোধ হয় আমাদের পারস্যে আগমনের শুল্ক। যাহা হউক, আমাদের ঐ টাকা দিতে হইল না। Oil Company হইতে একজন পাঞ্জাবী orderly আসিয়াছিল; সে আমাদের জিম্মাদার হইয়া সমস্ত জিনিসপত্র একখানি "মহিলাতে" (বড় নৌকায়) উঠাইল। সে না আসিলে আমাদের বাক্স ইত্যাদি কাষ্টমে রাখিয়া যাইতে হইত। সেখান হইতে আমরা ছোট নৌকা করিয়া কোম্পানির আপিসে গেলাম। আজ রবিবার, আফিস বন্ধ। কা কস্য পরিবেদনা। বড়সাহেবের সহিত দেখা করিবার জন্য একজনকে পাঠান হইল; ইতিমধ্যে আমাদের জলতৃষ্ণার ঘটা পড়িয়া গেল; সকলেই বলে জল খাইব। সাহেবের খানসামারা আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের প্রতি করুণা করিয়া গেলাস-গেলাস বরফ জল আনিয়া আনিয়া আমাদের তৃষ্ণার শান্তি করিল। পরে সাহেবের নিকট হইতে লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আমাদের আবার বালাম আরোহণপূর্ব্বক Quarantine Station-এ যাইয়া রাত্রিবাস করিতে হইবে। তাই যাওয়া গেল। বালাম হইতে সশরীরে ত ভূমিতে অবতীর্ণ হইলাম; কিন্তু মাল নামায় কে? লোক নাই, কুলি নাই। আমার সঙ্গী ইঞ্জিনিয়ারগণ নিজেদের বাক্স ইত্যাদি মাথায় করিয়া আনিলেন ও দয়া করিয়া আমাদের জিনিসপত্রও আনিলেন। আমরা Quarantine Station-এর বারান্দার সামনে গাছতলায় আড্ডা গাড়িয়া বসিলাম। এখন রাত্রে থাকিবার কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। সকলে ভাবিয়াছিল যে, আরবপ্রহরীদের বলিলেই সসম্ভ্রমে ঘরের দরজা খুলিয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিবে; কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার বিপরীত হইল। ঘরের কথা বলায় তাহারা ঘরের চাবি ত খুলিলই না, বারান্দায় উঠিতেও নিষেধ করিল। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে শুইব কোথায়? তাঁহাকে লইয়া গিয়া ঘোড়ার আস্তাবলের মত একটা স্থান দেখাইয়া দিয়া আধাহিন্দি ও আরবীতে বলিল যে, এইখানেই তোমাদের রাত্রিযাপন করিতে

হইবে। রাত্রিযাপনের স্থান দেখিয়া আমাদের আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গেল। পরে যুক্তি করিয়া স্থির করা হইল যে, Quarantine Station-এর ডাক্তার সাহেবের নিকট হইতে ঘরে থাকিবার হুকুম লইয়া আসিবার জন্য আমাদের একজন যাউক। একজনকে পাঠান হইল, হুকুমও মিলিল; কিন্তু আরব-প্রহরীরা ২টা ঘরের দরজা খুলিয়া দিয়াই পদচারণা আরম্ভ করিল। আমাদের মধ্য হইতে একজন গিয়া বলিলেন যে, সকলের জন্যই ঘর চাই; অতএব সব ঘরের চাবি খোলা আবশ্যক। প্রহরী জবাব দিল, "ডাক্তার সাহেব বলিয়াছেন যে, সাহেবদিগকে থাকিবার জন্য ঘর খুলিয়া দিবে, তোমাদের মধ্যে মাত্র দুইজন সাহেব আছে; তাহাদের জন্য দুইখানা ঘর খুলিয়া দিয়াছি।" আমাদের সঙ্গী বলিলেন যে, "আমরাও ত সাহেব।" প্রহরী তখন অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল, "তোমরা ত কালা, সাহেব কোথায়?" বলা বাহুল্য, আমাদের সঙ্গীটির গাত্রে দুর্ভাগ্যক্রমে শুভ্রবর্ণের চামড়া ছিল না; কাজেই তাঁহাকে বিরস বদনে ফিরিতে হইল। আমরা আবার ডাক্তার সাহেবের নিকট লোক পাঠাইলাম। এবার সব ঘর খুলিয়া দিবার জন্য আম-হুকুম মিলিল। ক্ষুণ্ণ মনে আরব প্রহরীরা ঘরের দরজা খুলিয়া ঘরে আলো দিতে লাগিল, কারণ তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। এক একটি ঘর খুলিতে-না-খুলিতেই দখল হইয়া গেল। আমার স্বামী ও আমি গাছতলায় বসিয়াছিলাম। একজন বৃদ্ধ সাহেব আমার স্বামীকে বলিলেন, "তুমি এই সময় একটী ঘর দখল করিয়া জিনিসপত্র লইয়া যাও; তাহা না হইলে খালি ঘর পাওয়া দায় হইবে।" 'বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং' স্মরণ করিয়া আমরা একখানি ঘর দখল করিলাম। ঘরগুলি বেশ প্রশস্ত ও পরিষ্কার, আমাদের দেশের মাকড়সার জালে পরিপূর্ণ ও ধূলা ও আবর্জ্জনাপূর্ণ ডাক-বাঙ্গলার মত নহে। ঘরে আসবাবপত্রও যথাস্থানে স্থাপিত। দুইখানি Dining Chair, একটি আরসী, একটি Washing Basin ও Stand ; ঘরের পশ্চাতেই বাথরুম। ঘরে Matting পাতা , জানালা দুইটা ও দুইটি দরজা। যদিও ঘর পাওয়া গেল, কিন্তু সে গরমে ঘরে শোয় কার সাধ্য। সকলেই বাহিরে বিছানা করিয়া শুইলেন; কেবল আমি ঘরে শুইলাম। শুইবার আগে খাইবার কথা একটু বলি। সকলেরই ভয়ানক ক্ষুধা, কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের একান্ত অভাব। অনুসন্ধানে জানা গেল যে, এখানকার হাটবাজার এমন কি দোকানপত্রও সন্ধ্যার আগেই বন্ধ হইয়া যায়, সুতরাং বাজারে যাইয়া যে কিছু কিনিয়া আনিয়া রন্ধন করিয়া খাওয়া যাইবে, তাহার উপায় নাই। আমার নিকট এক টিন Biscuit ছিল ও কিছু মৈসুর ছিল। বেচারীরা ডাহা উপবাসে রাত্রি কাটায় দেখিয়া, Biscuit- এর টিন ও খাবার দিলাম। তাঁহারা ষ্টোভে চা ও কোকোয়া তৈয়ারি করিলেন ও আমাদেরও দিলেন। কতক জাগিয়া কতক ঘুমাইয়া রাত্রি কাটান গেল। সকালে উঠিয়া আমার স্বামীর শীত-শীত বোধ হইতেছিল; সেইজন্য তিনি কুইনাইন খাইলেন। তাহার পরেই তাঁহার ভয়ানক পেটের যন্ত্রণা হইতে লাগিল; দাস্ত ও বমি হইতে লাগিল। ৩/৪ বার বমির পর তিনি উঠিতে পারিলেন না। আমার বড়ই ভয় হইল। আমি Engineer Mr. Andrews-কে ডাকিয়া আনিলাম। তিনি আমার স্বামীকে ধরিয়া বাথরুম হইতে ঘরে তুলিয়া শোয়াইয়া বাতাস দিতে লাগিলেন। আমাদের সঙ্গীগণ সকলেই আসিয়া আমাদের ঘরের সম্মুখে একত্র হইয়া চিন্তান্বিত হৃদয়ে, আমার স্বামীর খবর লইতে লাগিলেন।

সেইদিনের কথা আমি এ জীবনে ভুলিতে পারিব না। এই অপরিচিত স্থানে যদ্যপি ঐ ভদ্রলোকগণ এইরূপভাবে আমার স্বামীর জন্য চেষ্টা না করিতেন, তাহা হইলে আমাকে অকূল পাথারে পড়িতে হইত। তাঁহাদের যাঁহার কাছে যে ঔষধ ছিল, সকলে বাক্স খুলিয়া সে সমস্ত বাহির করিয়া আনিলেন ও খাওয়াইতে লাগিলেন। Mr. Andrews ও Mr. Boother নামক দুইজন ভদ্রলোক হামেহাল থাকিয়া আমার স্বামীকে দেখাশুনা করিতে লাগিলেন। বাতাস ও মাথায় জলপটি ইত্যাদি দেওয়ার পর তিনি কতকটা সুস্থ বোধ করিলেন। বেলা ১১/১২টার সময় দুইজন পারসী ইঞ্জিনিয়ার Mr. Billimoria ও Mr. Mistry আমার জন্য ভাত তরকারি রাঁধিয়া ঘরে পাঠাইয়া দিলেন। আমি স্ত্রীলোক—কোথায় রাঁধিয়া খাওয়াইয়া তাঁহাদের উপকারের কতক প্রতিদান করিব, তাহা না হইয়া তাঁহাদের কষ্টে প্রস্তুত অন্ন খাইতে বড়ই লজ্জাবোধ হইতে লাগিল; কিন্তু তাঁহাদের জেদ এড়াইতে না পারিয়া সামান্য খাইতে হইল। আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা তখন বেশী ছিল না। তারপর Mr. Andrews ও Mr. Boother আমার জন্য রুটি তরকারি পাঠাইয়া দিলেন। আবার তাঁহাদের জিনিস নষ্ট করিব, সেইজন্য তাঁহাদের সেই আতিথ্য প্রত্যাখান করিতে বাধ্য হইলাম। দেশে আত্মীয়-স্বজন ব্যতীত প্রতিবেশীরাও প্রতিবেশীর জন্য এরূপ যত্ন ও সহানুভূতি প্রকাশ করে না। এই ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী ভদ্রলোকগণ আমাদের সঙ্গী না থাকিলে আমাদের কষ্টের অবধি থাকিত না।

বৈকালে আমার স্বামী বন্দোবস্ত করিয়া আসিলেন যে, Oil Company-র Head Clerk নায়ার সাহেবের বাড়ীতে আমরা গিয়া থাকিব। আমাদের সঙ্গীরা পৃথক জায়গায় চলিয়া গেলেন ও আমরাও সন্ধ্যার সময় নায়ার সাহেবের বাড়ীতে গিয়া উঠিলাম ও সেখানে আটদিন থাকিয়া 'আওয়াজ' রওনা হইলাম।[২]

২

মহামেরা ত্যাগের পূর্ব্বে মহামেরার কথা কিছুই লিখি নাই; তাই মহামেরা সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা লিখিলাম।

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে, মহামেরাতে নায়ার সাহেবের বাড়ীতে থাকিবার সময়, আমার খুব জ্বর হইয়াছিল। জ্বর হঠাৎ হয়, এবং "টেম্পারেচার" ১০৫-১০৬ ডিগ্রী হইয়াছিল। সুচিকিৎসায় এবং নায়ার সাহেব ও তাঁহার চাকর-বাকরের শুশ্রূষার গুণে শীঘ্রই সুস্থ হইয়া পথ্য করিলাম। কিন্তু দুই-তিনদিনের জ্বরে আমাকে মাসাধিকের রোগীর ন্যায় দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছিল। যাঁহারা গরমের সময় এ প্রদেশে নূতন আসিবেন, তাঁহারা যেন কুইনাইন ও বিরেচক ঔষধাদি যথেষ্ট সংগ্রহ করিয়া লইয়া আইসেন—নবাগত ব্যক্তিদের প্রথমে আসিলে যে দুই-একবার জ্বর হইবে, ইহা নিশ্চিত। মহামেরাতে ম্যালেরিয়া ও আমাশয়ের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। এখানে খুব কম লোক আছেন, যাঁহাদের ঐ রোগে দুই-চারিবার ভুগিতে হয় নাই;

কারণ এখানকার Creek-এর জল অতিশয় অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধময়। সকলেই এই Creek-এর জল পান করেন এবং স্নান, শৌচ ও বস্ত্রাদি ধৌত হইতে আরম্ভ করিয়া জল অপরিষ্কার করিবার যত উপায় আছে—স্থানীয় অধিবাসিগণ সে সকল উপায়ের দ্বারাই Creek- এর জলকে পূতিগন্ধময় করিতে ত্রুটি করেন না। মহামেরাতে থাকিবার সময়, একদিন বেড়াইতে গিয়া রাস্তার যে দুর্দ্দশা দেখিলাম, তাহাতে নয়ন-মন পরিতৃপ্ত হইয়া গেল; এবং তৎসহিত ইংরাজশাসিত সুপরিচ্ছন্ন বম্বের রাস্তা-ঘাটের কথা মনে হইতে লাগিল। এখানে রাস্তা ও গলিতে বাড়ীর যত আবর্জ্জনা ফেলা হয়; সেইজন্য রাস্তাগুলি যে কেবল দুর্গন্ধময় তাহা নহে, স্থানে-স্থানে আবর্জ্জনার স্তূপগুলি মাথা তুলিয়া পার্শিয়ান রাজ্যের সুশাসনের জীবন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আবর্জ্জনার কল্যাণে গলিগুলিতে যাতায়াতের পথ অত্যন্ত উঁচু-নীচু ও অপরিসর হইয়াছে । Creek- এর উপর দিয়াও অনেকগুলি রাস্তা বাজার ও নদী পর্য্যন্ত গিয়াছে। সে রাস্তাগুলি এত অপরিষ্কার যে, বর্ষার সময় বৃষ্টিতে পিছল হইলে, এক পা এদিক-ওদিক হইলে, একেবারে Creek- এর জলে পতন এবং পূতিগন্ধ পূর্ণ সলিলে অবগাহন-স্নান করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ পাওয়া যায়।

মহামেরাতে রাস্তা-ঘাটের অবস্থা শোচনীয় হইলেও এখানকার লোকসংখ্যা নিতান্ত কম নহে। আরব, পার্শিয়ান, বসরাণি, আরমেনিয়ান ইত্যাদির এখানে বাস। অল্পসংখ্যক ভারতবাসী এখানে বাস করেন। তাঁহারা অনেকেই এঙ্গলো-পার্শিয়ান অয়েল কোং Anglo Persian Oil Co. এবং স্ট্রীক স্কট্ কোম্পানির* কর্ম্মচারী। তাঁহারা প্রত্যেকেই ২/৩ বৎসরের চুক্তি করিয়া এখানে চাকরি করিতে আসেন এবং চুক্তিশেষে ছুটি লইয়া কিম্বা কার্য্যে ইস্তফা দিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান। এখানে একজন British Consul থাকেন। প্রবাসী ভারতবাসিগণ কোনরূপে উৎপীড়িত হইলে, তাহার প্রতীকার করিবার জন্যই সদাশয় ইংরেজ গভর্ণমেন্ট ইহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু প্রতীকার করিবার মত কোন ব্যবস্থার পরিচয়ই ইঁহাদের সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

Consul ছাড়া, পারস্য-সুলতানের প্রতিনিধিস্বরূপ একজন সেক অর্থাৎ শাসনকর্ত্তা ও তাঁহার মন্ত্রীও এখানে থাকেন। স্থানীয় অধিবাসীদিগের উপর ইঁহাদের অপ্রতিহত প্রতাপ। বর্ত্তমান সেকের বসতবাড়ী মহামেরার নিকটবর্ত্তী এক স্থানে "কারূণ" নদীর উপর অবস্থিত। বর্ত্তমান সেক একজন আরব; সেক হাজাল নামে সাধারণ্যে পরিচিত। তিনি ইংরাজি লেখাপড়া ভাল জানেন না; কিন্তু তাঁহার পুত্রকে ইংরাজি ভাষায় সুশিক্ষিত করিবার নিমিত্ত, বসোরা নগরীতে মিশনরি-বিদ্যালয়ে রাখিয়া ইংরাজি লেখা-পড়া শিখাইতেছেন। প্রধানমন্ত্রীর নাম হাজি রেইস, ইনিও এখানকার একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। ইনি পার্শিয়ান; ইনি মহামেরাতে নদীর তীরে একটি সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মিত করিয়াছেন। ইঁহার দু-চারিখানি ছোট ষ্টীমারও আছে। ইঁহারই "নসরথ" (Nasrath) নামক বাষ্পীয় তরণীই আমাদিগের মহামেরা হইতে বালুকা ও

* Anglo Persian Oil Co.
Strick Scott & Co.

মরুভূমিময় আওয়াজে নির্ব্বাসিত করিয়া আসিয়াছিল।

মহামেরাতে দুই-তিনটি ছোট-ছোট বাজার এবং কাওয়াখানা (কাফিখানা) আছে। বাজারে কাপড়-চোপড় ইত্যাদির দাম ভারতবর্ষের চারিগুণ বেশী; তবে বাজারে খেজুর অনেক রকমের পাওয়া যায়। বাজার সবসময় কিন্তু খোলা পাওয়া যায় না; সকালে এবং বিকালেই দোকান খোলা থাকে; দুপুরে কিম্বা সন্ধ্যার পর বাজারে কিছুই পাইবার উপায় নাই। গাছপালার মধ্যে খেজুর গাছই সব। মরুভূমির ন্যায় বিশাল মাঠ; আর মধ্যে মধ্যে খেজুর বৃক্ষের শ্রেণী। কারুণ নদীর দুইধারেই খেজুর বৃক্ষ-শ্রেণী। এখানে প্রায় বারমাসই খেজুর পাওয়া যায়। ১০৮ রকমের বিভিন্ন প্রকারের খেজুর আছে। আরব, পার্শিয়ান, এমন কি বসরাণি, ইহুদি ইত্যাদি জাতিগণ খেজুর ও বড়-বড় হাতে তৈয়ারি রুটি খাইয়া জীবনযাপন করে। আমাদের দেশে ধান না হইলে যেমন দুর্ভিক্ষের হাহাকার পড়িয়া যায়, খেজুর না হইলে এখানকার অধিবাসীদিগেরও সেইরূপ অবস্থা। মাংস এখানে মহার্ঘ্য বলিয়া নিম্নশ্রেণীর লোক উহা রোজ খাইতে পায় না।

মহামেরাতে পার্শিয়ান অপেক্ষা আরবের সংখ্যাই বেশী। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কি ধনী, কি গরীব, সকলের নিকটেই বন্দুক থাকে। রাস্তায় যখন তাহারা চলাফেরা করিয়া বেড়ায়, তখন বন্দুক তাহাদের সঙ্গেই থাকে। চুরি-ডাকাতির সংখ্যা খুব বেশী না হইলেও, খুব কম নহে। চোরের যে এখানে কি ভয়ানক শাস্তি হয়, তাহা পরে লিখিব।

২৪শে আগষ্ট সকালে আমরা বালামে করিয়া "নসরথ" নামক জাহাজে আসিয়া উঠিলাম। জাহাজের কামরার শ্রী দেখিয়াই আমার হরিভক্তি উড়িয়া গেল; অথচ এই জাহাজেই বাধ্য হইয়া আমাদের দুই দিন অতিবাহন করিতে হইবে। বড়-বড় সমুদ্রগামী জাহাজে বাথরুম বা পায়খানার কামরাগুলি যত বড় হয়, ইহার Second Class-এর কামরাগুলি দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সেইরকম। কামরার ভিতর একখানা অল্প-পরিসর কাষ্ঠাসনমাত্র আছে; গদি বা অপর কোন আস্‌বাবের নামমাত্র নাই। জাহাজখানির চারিপাশই এমন অপরিচ্ছন্ন যে, বাহিরে বসিলেই বমনোদ্রেক হয়। ভাড়া কিন্তু যথেষ্ট। ঐ সেকেণ্ড ক্লাসে মহামেরা হইতে আওয়াজ যাইবার ভাড়া ২০্; তৃতীয় শ্রেণীর ডেকের ভাড়া ৭।।০ টাকা। জাহাজখানি দুই-তলা; নীচের তলায় ছয় খানি ২য় শ্রেণীর কামরা বা কোটর ও একখানি ১ম শ্রেণীর সেলুন। ১ম শ্রেণীর কামরাখানি অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন ও দুইচারিটি খড়খড়িবিশিষ্ট এবং কাষ্ঠাসনের উপর ভেলভেটের গদিও পাতা আছে। মিঃ নায়ার সাহেব ও স্থানীয় অন্যান্য পরিচিত ভদ্রলোকগণ আমাদিগকে জাহাজে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা আমাদিগকে জাহাজে রাখিয়া চলিয়া গেলেন।

সকালেই জাহাজ ছাড়িবার কথা; কিন্তু ১২টার পূর্ব্বে আমাদের জাহাজ গতিশীল হইল না। জাহাজে খাদ্যদ্রব্যের একান্তই অভাব; সেইজন্য ফল ইত্যাদি সঙ্গে লইয়াছিলাম। আমরা যখন সব-প্রথমে জাহাজে উঠি, তখনই আমাদের কামরা লইয়া জাহাজের পার্শিয়ান কর্ম্মচারীর সহিত গোলযোগ হয়। দুইখানি ২য় শ্রেণীর কামরা আমরা ভাড়া করিয়াছিলাম, তাহার পরিবর্ত্তে একখানিমাত্র কামরা আমাদের দিয়াছে। "জাহাজে কামরার অভাব"—এই

অজুহাতে আমাদের একখানি ২য় শ্রেণীর কোটরেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল। আমার স্বামী কামরার বাইরে ডেক-চেয়ারে রহিলেন। আমি দিনের বেলায় কোনরূপে সেই ক্ষুদ্র কামরাতেই সময় অতিবাহিত করিতাম; তবে রাত্রে একে দারুণ গ্রীষ্ম, তার উপর আবার মশকের কনসার্ট— কাজেই কামরায় থাকিতে পারিতাম না, ডেকের উপর ডেক চেয়ারেই রাত্রি অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইতাম। জাহাজে নদী হইতে জল তুলিবার জন্য দুইটি কল ছিল, কিন্তু স্নান করিবার কোন বন্দোবস্ত ছিল না; তাহার কারণ ঐ দেশের অধিবাসীগণ "হামাম" ছাড়া অন্য স্থানে স্নান করে না। জাহাজের পায়খানাও অতি জঘন্য, স্ত্রী-পুরুষ একই পায়খানায় গিয়া থাকে। জাহাজে দুইদিন বাস করিতে হয়; কিন্তু খাদ্যদ্রব্য পাইবার কোনই উপায় নাই। ঐ জাহাজের আর একটি আশ্চর্য্য নিয়ম দেখিলাম; জাহাজ সন্ধ্যা হইলেই একস্থানে নঙ্গর করিয়া, তার পরদিন প্রভাতে আবার গতিশীল হয়। রাত্রে ষ্টীমার চলে না; তাহার কারণ এই শুনিলাম, আলস্যপ্রিয় আরবগণই জাহাজের সারেঙ্গ, খালাসি। সমস্তদিন কার্য্যের পর রাত্রে একবার বিশ্রাম-সুখ ভোগ না করিয়া তাহারা থাকিতে পারে না।

এই ত গেল জাহাজের শ্রী। কিন্তু Persian Ticket Collector ঘন-ঘন Ticket check করিতে ত্রুটি করেন এবং সুবিধা পাইলেই অশিক্ষিত পার্শিয়ান ও আরবগণকে ঠকাইয়া মালের ভাড়া ইত্যাদি আদায় করিয়া নিজের উদর-পূর্ত্তি করিতে বিমুখ হন না।

এইবার জাহাজের যাত্রীদের কথা কিছু বলিব। অধিকাংশ যাত্রীই পুরুষ—স্ত্রীলোক খুবই কম। সব সমেত প্রায় দুইশত যাত্রী আমাদের জাহাজে ছিল। তবে "নসরথ" দুই পার্শ্বে দুইখানি মালপূর্ণ 'বার্জ্জ' লইয়া শরীরের ভারে শ্লথগতিতেই অগ্রসর হইতেছিল। জাহাজের উপরে বিস্তর মাল ছিল। আওয়াজ (যেখানে আমরা যাইতেছিলাম) পার্শিয়ান-প্রধান নগরী বলিয়া আমাদের জাহাজের অধিকাংশ যাত্রীই পার্শিয়ান। বড়-বড় গড়গড়া ও তাওয়া ইত্যাদি গুড়ুকের সরঞ্জাম ও দুইচারিটা মুরগী, এই আসবাব লইয়াই পার্শিয়ান যাত্রীগণ সফরে আসিতেছিলেন। তাহার উপর তাঁহাদের আর-এক উৎপাত ছিল। সন্ধ্যার পরই পার্শিয়ানগণ আফিমের ধূমপান করিত। সে গন্ধ চারিদিকে এত পরিব্যাপ্ত হইত যে, জাহাজে তিষ্ঠান ভার হইয়া উঠিত। ১ম শ্রেণীর সেলুনে একজন Custom Director Beegio সাহেব ছিলেন। তিনি আফিমের গন্ধে ত্যক্ত হইয়া দুই-একটা ধমক দেওয়াতে একটু কমিয়াছিল।

২৬শে আগষ্ট বেলা আন্দাজ ১২টার সময় আওয়াজে পৌঁছিলাম। মিঃ ভাণ্ডারে নামক জনৈক মহারাষ্ট্রী ভদ্রলোক আমাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। জাহাজ ঘাটে লাগিবামাত্রই তিনি আমাদের নিকট আসিলেন। জাহাজ যখন ঘাটে লাগিল, তখন কামরার দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া আমি কাপড়-চোপড় পরিতেছিলাম। একে ত বাহিরে আগুনের মত গরম; ক্যাবিনের দরজা-জানালা বন্ধ করায় আমার যেন সন্দিগর্ম্মির মত হইল। মাথা ঘুরিতে লাগিল, বমি হইতে লাগিল, দাঁড়াইবার সাধ্য রহিল না ; আমি শুইয়া পড়িলাম।

আওয়াজে যেখানে আমাদের জাহাজ লাগিল, উহাও "কারুণ" নদী; তবে মহামেরা অপেক্ষা এখানে নদী কম চওড়া। জাহাজ হইতে নামিবার জন্য অপ্রশস্ত একখানি কাঠ পাতিয়া

দেয়; অতি সন্তর্পণে পার হইতে না পারিলে জলে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। আওয়াজে গাড়ী-পাল্কী নাই; মহামেরার মত Creekও নাই যে বালামে করিয়া যাইব। সুতরাং দুপুর রৌদ্রে হাঁটিয়া আমরা মিঃ ভাণ্ডারেদের বাসায় গেলাম। আগষ্ট মাসের গরমও সেখানে অসহনীয়; পায়ে জুতা না থাকিলে পা পুড়িয়া যাইত, তার আর কোন সন্দেহ নাই। আওয়াজ মানে ধূলা ও বালি; আওয়াজ বালির রাজ্য বলিলেই চলে। গাছপালার সঙ্গে সম্বন্ধ নাই। সমস্ত সহরে মোট তিন চারিটীর বেশী বৃক্ষ নাই; তাহাও খেজুর বৃক্ষমাত্র। চারিদিকেই বালিপূর্ণ মরুভূমি ধুধু করিতেছে। চারিদিক অন্ধকার বলিয়া বোধ হয়। Amulet glassই দিন বা Eye preserverই দিন, চোখে বালি ঢুকিবেই। দুপুরে একবার বাহির হইতে বাড়ী আসিলেই মাথা ও গা বালিময় হইয়া যায়। আওয়াজে আমার ২/৪ জন পার্শিয়ান ভদ্রপরিবারের সহিত আলাপ হইয়াছিল। সেখানকার মহরম ব্যাপার অতিশয় কৌতূহলপ্রদ। তাহা ছাড়া, পার্শিয়ানদের ও আরবদের ব্যবহার ও রীতিনীতি বিবরণ শুনিয়া আমাদের দেশের লোক বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। এই সংখ্যায়ই তাঁহাদের কৌতূহল পরিতৃপ্তি করিতে আমার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু আজ চারি বৎসর পরে আমি পিত্রালয় আক্রিগঞ্জে আসিয়াছি। 'ভারতবর্ষের' পাঠিকাগণের মধ্যে যাঁহারা সুদীর্ঘকালের পর অল্প সময়ের জন্যে পিত্রালয়ে আসিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, সেই অত্যল্প সময় কত শীঘ্র গত হয়, এবং সেই সময়ে লেখনী ধরিতে ইচ্ছা হয় কিনা। পারস্য ও আরবদেশে ঘটনাপূর্ণ জীবন যাপন করিয়া, আক্রিগঞ্জের ন্যায় শান্তিপূর্ণ পল্লীগ্রামে এ কয়টা দিন বড় সুখেই কাটাইয়া গেলাম। জানি না স্বদেশে আবার কবে ফিরিব। সে যাহা হউক, আগামী বারে পারস্য বিবরণ আরও বলিবার অভিপ্রায় রহিল।

ভারতবর্ষ, আষাঢ় ও কার্তিক ১৩২৩

৬

বর্ম্মা-যাত্রা

সরলা দেবী চৌধুরাণী

লাহোরের একজন মুসলমান গণৎকার একটি বাঙ্গালী মেয়ের হাত দেখে বলেছিলেন — "এর সমুদ্রযাত্রা অবশ্যম্ভাবী।" সকলে হেসে অস্থির! যা শতকরায় দেড়শখানা অসম্ভব, এমন একটা বাজে গণনা করলে কে না হাসবে? কিন্তু দেখতে দেখতে গণনা ফলে উঠল। হয়ত বা গণৎকারের কথাতেই শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে মেয়েটি বি-এ পাশ করবামাত্র তার পিতা গবর্ণমেন্টের বৃত্তির জন্যে তাকে আবেদন করতে বললেন। এই যে তীরটি ছোঁড়া হল তাতে লক্ষ্যবিদ্ধির কোনই আশা ছিল না কিন্তু। কারণ, গুটিকত খাস পাঞ্জাবী এম-এ ও ডবল এম-এ মেয়েরাও আবেদন করছেন এ কথা জানা ছিল। তাঁদের দাবীর কাছে এ মেয়েটির দাবী টিকতেই পারে না। তত্রাচ ভবিতব্য অঘটন ঘটালে, —পঞ্জাবী এম-এ মেয়েদের দাবী খণ্ডন করিয়ে, পঞ্জাব প্রবাসিনী বাঙ্গালী বি-এ মেয়েটির দাবী মঞ্জুর করালে। দৈবচালিত পঞ্জাব-সরকার একেই বৃত্তিধারিণী করে বিলেত পাঠালেন।

সেই পর্য্যন্ত সেই মুসলমান গণৎকারের গণনায় সকলের অগাধ বিশ্বাস। তাঁর খোঁজে সবাই ব্যস্ত। একদিন পূর্ব্বোক্ত বালিকার পিতৃগৃহে তিনি আবার অকস্মাৎ উপস্থিত হলেন। বাড়ীশুদ্ধ সকলে তাঁকে হাত দেখাতে ছুটল। আবালবৃদ্ধবনিতা অন্যান্য প্রশ্নের সঙ্গে একটি প্রশ্ন জুড়ে দিলে—"আমার হাতে সমুদ্র-যাত্রা আছে?"

সেদিন আমি তাঁদের বাড়ীতে অতিথি। আমারও হাত দেখা হল। গণৎকার সাহেব হাতের ভিতর তন্নতন্ন করে সমুদ্রযাত্রা খুঁজে কোথাও তার দিশে পেলেন না। আমি তবু আশা ছাড়লুম না। "হয়ত কোথাও লুকিয়ে আছে, আর একটু নিরীক্ষণ করে দেখুন, খুঁজে পাবেন" —এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সাহেব নরম হয়ে বল্লেন, "There are some chances of sea - voyage in 1928."

আশ্বস্ত হলুম। একেবারে আশাতীত নয়। তখন ১৯২৭-এর এপ্রিল মাস মাত্র, ১৯২৮-এর ডিসেম্বর পর্য্যন্ত দৈব-সম্ভাবনা পেকে উঠবার সুদীর্ঘ অবসর রয়েছে।

দৈব আর পুরুষকারের মাঝে ভেদের গণ্ডিটা কোথায় টানা যেতে পারে? আমার পক্ষে সমুদ্রযাত্রা করা-না করা নিতান্তই আমার স্বেচ্ছাধীন। অথচ দৈবের দিক দিয়ে কথাটা শুনে নিতে চাই। অনেক ইচ্ছা নিজের ভিতর থেকে প্রেরণা পায় না হয়ত, বাইরের প্রেরণার উপর বলবতী ও ফলবতী হবার অপেক্ষা রাখে। দেশ-ভ্রমণেচ্ছা, সুদূর প্রয়াণের ইচ্ছা অনেকেরই মনে মনে থাকে, কিন্তু কাজে হয়ে উঠে না। অর্থবল হলেও উদ্যমের বল যোটে না। সেইখানে

দৈবের সাহায্য চাই। আমি তার প্রতীক্ষায় বসে রইলুম। কিন্তু ১৯২৮-এর শেষ মাসের শেষ দিনেরও অবসান হল—আমার সমুদ্রযাত্রা দেখা দিল না। সম্ভাবনামাত্র ছিল, নিশ্চিত ত ছিল না ; সুতরাং গণৎকারের গণনা মিথ্যা হল এ কথা বলতে পারলুম না। বরঞ্চ সেই পর্য্যন্ত একটা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেল—এ জীবনে আর সমুদ্রযাত্রা নেই, কেননা, দৈবজ্ঞের গণনানুসারে তার সম্ভাবনার শেষ দিন পর্য্যন্ত অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।

যখন এই বছরের এপ্রিলের শেষে বর্ম্মা প্রাদেশিক হিন্দু কন্‌ফারেন্স থেকে নিমন্ত্রণ ও তাগিদের পর তাগিদ এল এবং তাঁদের নিমন্ত্রণ স্বীকার করে বর্ম্মা যাওয়া স্থির করলুম, তখনও সে বিশ্বাসে কোন ঘা পড়ল না। এ আর সমুদ্রযাত্রা কি? এ ত ভারতের ওপারে যাওয়া মাত্র, বৃহত্তর ভারতেরই আর এক কোণে।

সভানেত্রীর অভিভাষণ রচনার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলুম। চারশ পৃষ্ঠা বর্ম্মার ইতিহাসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হলুম। যাত্রাটা মনের পিছনে পড়ে গেল, যাত্রার লক্ষ্যটাই সামনে এসে দাঁড়াল। সময়োপযোগী জাহাজে ক্যাবিন রিজার্ভ করিয়ে নিশ্চিন্ত থাকলুম মাত্র।

১৮ই মে আচম্বিতে নিম্নলিখিত নোটিশটি হস্তগত হতে আমার বিশ্বাসটা একটু নাড়া খেলে, এতদিন পরে একটা পাকা রকমের ধারণা মনে ঢুকল—এবার জলপথের যাত্রা বটে, স্থলপথের নয়। তবু দৈবজ্ঞের গণনাকে অবহেলা করে একে সমুদ্রযাত্রা বলতে এখনও মন সরল না—সমুদ্র-জলের ছিঁটেফোটা মাত্র লাগবে বৈ ত নয়!

নোটিশটি এবম্বিধ :

"Friends are not allowed on board". এই ভীতিজনক লাইনটিতে আমি দুর্ম্মনা হবার পূর্ব্বেই আমার উপযুক্ত পুত্রটি পকেট থেকে দু'খানি পাস বের করে দেখালেন তিনি আগেই ষ্টীমার কোম্পানীর কাছ থেকে এই দুটি যোগাড় করে রেখেছেন, জাহাজের উপর পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে যেতে পারবেন, আমার কোন অসুবিধে হবে না।

১৯শে মে বেলা ৭।।০টার সময় আউটরাম ঘাটে উপস্থিত হলুম। সেখানে হিন্দুমিশনের স্বামী সত্যানন্দ সশিষ্যবর্গে অপেক্ষা করছেন। আমার পুত্র শ্রীমান দীপক ঘাটের ক্লার্ক, চৌকিদার, ডাক্তার ও কুলির হাত থেকে আমায় একে একে সসম্ভ্রমে উত্তীর্ণ করিয়ে জাহাজের ফার্ষ্ট ক্লাসে চড়িয়ে দিলে। তার সংগৃহীত দ্বিতীয় পাসখানা স্বামিজীর এক শিষ্যের কাজে লাগল। ডাঙ্গার সঙ্গে জাহাজের সিঁড়ির যোগ ছিন্ন হবার আগেই মায়ের সব গোছগাছ করে দিয়ে, মাকে প্রণাম করে এবং মায়ের শিরোঘ্রাণ নিয়ে পুত্রপ্রবর ফিরে গেল। সে অদৃশ্য হওয়ামাত্র মনে পড়ল তাকে ত বলে দেওয়া হয়নি রেঙ্গুনে তারযোগে খবর পাঠাতে হবে যে, আমি আজ রওয়ানা হয়েছি। স্বামী সত্যানন্দ আশ্বাস দিলেন জাহাজ থেকে বেতারে খবর পাঠান চলবে, তাতে খরচ মাত্র পাঁচগুণ বেশী।

ইতিমধ্যে একটি গুজরাটী যাত্রী আত্মপরিচয় দিয়ে আমার সঙ্গে আলাপ রুজু করে-ছিলেন। খানিক পরে দেখা গেল তিনি ও একজন মুসলমান বণিক জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ঘাটের প্লাটফর্ম্মে দণ্ডায়মান নিজেদের লোকজনদের সঙ্গে কথা কইছেন। একটা

টাকায় জড়িয়ে একখানা কাগজের টুকরো নীচে ফেলে দিয়ে তাদের বলছেন শোনা গেল—"এখনি তার - ঘরে গিয়ে এই তারটা দিও।" আমার তার দেবারও এই সুযোগ দেখে ক্ষিপ্রগতিতে তাঁদের পাশে গিয়ে স্বামী সত্যানন্দ তাঁদের লোকের মারফৎ আমার হয়েও একটী তার পাঠাবার সুব্যবস্থা করলেন।

অল্পক্ষণ পরেই জাহাজ ছাড়ল। শিকল খোলার ঝনঝনার সঙ্গে কলকাতা সশব্দে ধীরে ধীরে দৃষ্টির অন্তর্হিত হতে লাগল। অদূরে হাওড়া ব্রিজ অস্পষ্টতর হল। হাইকোর্টের চূড়া, নূতন কৌন্সিল হাউস, বেতারের খুঁটি, কেল্লা সব একে একে দিক্-চক্রের নীচে ডুবে এল। জাহাজ থেকে তীরবর্ত্তী আত্মীয়বন্ধুদের উদ্দেশ করে যাত্রীদের রুমাল ঘোরান অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকল। রুমাল ঘোরাচ্ছিলেন সেকেন্ডক্লাসের ডেক থেকে কতকগুলি থার্ডক্লাসের প্যাসেঞ্জার বঙ্গীয় যুবক আর দুটি সেকেন্ডক্লাসের ফিরিঙ্গি মেয়ে—খাঁটি সাহেবসুবোরা নয়। হয়ত বর্ম্মাযাত্রী অ্যাংলো সাহেবদের কলকাতায় আপনার বলতে কেউ ছিল না—আর এই নব্য বঙ্গসন্তানেরা বোধ হয় কোথাও শুনে থাকবেন জাহাজ থেকে রুমাল ঘোরানটা পুরোদস্তুর যাত্রী-কায়দা; তাই অবিশ্রাম বিঘূর্ণন চলতে থাকল। কলকাতার উপকূলের যখন বিন্দুবিসর্গও আর দৃষ্টিগোচর রইল না, তখনই তাঁরা ক্ষান্ত দিয়ে নেপথ্যে অন্তর্দ্ধান হলেন। এবার ডেকের উপর আবির্ভূত হলেন তাঁদের বাড়ীর মেয়েরা। মেয়েগুলি খাঁচা থেকে ছাড়া-পাওয়া পাখীর মত ঘুরঘুর করতে লাগল। একবার ফার্ষ্টক্লাসের ডেকে, একবার সেকেন্ডক্লাসের ডেকে বেড়িয়ে যাচ্ছে, কখনো রেলিং ধরে গঙ্গার উপর ঝুঁকছে, কখনো কখনো এখান ওখান থেকে ডেক-চেয়ার টেনে এনে এক জায়গায় জড় করে জটলা করে বসে গল্প করছে। বয়স কারো ষোল সতের বছরের বেশী নয়; আলতামাখা খালি পা, সিঁথেয় ধ্যাবড়া করে সিন্দূর মাখা। যদিও এ-কালের ফ্যাশনে ফেরতা দিয়ে শাড়ী পরবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তেমন পারিপাট্য ফুটাতে পারেনি—দেখলেই মনে হয় পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। পরে তাদের সঙ্গে কথা কয়ে জানলুম তারা পাড়াগাঁয়ের নয়, কলকাতারই মেয়ে বটে, কিন্তু এমন শ্রেণীর, যাদের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষা বা অপর শ্রেণীর দশজনের সঙ্গে মেলা-মেশার প্রথাটা এখনও প্রচলিত নেই। বেচারীদের তাই আজ এত নিঃসঙ্কোচ স্ফূর্ত্তি। কেউ বাধাও দিচ্ছে না। তাদের অভিভাবকেরা যে রুমাল ঘোরান শেষ করে কোথায় অন্তর্হিত হল, সন্ধে পর্য্যন্ত আর কেউ তাদের টিকি দেখতে পেলে না। অবশেষে এই মেয়েগুলির অভিভাবকত্ব গ্রহণ করলে জাহাজের আধবুড়ো সারিঙ। সে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে তাদের দৌরাত্ম্যি সহ্য করে করে, একবারটি এসে বল্লে—"মা'রা, আপনারা এখানটায় বসবেন না, এটা ফাষ্টো ক্লাস, সাহেবরা রাগ করবেন।" মেয়েগুলি তখনকার মত উঠে গেল। আবার খানিক বাদে এসে সোশ্যালিজম ভাবগ্রস্ত একটি মেয়ে বললে— "এতগুলো চেয়ার পড়ে রয়েছে, বসতে দেবে না? চল্ না ভাই, এদিকে টেনে এনে বসি।" আর একটি অপেক্ষাকৃত সুবুদ্ধি বা ভীরু মেয়ে বললে—"না ভাই, বকবে।"

এই জাহাজে চাটগাঁয়ী সারিঙ ছাড়া তাদের সীমা ও মর্য্যাদারক্ষা শিক্ষা দেবার জন্য আর কেউই ছিল না। বাড়ীর লোকেদের পাত্তাই নেই। বাস্তবিকই ফার্ষ্টক্লাসে অনেকগুলি

খালি ডেক-চেয়ার পড়ে ছিল—তার কারণ এই যে আজ ফার্স্টক্লাসের অতি অল্পসংখ্যক যাত্রী, আমাকে নিয়ে মোটে আটটি মাত্র। একে ত এই জাহাজখানা মেলজাহাজ নয়, তার উপর বঙ্গোপসাগরে ঝড় বাদল আরম্ভ হয়েছে, বর্ষা নেমেছে, পারৎপক্ষে কেউ এই সময় যেতে চায় না। .

সহযাত্রী একক ইংরেজরা জাহাজের ওধারে বসে গল্পের বই পড়তে আরম্ভ করে দিয়েছিল। একটিমাত্র দম্পতি পরস্পর কথোপকথনে নিযুক্ত ছিল। পতিটিকে কিছুতেই য়ুরোপীয় মনে হল না, গৌরাঙ্গ বটে,—পুরো সাহেবী পোষাক, হাবভাব, উঠা-বসাও বটে। কিন্তু তবু মুখে এমন একটা কি দুর্ব্বলতা মাখান ছিল, যাতে স্বাধীনচেতা লোক বলে মনে হয় না। পরে জানতে পারলুম যে ইহুদি—রেঙ্গুনে তার অতি নিকট আত্মীয়দের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে তার মেমবধূ পরিগ্রহের ইতিবৃত্তও জানতে পেরেছিলুম। জাহাজে দম্পতির আচরণ একেবারে আদর্শ সদ্য বিবাহিত নূতন প্রেমিক-প্রেমিকার মত। সর্ব্বদাই দুজনে নিরালায় বসে আছে। দুপুর বেলা 'লাউঞ্জে' (আরাম গৃহে) মেমবধূ একখানি কৌচে নিদ্রিতা, মাথার কাছে চৌকি টেনে বসে বর খবরের কাগজ পড়তে পড়তে তাঁর রক্ষকতা করছেন। তাঁদের আশেপাশে অন্য কৌচে বা চেয়ারে অন্য যাত্রীরা স্ব স্ব পাঠে ব্যাপৃত। বউ যদি ডেকে না উঠেন, বরেরও দেখা পাওয়া যায় না। সমুদ্রে ঢেউ খেলা আরম্ভ হতে প্রথম প্রদোষ থেকেই তাঁরা উভয়ে যে অন্তর্দ্ধান করলেন, রেঙ্গুনে পৌঁছিবার আগে আর কারো তাঁদের দর্শনলাভ হয়নি।

জাহাজের মুখ ঘুরে গিয়েছিল—কল্‌কাতা কোন্ দিকটায়, শিবপুর কোন্ দিকটায়, দিক্‌ভ্রম হচ্ছিল। একজন খালাসীকে জিজ্ঞেস করলুম—"বোটানিকেল গার্ডেন ছেড়ে গেছি কি?"

সে বল্লে,—"এই যে এখনি তার ধার দিয়ে যাচ্ছি, ও-পাশটায় দেখতে পাবেন।"

ওপাশে গিয়ে তার ঘাটের সিঁড়ি দেখতে পেলুম, দু একটা বাড়ীও দৃষ্টিগোচর হল, কিন্তু তার তাল-বীথিকা, মহাবট প্রভৃতির দৃশ্য স্মৃতির দূরবীণে কল্পনার চোখেই শুধু দেখা দিলে।

আমাকে ছেড়ে বাকী সাতজন যাত্রীর মধ্যে দুটি ফিরিঙ্গ রমণী—মা ও মেয়ে, এবং একটি পূর্ব্বোল্লিখিত গুজরাটী হিন্দু। ৯টার সময় প্রাতরাশের ঘন্টা পড়ল। গুজরাটীটি জাহাজের খানা খান না। আমার জন্য নিরামিষ আহারের হুকুম দেওয়া হয়েছিল। ভোজনগৃহে চারখানা টেবিল সাজান ছিল—তিনখানা যাত্রীদের জন্যে—একখানা জাহাজের অফিসারদের জন্যে। আমি মধ্য টেবিলে না গিয়ে পাশের একখানা টেবিলে বসলুম। ফিরিঙ্গি মহিলাদুটি আমার অনুমতি নিয়ে আমার টেবিলে এসে বসলেন।

মধ্যাহ্ন ভোজনের কিছু পূর্ব্বে জাহাজের গোয়ানীজ বাটলার এসে আমায় বল্লে,—যাত্রী কম, দু'খানা টেবিল উঠিয়ে দেওয়া হবে, একখানাতেই সব যাত্রীদের জায়গা পাতা হবে,—আমার তাতে আপত্তি আছে কি? আমি বল্লুম,—"আমি যখন নিরামিষাশী, অন্যদের খাওয়ার সঙ্গে আমার সংস্রব নেই, আমার টেবিলটা আলাদা থাকলেই ভাল।"

বেলা একটার সময় মধ্যাহ্ন - ভোজনের ঘন্টা পড়ল। ভোজন-গৃহে গিয়ে দেখি আমার জন্যে একটা অপেক্ষাকৃত ছোট টেবিল লাগান হয়েছে; আর ফিরিঙ্গি মেয়েদের জায়গা হয়েছে সর্ব্ব-সাধারণ টেবিলে। সে মহিলাদুটি — একজন বৃদ্ধা, একজন তরুণী — ছলছল চোখে আমায় বল্লেন — "আমাদের আপনার সঙ্গে বসতে দেবেন না? We hate to sit at the other table."

আমি বল্লুম — "স্বচ্ছন্দে আসুন।"

কিন্তু খানসামারা নারাজ, দু টেবিলে আমিষ পরিবেশন করতে হলে তাদের কাজ বেড়ে যায়।

ফিরিঙ্গি মহিলাদ্বয় উচ্চপদস্থ সাহেবদের সঙ্গে মিশতে অভ্যস্ত নয় বোধ হল। তাই তাঁরা স্বাস্থ্যভঙ্গের দরুণ সাধ্যাতীত ব্যয় করে ফার্ষ্ট ক্লাশের টিকিট নিলেও, এখানে তাঁদের অনধিকার প্রবেশ, এই রকম একটা ভীত কুণ্ঠিতভাবে সর্ব্বদাই আচ্ছন্ন, — চাকরদের হুকুম করবার সাহসও তাঁদের নেই। রেঙ্গুনে বাড়ী বাড়ী পিয়ানো শিখিয়ে তাঁরা জীবিকা অর্জ্জন করেন। মেয়েটির আঁখি-কোণে বর্ম্মীরক্তের মিশ্রণ পরিস্ফুট। তাঁদের কিন্তু এক বেলার বেশী আর সাধারণ টেবিলে বসার যন্ত্রণা সহ্য করতে হল না। মধ্যাহ্নভোজনের পর যে বিশ্রাম করতে ক্যাবিনে নামলেন, তিনদিন ধরে যাত্রা শেষ পর্য্যন্ত আর উঠলেন না।

অপরাহ্নে জাহাজের কাপ্তেন আমার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন। তাঁর রীতিই দেখলুম সব যাত্রীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় রাখা। নিজের ঘরকন্নার অনেক কথা শুনালেন। তাঁর স্ত্রী দাসী-চাকরদের মোটে শাসনে রাখতে পারেন না। শাসনকার্য্যে কাপ্তেন সাহেবের সাহায্যের অনবরত প্রয়োজন পড়ে। মেয়েদের বেশী লেখাপড়া-প্রীতি কোন কাজের নয়, তাতে তারা ঘরকন্নায় অপটু হয়ে পড়ে। তাঁর স্ত্রী তার একটি নিদর্শন। কাপ্তেন সাহেব জাহাজে চলে এসেছেন; যদি এই ক'দিনের মধ্যে রাঁধুনি ছেড়ে যায়, তবে বাড়ীতে হাঁড়ি চড়বে না, ছেলেপিলেরা অভুক্ত থাকবে ; কেননা, তাঁর স্ত্রী রন্ধনে অপটু, এবং একটা চাকরের জায়গায় আর একটা চাকর যোগাড় করে বহাল করতেও অক্ষম। স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে তাঁর সাধারণ অভিমতটা মনুপ্রমুখ পুরুষপুঙ্গব মাত্রেরই মত, — সব অবস্থাতেই তাদের পরবশে রাখা সমীচীন মনে করেন।

সমুদ্রবিষয়ক নানা গল্পগুজবও করলেন। নাবিকদের সম্বন্ধে সু-প্রসিদ্ধ নানারকম কুসংস্কারে তিনিও ভরা দেখলুম। গল্প করলেন, তিনি অনেকবার সমুদ্রে মৎস্যকন্যা (mermaid) দেখেছেন । আমি অবিশ্বাস প্রকাশ করলে বললেন, তারা অলৌকিক বস্তু নয়, প্রকৃতপক্ষে একপ্রকারের জলজীব—কোমরের উপর পর্য্যন্ত নারীর আকৃতি, কোমরের নীচে থেকে মৎস্যতুল্য, অনেক সময় তারা ডাঙ্গার উপর রোদ পোহাতে উঠে। 'লাউঞ্জ' গৃহে বৈকালিক চা পান করতে করতে তাঁর সঙ্গে গল্পে গল্পে কেটে গেল। তখন এত প্রচণ্ড গরম যে বাইরে ডেকের উপর বসবার যো নেই।

এর পর আলাপ হল জাহাজের ডাক্তারের সঙ্গে। আমি জাহাজে চড়ে অবধি এঁর খোঁজ করেছিলুম—শুনেছিলুম না কি বাঙ্গালী। কিন্তু কোথায় যে তিনি , কেউ বলতে পারেনি তখন।

লোরেটো কন্‌ভেন্টে শ্বেতাঙ্গিনী য়ুরোপীয় নান্‌দের মধ্যে একটি শ্যামাঙ্গিনী বাঙ্গালী 'নান্‌' ছিলেন। সব সাদার মধ্যে হঠাৎ এই একটু শ্যাম কেমন কেমন লাগ্‌ত। জাহাজের অফিসরী বেশভূষা ও নাবিকী টুপি পরিহিত সাদা মুখেদের মধ্যে একটি শ্যামমুখ অফিসর যে মধ্যে মধ্যে চোখে পড়তেন তাতেও কেমন কেমন ঠেকত—মনে হত, বুঝি তাঁদের একটি পোষ্য-পুত্র। দেখতে খুব ছেলেমানুষ, ভালমানুষ, আর প্রায় সর্ব্বক্ষণ কাসিতে পিঠটা একটু নোয়ান। জানতে পারলুম ইনিই জাহাজের ডাক্তার, একজন উচ্চপদের অফিসার। ক্রমে এঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে শুনলুম, তাঁর পদ নিয়মানুযায়ী উচ্চ হলেও, বাঙ্গালী বলে, তাঁকে পদানুযায়ী সম্মান ও অধিকার সব স্থলে দেওয়া হয় না। ভোজনগৃহে অফিসারদের যে আলাদা টেবিলের কথা বলেছি, সান্ধ্য ভোজনের সময় তাঁর সেখানে গিয়ে খাবার অধিকার নেই—ছোট অফিসারের মত তাঁর ডিনারটা ক্যাবিনেই খেতে হয়। সেইজন্যে আত্মসম্মানরক্ষার্থ অন্যান্য সময়ও টেবিলে গিয়ে খান না, ক্যাবিনেই খান। এই রকম আরও কতকগুলি বিষয়ে তাঁর সম্বন্ধে ইতরবিশেষ করা হয়। শরীর অসুস্থ হওয়ায় সমুদ্রের হাওয়া তাঁর পক্ষে উপকারী বলে তিনি ক্যাম্বেল থেকে বেরিয়েই এই চাকরী নিয়েছেন। এই পথে অনেকবার ফেরাফেরি করছেন। কিছু টাকা জমিয়েছেন। আর এক মাস পরে চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে বিলেত যাবেন। অতি অমায়িক অতি শান্তশিষ্ট লোকটি। তাঁর এই কাসি নিয়ে বিলেত যাওয়াটা কতদূর সঙ্গত হবে বুঝলুম না। কিন্তু তাঁর প্রাণের আকিঞ্চন বিলাতের ডিগ্রি পাওয়া। তাঁর মা নেই, আর তিনি অবিবাহিত, সুতরাং তাঁর জন্যে ভয় পাবার কেউ নেই, তাঁকে নিরস্ত করবারও কেউ নেই।

একটি গুজরাটী যাত্রীর কথা পূর্ব্বেই বলেছি। রেঙ্গুনে তাঁর অডিটরের ফার্ম্ম আছে। সিমলার অডিটর্স কনফারেন্সে বর্ম্মা হইতে মনোনীত সরকারী প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছিলেন। আমায় বহুদিন পূর্ব্বে বম্বের শান্তা ক্রুজ শহরে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে কোন মিটিংয়ে দেখেছিলেন বল্লেন। তিনি বিটলভাই বল্লভভাই পাটেলদের স্বজাতি। বর্ম্মাপ্রবাসী ভারতীয়দের সম্বন্ধে তাঁর কাছে অনেক খবর পেলুম। বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে বল্লেন, ব্যবসাদার বাঙ্গালী সেখানে অতি অল্প, —অধিকাংশই সরকারী চাকুরে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে ঐক্যের বা প্রেমের বন্ধন নেই। পাছে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়, তাই কেউ কারো জন্যে কিছু করতে ভয় পান। অল্পদিন হল রিট্রেঞ্চমেন্ট কমিটির শস্ত্রাঘাতে অনেক বাঙ্গালী ক্লার্ক কর্ম্মচ্যুত হলেন—অথচ তাঁদের স্থলে বহু ফিরিঙ্গিকে ভর্ত্তি করা হল। বর্ম্মার সমস্ত বাঙ্গালীরা মিলে এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদই করলেন না। কোন মিটিং ডাকলেন না ; ভয়, পাছে যাঁরা চাকরীতে বহাল আছেন তাঁদেরও চাকরী যায়। তিনি আপশোষ করে বল্লেন—এমন কর্ম্মদক্ষ অথচ এমন ভীরু সম্প্রদায় আর একটিও নেই বর্ম্মাতে।

তাঁর মুসলমান বণিক বন্ধুটি বর্ম্মার প্রাদেশিক হিন্দু কনফারেন্সের মনোনীত সভানেত্রীর প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। কিন্তু কথাপ্রসঙ্গে বন্ধুর কাছে যেমনি শুনলেন আমার অগ্রজ তাঁদের শহরের ভূতকালীন কমিশনর ঘোষাল সাহেব, অমনি আমার কাছে এসে সেলাম করে

তাঁর উল্লেখ করে অনেক আপ্যায়নজনক কথা বললেন।

এইভাবে গল্পে সল্পে আলাপ পরিচয়ে বেলাটা কেটে গেল। চারটের সময় সুন্দরবনের সামনে জাহাজ নোঙ্গর করলে,—জল অল্প, জোয়ার না এলে জাহাজ এগোতে পারবে না। সন্ধে ৭টায় জোয়ার আসতে জাহাজ ছাড়ল, ঝড়ও উঠ্‌ল, জাহাজও দুলতে আরম্ভ হল।

৭।।০ টায় সান্ধ্য ভোজের পর সেকেণ্ড ক্লাস থেকে কলকাতা য়ুনিভার্সিটিতে পড়া দুই একটি বর্ম্মা ছাত্রকে স্বামী সত্যানন্দ আমার কাছে নিয়ে এলেন। তাদেরই দেশে যাচ্ছি,—তাদের বর্ত্তমান মনোভাব প্রভৃতি সম্বন্ধে যত কিছু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ জ্ঞান নিয়ে যেতে পারি সেই ভাল। তাদের মধ্যে একটি ছেলে বি-এ পাস, ধর্ম্মের দিকে খুব ঝোঁক। ধর্ম্মালোচনা করতে করতে মিশনরিদের হাতে পড়ে। ষ্ট্যানলি জোন্স তাঁকে কাবু করে দিলেন, সে তাঁরই দ্বারা খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। কিন্তু এখন ক্রীশ্চানিটিও তাকে তৃপ্তি দিতে পারছে না—সে তার ভিতরে ঢুকে দেখছে বৌদ্ধধর্ম্মের যে শিক্ষা আজীবন তার শিরায় শিরায় গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে নিবদ্ধ হয়েছে, শিক্ষা হিসাবে খ্রীষ্টধর্ম্মে তার চেয়ে বেশী কিছু নেই। আর ফিলজফির দিক দিয়ে খ্রীষ্টানদের অনেক কথা এখন তার ধাঁধাজনক বোধ হচ্ছে। সে খ্রীষ্টান হওয়ার দরুণ বাপের ত্যজ্যপুত্র হয়েছে। খ্রীষ্টান হবার পর সে বিয়ে করেছে। তার স্ত্রী কিন্তু বৌদ্ধ, ছেলেপিলেরা বৌদ্ধ, সে একাই খ্রীষ্টান। আর একজন সদ্য-বিলাত-প্রত্যাগত বর্ম্মী ছেলে এল। বিশ্লেষণে সে বেরোল পাঞ্জাবী আর্য্যসমাজীর পুত্র, মা তার মণিপুরী বর্ম্মী।

এদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে এক চেনা-শত্রুর আগমন-চিহ্নে উন্মনা হতে লাগলুম। ছেলেরা কেউ কেউ দাঁড়িয়ে সমুদ্রের তরঙ্গায়িত মূর্ত্তি দর্শন করতে লাগল। একজন বললে, "আপনি উঠে দাঁড়িয়ে একটু দেখবেন না! এমন অপূর্ব্ব চাঞ্চল্যের সৌন্দর্য্য চাক্ষুষ করবেন না?"

আর একজন বললে—"উনি কি আমাদের মত চঞ্চল প্রকৃতির যে এতে ওঁর রক্ত চঞ্চল হবে?"

আমি ডেক-চেয়ারে ঠেসান দিয়ে বসে আছি, উত্তরোত্তর আমার কথা কমে আসছে, কণ্ঠ থেকে কথা নিঃসৃত করতেই একটা বিপদের সূচনা লক্ষ্য করছি। বহু বর্ষ পূর্ব্বে সমুদ্রপথে একবার মাদ্রাজ গিয়েছিলুম। তখনই সমুদ্ররোগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। বম্বে থেকে রত্নগিরি জঞ্জীরা প্রভৃতি দ্বীপে প্রয়াণকালেও আমার অন্তর-পুরুষ বহির্ম্মুখী হয়েছিলেন। এখানে যে তিনি সুশীল বালক হয়ে থাকবেন সে বিষয়ে সন্দেহের উৎপত্তি হচ্ছিল। ক্রমে ক্রমে সকলেই ভিতর থেকে একটা অসোয়াস্তি অনুভব করতে লাগলেন। বর্ম্মী যুবকেরা পরস্পর হাত ধরাধরি করে খুব দ্রুতভাবে ডেকের উপর পায়চারি করতে লাগল—সেটা না কি সমুদ্র-ব্যাধির নিবারক। স্বামী সত্যানন্দ, গুজরাটী যাত্রী, সাহেবসুবো সবাই অনেকক্ষণ ধরে এই মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করে পরাজয় মেনে যে যার ক্যাবিনে পলায়নপর হল।

আমি শুনেছিলুম যতক্ষণ পর্য্যন্ত ডেকে থাকা যায় ভাল, ডেকের তাজা হাওয়ায় রোগ প্রশ্রয় পায় না, ক্যাবিনে গেলেই বিপদ। আমি সেই উপদেশ অনুসারে ঠিক করে আছি ক্যাবিনে

শীঘ্র যাওয়া হবে না, যতক্ষণ পারা যায় উপরেই থাকতে হবে। যাত্রীরা সবাই নেমে গেল— পড়তে পড়তে, টলতে টলতে, জাহাজের রেলিং, দেওয়াল, চৌকি প্রভৃতি ধরে ধরে। আমি বসে রইলুম। ক্রমে ডেকের আলো স্তিমিত হয়ে এল, খালাসীরাও অদৃশ্য হল। একটা শূন্য-পুরীর ভয়ঙ্করতায় সবটা আচ্ছন্ন হল। প্রবল ঝড়ো হাওয়া, বিষম দোলানি। আমি দেখলুম আর একা বসে থাকা চলে না, এবার নীচে নামাই শ্রেয়ঃ। আমার ক্যাবিনের চাবি আবার আমার বেহারার কাছে। সে থাকে থার্ডক্লাসের ডেকে। ভোজনাগারে জাহাজের কোন না কোন খানসামা সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকে, তাদের বল্লেই আমার বেহারাকে ডেকে দেয়। কিন্তু ভোজনাগার পর্য্যন্ত টলমল করে যেতেই যেন এক যুগ কাটল। তারপর ঘুমন্ত খানসামাদের ডেকে, জাগিয়ে, নীচে পাঠাতে আর এক যুগ। শেষে সিঁড়ি দিয়ে পা সামলিয়ে নেমে আমার ক্যাবিনের দুয়োর পর্য্যন্ত এসে দাঁড়াতে আর এক যুগ। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলুম আর এক যুগ। সমুদ্রব্যাধিমুক্ত বেহারাটি গজেন্দ্রগমনে এসে চাবি খুলে দিলে। আমার ঘরে ঢোকারই বাকী ছিল কি ভিতরটা বাইরে ছুটে পড়ল। যেন কোন দৈত্য পাকস্থলীর মধ্যে পাম্প বসিয়ে বসিয়ে তার সমস্ত সঞ্চয় নিঃশেষে খালি করে দিতে দৃঢ়ব্রত হল। সে দত্যির তাড়না ডাঙ্গায় হয় না, তার শাসন মিঠে জলে চলে না, শুধু লবণাম্বুধিতেই তার উৎপত্তি, প্রভাব ও প্রলয়।

যাত্রাকালে আমার পুত্রটি বলেছিলেন— "জ্যোতিষীর কথা ত ভুল হল না, এই ত তোমার সমুদ্রযাত্রা হল।"

তখনও সেটা বাজে সন্দেহ বলে মনকে স্তোক দিয়েছিলুম। এখন কিন্তু এই সাক্ষাৎ দৈত্যের সমক্ষে আর সমুদ্রযাত্রাকে অস্বীকার করতে পারলুম না। জ্যোতিষের পক্ষ সমর্থন অতঃপর অসম্ভব হল।

পরদিন আর উঠতে পারলুম না। মধ্যাহ্নে অতি কষ্টে স্নানাগারে গিয়ে স্নানটা করে আসা গেল। এঞ্জিনঘরের নীচেই স্নানের ঘর। স্নানের ঘরেও বিজলীর পাখা লাগান আছে, পাখা চালিয়ে স্নান করতে হয়। নয়ত উত্তাপাধিক্যে সহজ অবস্থাতেও সেখানে গা ঘোরে,— সমুদ্র-ব্যাধির কবলিত হলে ত কথাই নেই। কোনক্রমে স্নানটা সেরে টলতে টলতে আবার বিছানায় এসে পড়লুম। জাহাজের খানসামা ক্যাবিনেই খাবার সাজিয়ে নিয়ে এল। ফল ছাড়া আর কোন কিছু খেতে প্রবৃত্তিই হল না। সরাদিন চোখ বুজে পড়ে রইলুম। উঠলে, বা বালিসের থেকে মাথা তুল্লেই দৈত্যের তাড়না। তবু মাঝে মাঝে মাথা উঁচু করে ক্যাবিনের গোল গবাক্ষ দিয়ে, কালো জলের নৃত্যোচ্ছ্বাস দেখার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না।

কাল বিকেল পর্য্যন্ত, সুন্দরবনের উপকূল পর্য্যন্ত ভারতের সীমার মধ্যেই ছিলুম। সে সীমা অতিক্রম করতে না করতে উত্তাল তরঙ্গের সম্মুখীন হলুম। আজ সকালে দেখি, যে বিশাল জলপ্রাঙ্গণ বহুযোজন ব্যেপে শায়িত ছিল, সে হঠাৎ খাড়া হয়ে উঠে, নিজেকে চূর্ণ চূর্ণ করে ভেঙ্গে, আবার গড়ে, পর্ব্বতসম প্রাচীরের আকার ধারণ করে কলগর্জ্জনে বলছে— "যেতে পাবে না, পাবে না— আমাকে অতিক্রম করে কিছুতেই যেতে পাবে না।"

কালাপানির ঘোর কালো জল ভারতকে আগলিয়ে রয়েছে। ভীষণ অঘোরীর মত

শাণিত ফেনিল অস্ত্র দেখিয়ে পথিকের পথ রোধ করতে চাইছে। কিন্তু ব্যর্থ তার আস্ফালন। চেতনের ইচ্ছাশক্তির কাছে জড়ের শত উদ্যমও পরাস্ত। এই ভীষণ সমুদ্রপথ বেয়েই বিদেশীরা ভারত উপকূলে উপনীত হয়ে ভারতকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছে। আজ ভারতের লোকও কালাপানির অভিভাবকতায় আর ত্রস্ত নয়। তারাও কালো থেকে নীল, নীল থেকে সবুজ, সবুজ থেকে সাদা জলের রাজপথ ঘুরে ফিরে বিশাল ভারতের উপান্তে দেশদেশান্তে উপস্থিত হচ্ছে। সেই পথ ধরে আমিও চলেছি।

সন্ধ্যাবেলায় বেহারা বল্লে— এখন ঝড় থেমে গেছে, জাহাজ আর তত দুলছে না, দুটি একটি বাদে সব যাত্রীই যারা ডেক থেকে পালিয়েছিল— ফের ডেকে ফিরে গেছে। জাহাজ দুটো দরিয়া ছাড়িয়ে এখন তিনটে দরিয়াতে পৌঁচেছে, এবার আমি স্বচ্ছন্দে উপরে যেতে পারি।

বুঝলুম, গঙ্গা ও বঙ্গোপসাগর ছাড়িয়ে বোধ হয় এখন Gulf of Martaban এসে পড়েছি। আমার কিন্তু আজকের সন্ধেতে আর উপরে যেতে উদ্যমে কুলল না। তার পরদিন সকালে জেগে পায়ের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে যখন দেখলুম ভিতরটা আর বাইরে আসতে চাচ্ছে না, তখনই উপরে যেতে সাহস করলুম।

এই তৃতীয় দিনটা ভারি চমৎকার লাগ্‌ল। ঠিক যেন গঙ্গার উপর ষ্টীমারে হাওয়া খেতে বেরিয়েছি। দুজন সাহেব ডেকের উপর 'রিঙ' খেলতে লাগল। টেনিস বা ব্যাডমিন্টন-কোর্টের মত ডেকের উপর খড়ি দিয়ে ঘর কাটা, মাঝখানে একটা জাল টাঙ্গান। বলের পরিবর্ত্তে একটা খড়ের বিঁড়ে— জালের এপাশে ওপাশে হাতে করে ঘুরিয়ে ফেলে খেলা হচ্ছে, তাকেই বলে 'রিঙ'। অল্প পরিসরের মধ্যে যতটা আমোদ ও ব্যায়ামের সুযোগ উদ্ভাবন করা যেতে পারে, তার ত্রুটি নেই। বিকেল থেকেই ব্রহ্মদেশের আবছায়া দেখা গেল। বেসিনের আলোকস্তম্ভ দূর থেকে ক্ষণে ক্ষণে জ্বলজ্বল করতে লাগল। এখন আর অপার সমুদ্রের উপর নেই আমরা, দুদিকেই পার দেখা যাচ্ছে।

পরদিন ভোরে ইরাবতীর ভিতর দিয়ে টকটকে লাল বালারুণের মুকুটপরা রেঙ্গুন-বন্দরের অজানা কূলে এসে লাগলুম। একটা নির্দ্দিষ্ট আমন্ত্রণে বাড়ী ছেড়ে ব্রহ্মদেশের অভিমুখে, পরিচিত ছেড়ে অপরিচিতের দিকে বাহির হয়েছি বটে— কিন্তু তবু অনির্দ্দিষ্টের আশঙ্কা মনের অন্তস্তলে বরাবরই দোলা দিচ্ছে।

জাহাজ একেবারে বন্দরে পৌঁছতে প্রায় ঘন্টাখানেক দেরী হবে শোনা গেল। বেহারার উপর জিনিষপত্র গোছগাছের ভার দিয়ে আমি ডেকের উপর নতুন শহরের প্রথম দৃষ্টিটা উপভোগ করতে এলুম। একটি মাদ্রাজী ভদ্রলোক অকস্মাৎ কোথা হতে আবির্ভূত হয়ে আমায় অভিবাদন করলেন। নিজের পরিচয় দিলেন তিনি রাজা রেডিয়ারের সেক্রেটারী, পাইলটের নৌকায় তিনি আগেই এসেছেন। রাজা এবং অন্যান্য সকলে বন্দরে প্রতীক্ষা করছেন। মিনিট পাঁচেক পরেই আবার পাঁচ ছয়টি লোক হঠাৎ কোথা দিয়ে এসে আমায় ঘিরে ফেল্লেন। তাঁদের প্রত্যেকেরই হাতে ফুলের মালা। একজনের হাতে একটা মস্ত তোড়া। তাঁরা বন্দরে

প্রতীক্ষা না করে হেল্‌থ অফিসারের নৌকাতেই এসে পড়েছেন বল্লেন। পরস্পরে পরস্পরের পরিচয় দিতে দিতে আমায় মাল্যভারে অবনত করলেন। তাঁদের মধ্যে একজন রাজা রেডিয়ার—রেঙ্গুনের মাদ্রাজী ক্রোড়পতি, বর্ম্মা প্রাদেশিক হিন্দু কন্‌ফারেন্সের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি, একজন স্বামী শ্যামানন্দ—রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ত্তা, একজন ডাক্তার ওটদিত্তামল, রেঙ্গুন আর্য্য সমাজের 'প্রধান'। পার্সী হেল্‌থ অফিসার ও তৎসঙ্গী একজন মুসলমান ব্যারিষ্টারও আমায় 'বর্ম্মাপ্রদেশে স্বাগত' বলে অভিবাদন করলেন। সকলের সাগ্রহ ও সাদর অভ্যর্থনায় মুহূর্ত্তের মধ্যে দূর নিকট হয়ে পড়ল, শূন্য পূর্ণ হয়ে গেল, কথাবার্ত্তায় রেঙ্গুনে ও রেঙ্গুনের বাইরেও আমার জন্যে যে দীর্ঘ কার্য্য-তালিকা প্রস্তুত হয়ে রয়েছে, তার কতকটা আভাষ পেলুম।

স্বামী সত্যানন্দের খোঁজ হল; তাঁকেও ক্যাবিন থেকে বার করে যথাযোগ্যভাবে সম্মানিত করা হল।

একজন বন্দরের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, দূর থেকে বহু লালপাগড়ীর ভিড় মনে হল। আমি ভাবলুম—এ কি সরকারী সাবধানতা? আগন্তুকেরা বললেন,—"না, ঐ লাল রঙ্গ লাল নিশানের, নিশান হাতে বিপুল জনতা আপনার জন্যে ভোর থেকে অপেক্ষা করছে।"

আমাকে তারা কোনদিন চোখে দেখেনি, আমিও তাদের কোনদিন চোখে দেখিনি, চেনা বা অচেনাদের এতটা শ্রদ্ধার অপাত্রতা সম্বন্ধে নিজের অনুভূতি প্রগাঢ় হয়ে আমায় লজ্জাবনত করলে। কিন্তু বাঁধি গতের অঙ্গ জেনে ওর অনিবার্য্যতা বিচার করে মনকে নিরঙ্কুশ করলুম।

খরখরে রৌদ্র উঠার পর প্রায় বেলা ৯টার সময় জাহাজ বন্দরে ঢুকল। তারপরে হিন্দুসভা ও কন্‌ফারেন্সের সেক্রেটারীদ্বয়—মিষ্টার জে, সি, ঘোষ ও মিষ্টার লাঠিয়ার তত্ত্বাবধানে প্রসেশন পরিচালিত হল। সকলে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে প্রায় ১১টার সময় গন্তব্য গৃহে পৌঁছলেন। সে গৃহটি মহাত্মা গান্ধীর সোদরোপম বন্ধু সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মেটার। সাবরমতী আশ্রমে আমার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হয়। তিনি কলিকাতাতেই তার করে তাঁর আতিথ্য গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠা কন্যা, রেঙ্গুনের জষ্টিস সেনের পত্নী, মেটা সাহেবের দাবীর উপর নিজের দাবীর শ্রেষ্ঠতা সপ্রমাণ করে আমাকে নিজ গৃহে নিয়ে গেলেন। তাঁদের গৃহে প্রত্যহ একবার আনাগোনার সর্ত্তে আমি মেটা পরিবারের নিকট মুক্তি পেলুম।

অতিথির সঙ্গে সঙ্গে দুজন মাদ্রাজী ভলন্টিয়ারের হস্তধৃত দুখানি স্বরাজ পতাকা জজসাহেবের গৃহদ্বারে শোভমান হল।

রেঙ্গুন

ছবির মত উপকূলটি। এতদিন পরেও স্মৃতির নেগেটিভ থেকে সে ছবিখানি চোখের সামনে ফুটে ওঠে। সেদিন মানুষ ও দেবতায় মিলে দৃশ্যখানি এঁকে তুলেছিলেন। সেদিনও অন্যান্য দিনের মত ধরণীর পায়ের তলায় জলদেবী ইরাবতী তনুখানি এলিয়ে রয়েছেন বঙ্কিম ভঙ্গীতে, তাঁর দেহের বাঁকে বাঁকে তটের উপরেই মানুষের হাতের কারিগরিও তেমনি রয়েছে, সেগুলি বিদেশী সওদাগরদের আপিস মাত্র হলেও আকারে প্রকারে সেখানকার প্রকৃতির সঙ্গে যেন বেমানান হয়নি। কলকাতার উপকূলবর্ত্তী সৌধের মত নয় তারা, আর এক ছাঁদের হয়ে নূতন দেশের নূতনত্বের অংশ যেন তারাও বহন করছে।

মানুষের হাত পেরিয়ে আকাশ যেখানে দেবতার হাতে পৌঁছেচে, সেই অন্তরীক্ষেই সেদিন কিন্তু আসল কারিগরি দেখলুম। কে এক চিত্রকর এমন তুলি হাতে সেখানটায় এঁকেছেন, দেখলে অবাক্ হতে হয়। বোধ হয় তিনি রোজই আঁকেন—সমতল বাঙ্গালায় আমাদের চোখে পড়ে না। আমরা সূর্য্যোদয় দেখি যখন সূর্য্য আকাশে খানিকটা চড়েছেন, একখানা সোনার থালার মত। কিন্তু সেদিন যে সূর্য্য আঁকা দেখলুম, সে যথার্থই বাল-সূর্য্য, গালখানি টক্‌টকে, শিশুর মত কোমল স্থির নির্ব্বাক দৃষ্টিতে ধরণীর প্রতি চেয়ে রয়েছে। আর নদীর দর্পণে নিজের মুখখানি দেখে বিস্ময় বিস্ফারিত হচ্ছে।

তারপর, ডাঙ্গায় নেমে আর এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য। সহরের যেখানেই যাও, যেদিকেই ঘোরো ফেরো, এক একটি অভ্রভেদী সোনালী টোপর নগরকোতোয়ালের মত নগরের প্রহরায় নিযুক্ত রয়েছে। নবাগতের দৃষ্টি যেমন ক্রমাগতই তাদের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে, তাদেরও দৃষ্টি নবাগতের প্রতি প্রতিমুহূর্ত্তে আপতিত রয়েছে। কলকাতার মত ট্রাম, মোটর ও বাস্‌বহুল আধুনিক সহরের বুকের ভিতরই তাদের প্রতিষ্ঠা। টোপরযুক্ত রক্ষীগুলির শরীর নীচের দিকে ক্রমশঃ স্ফীত ও বিস্তারিত হয়ে এক একটি গম্বুজের আকার ধারণ করেছে। চূড়ার সমৃদ্ধি ও গর্ব্বে শান্তির বার্ত্তাবহী এই সৌধগুলি এক একটি বৌদ্ধ মন্দির বা পাগোডা; এদের মধ্যে একটি সুপ্রসিদ্ধ শোয়ে-ডাগন, আর একটি সুলে-পাগোডা। এই মন্দির ও তাদের সংশ্লিষ্ট সাধু আবাসগুলি ভারতবিতাড়িত বৌদ্ধধর্ম্ম, বৌদ্ধবিহার ও বৌদ্ধ-জীবনপদ্ধতি বর্ম্মায়িত হয়ে এখানে যে বিশেষতা লাভ করেছে তা প্রতিপদে ব্যক্ত করছে। রেঙ্গুনের রাজপথে নানাজাতির বিচরণ, তার বাণিজ্য ব্যাপারে সর্ব্বজাতির সমানাধিকার, কিন্তু সে যে বর্ম্মীর দেশ, তার সেই বর্ম্মীত্ব, বর্ম্মীপ্রাণ ও প্রকৃতির বিশেষত্ব সমস্ত কলকোলাহলের মধ্যে একটা নিজস্ব সুরের মত এই মন্দিরগুলিতে পরিস্ফুট হয়ে আছে।

কলকাতা যে বাঙ্গালীর দেশ, কলকাতার সার্ব্বজনীনতার মধ্যে সেই বাঙ্গালীত্বের কোন বাহ্য পরিচয় পাওয়া যায় কি? বর্ম্মাদেশ ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগতই এই প্রশ্ন মনে উদয় হতে লাগল— সারাটা বঙ্গদেশের গায়ে বাঙ্গালীর বিশেষত্ব কোথায় ফুটে আছে? কোন্ স্থাপত্যে বা কোন্ কারুকার্য্যে? নদীতীরে সারি সারি দ্বাদশ শিবমন্দিরে ছাড়া বাঙ্গালী আর কোনরকমে

নিজেকে বাইরে প্রকাশ করেনি। বর্ম্মীদের মন্দিরের মত সেগুলি অভ্রভেদী হয়ে দিনে সোনায় ও জহরতে এবং রাত্রে বিজলীর দীপমালায় ঝক্‌ঝকিয়ে দূরদূরান্তর থেকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। উড়িষ্যা ও মাদ্রাজের মন্দিরগুলির মত ভাস্কর্য্যের কোন গরিমাও তাদের নেই। আর ভিতরের দৃশ্যেও কত প্রভেদ। থাক, সে কথা পরে বলব।

রেঙ্গুনে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ বন্দরখানা ছোট। এক একজন মানুষের নিরীহ চেহারার পিছনে যেমন কখন কখন একটা প্রচণ্ড জীবন-ইতিহাস প্রচ্ছন্ন থাকে, এই বন্দরের পিছনে সহরখানাও তেমনি প্রচ্ছন্ন রয়েছে। বাইরে থেকে তার কোন আভাষ পাওয়া যায় না। ডক পেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়লেই প্রথমত দেখা যায় দক্ষিণ ভারতের কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যের মত কেবলই অর্দ্ধ-উলঙ্গ, মাথার সামনেটা কামান, পিছনে বেনে খোঁপা বাঁধা বা ঘাড়-পর্য্যন্ত-লম্বমান-চুল মাদ্রাজী কুলি ও রিক্‌শ-ওয়ালার দল। এক বৎসর পূর্ব্বে এদেরই সঙ্গে বর্ম্মী কুলিদের ভীষণ দাঙ্গা হয়ে গেছে, যেমন সে বছর ঢাকায় পুলিসের চোখের উপর হিন্দু ও মুসলমানে দাঙ্গা হয়েছিল। এদের নিরস্ত্র আত্মীয় স্বজনদের ছোট ছোট গলির মধ্যে অবরুদ্ধ করে মারপিট ও হত্যার তাণ্ডবলীলা চলেছিল। সেই অবধি নাকি হাজার হাজার বিদেশী কুলি বর্ম্মা থেকে দেশে ফিরে গেছে।

কলকাতা যেমন সার্ব্বজনীন সহর, তার কোন কোন পাড়ায় বাঙ্গালীর মুখ প্রায় দেখাই যায় না, রেঙ্গুনও তাই; এরও রাস্তাবিশেষে বর্ম্মীমুখদর্শন দুর্লভ। ছোটলোক মাদ্রাজীর পর ভদ্রলোক গুজরাটীর সংখ্যা এখানে খুব বেশী, তাছাড়া ভারতীয় মুসলমান ভদ্র ও অভদ্র সব রকমের। তাদের মধ্যে যারা এখানে বিয়ে-থাওয়া করে ঘরবসত করছে, তাদের একটা স্বতন্ত্র নামই হয়ে গেছে—'জেরবাদি'। পথেঘাটে বাঙালী খুব বেশী দেখা যায় না, পাঞ্জাবীও না, কিন্তু পরে অভিজ্ঞতা লাভ হল বর্ম্মার বন্দরে বন্দরে বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবীর অধিষ্ঠান।

প্রাচীনকাল থেকেই চট্টগ্রামী, মণিপুরী ও আরাকান বাঙ্গালীর গতিবিধি ত এখানে আছেই, তাদের রক্তে বর্ম্মী রক্তও অনেকটা মিশ্রিত হয়েছে, তাদের ভাষা আচার-ব্যবহারও বর্ম্মী হয়ে গেছে—তথাপি ধর্ম্ম ও সঙ্গীতগত একটা স্বাতন্ত্র্য তারা আজ পর্য্যন্ত রক্ষা করে এসেছে— সে বিষয়ে পরে বলব। কিন্তু আধুনিক ব্রিটিশ শাসনের অঙ্গীভূত বাঙ্গালীর সমাবেশ এখানে অত্যধিক। তাঁরা প্রায়ই উকীল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার বা চাকুরে; ব্যবসায়ী খুব অল্প। পাঞ্জাবীরা একেবারেই আধুনিক। তাঁদের মধ্যে চাকুরে ছাড়া বাণিজ্য-ব্যবসায়ী লোকও অনেক আছেন।

রেঙ্গুনপ্রবাসী বাঙ্গালীদের গৃহিণী ও কন্যারা একদিন সভা করে আমার সঙ্গে মিলনোৎসুক—এ সম্বাদ স্বামী শ্যামানন্দ তীরে পদার্পণের পূর্ব্বেই আমাকে জানিয়েছিলেন, এবং উত্তর বর্ম্মার মেমিও নামক পার্ব্বত্য-সহরে আর্য্যসমাজের উৎসব উপলক্ষে প্রবাসী পাঞ্জাবী এবং তাঁদের গৃহিণীরাও আমায় আমন্ত্রণ-অভিলাষী—একজন পাঞ্জাবী ডাক্তারের প্রমুখ এ সম্বাদও জাহাজ থেকে উত্তীর্ণ হবার পূর্ব্বেই পেয়েছিলুম।

দেশের মেয়ে দেশের লোকের সঙ্গে দেখাশুনার আনন্দলাভের জন্য আগ্রহান্বিত ত

ছিলুমই ; —কিন্তু যে নূতন দেশে এসেছি সেই দেশের নরনারীর সঙ্গে, তাঁদের আচার-বিচার, রীতিনীতি, কাব্য-ইতিহাস, কলা ও কারুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয়ের জন্যেও বিশেষ লোলুপ ছিলুম। সে লোভ চরিতার্থতার সুযোগ যে গৃহে আতিথ্যলাভ করলুম সেই গৃহে প্রশস্ততম— এ কথা প্রত্যেক ভারতবর্ষী আমায় জানালেন। জষ্টিস সেন ও তাঁর গৃহিণীর বন্ধুমণ্ডলটি সুবিস্তৃত, এবং তাঁদের বন্ধুবাৎসল্য সুপ্রসিদ্ধ। কি স্বদেশী কি বিদেশী, কি ভারতীয় কি বর্ম্মীয়, কি আর্মানী কি পারসী, কি বাঙালী কি গুজরাটী—সকলের সঙ্গেই তাঁদের মেলামেশা ও হৃদ্যতার আদান-প্রদান সমভাবে প্রবর্ত্তিত। তাই তাঁরা রেঙ্গুনে সর্ব্বলোকপ্রিয়। প্রতিদিনই তার চাক্ষুষ প্রমাণ পেতে থাকলুম।

অতিথিসৎকার-পটীয়সী সখী আমার জানতেন যে কেবল ভাল করে খাইয়ে দাইয়ে, আরামে আদরে যত্নে রেখেই তাঁর অতিথিসেবা সম্পূর্ণ হবে না ; —যতক্ষণ না বর্ম্মার যা কিছু দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য তা আমায় দেখিয়ে শুনিয়ে দেবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁর কর্ত্তব্যের অবসান নেই। এই আদর্শ-আতিথ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি জানবার আগে, ভাববার আগে, বলবার আগে তিনি আমায় বর্ম্মার সর্ব্বতোরস উপভোগ করাবার জন্যে চিন্তিত থাকতেন, এবং ভিতরে ভিতরে তার আয়োজন করতেন। যার নিজের রসবোধ নেই, সে অপরকে রসাস্বাদনের জন্যে ভাবিত হয় না। তাঁর নিজের রসগ্রাহিতা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, —কেশবচন্দ্রের কন্যা ত তিনি, — তাঁর অতিথিকেও রসদানে তাই এত আগ্রহান্বিত থাকতেন।

আমি রেঙ্গুনে এসেছি একটা গুরুতর দায়িত্ব নিয়ে, — বর্ম্মা প্রাদেশিক হিন্দুসভার অধিবেশনে সভানেতৃত্ব করতে। সমস্ত দিনটা তাতে ব্যাপৃত থাকি। তার ঠাট সব রাজনৈতিক সভার মত। প্রেসিডেন্টের 'ব্যাজ' ধারণ করে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে লাইন করা ভলান্টিয়ারদের 'স্যালুট' গ্রহণ করে, লাল কাপড় পাতা নির্দ্দিষ্ট পথে সভাস্থলে প্রবেশ করে, সহস্র সহস্র ভারতবাসীদের সঙ্গে সম্মিলিত হই। বৌদ্ধ ও মুস্‌লিম ভাইদের সঙ্গে সৌভ্রাত্র্য রক্ষা করে বর্ম্মাপ্রবাসী হিন্দুদের হিতকল্পে যত কিছু প্রস্তাব ও পন্থা ভাবা যেতে পারে, তার পর্য্যালোচনায় সাহায্য করি। তর্ক-বিতর্ক, বাক্‌বিতণ্ডা, রাগারাগি ও দলাদলির সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে সভার কার্য্যতরীখানি বেয়ে চলি। সারাদিনের পর শ্রান্তক্লান্ত দেহে বন্ধু-গৃহে ফিরি। সেখানে তাঁর তত্ত্বাবধানে বিশ্রামান্তে সতেজ হয়ে উঠে তাঁর আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলিতে যোগদান করি।

তাঁর প্রথম রাত্রির আয়োজন হল দুটি উচ্চপদস্থ বিশিষ্ট বর্ম্মী বন্ধুকে তাঁর গৃহে ডিনারে আমন্ত্রণ করা। ইতিপূর্ব্বে সকালেই একজন 'লীডার' আমার সঙ্গে দেখা করে গেছেন 'মাউঙ' নাম—। তারপরে আসেন 'চমিন'। দুজনেই যুবা ও দুজনেই ন্যাশনালিষ্ট। মাউঙ বাল্যকাল হতেই ভারতবর্ষে হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষিত, থিয়সফিষ্টদের হাতে মানুষ ; তাই ভারতের প্রতি অত্যন্ত স্নেহযুক্ত, ভারতবর্ষ থেকে বর্ম্মা-ব্যবচ্ছেদের অত্যন্ত বিরোধী ও সেই দলের অন্যতম নেতা ; চমিনও তাই। চমিন ভারত কৌন্সিলের একজন সদস্য। ইনি গল্প করলেন, গত বৎসর দিল্লী থেকে মহাত্মা গান্ধী যখন বম্বে ফিরে যান, ইনি ষ্টেসনে ছিলেন। যে বিপুল

জনতা মহাত্মাজীকে বিদায় দিতে গিয়েছিল, সেই হাজার হাজার লোকের মধ্যে তিনি লক্ষ্য করে দেখলেন তিনজন মাত্র খদ্দরপরিহিত নয়—সেই তিনজনের মধ্যে একজন তিনি—বাকী সকলের পরিধানে শুভ্র খদ্দর। সেই শুভ্র স্বদেশীয়তার প্রচণ্ড প্রভাব তাঁর হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট হল, তিনি সেই মুহূর্ত্তে অনুভব করলেন—ভারতীয় নাশনালিজ্‌মের শক্তি কোথায়, এবং শিক্ষালাভ করলেন বর্ম্মায় তাঁদের মত নেতাদের কি কর্ত্তব্য।

মাউঙ ভারতবিচ্ছেদ নিবারণের জন্য তীব্রভাবে প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত। তাঁর এ বিষয়ে ছাপান কাগজপত্র ও পুস্তিকাসকল আমায় দিয়ে গেলেন। তিনি মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সবরমতি আশ্রম পর্য্যন্ত ঘুরে এসেছেন, ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আবার শীঘ্রই ভারতে ফিরে যাবেন, এবং সেখান থেকে বিলেত যাবেন। মাউঙ ও চমিন দুজনেরই পোষাক ভদ্রশ্রেণীর বর্ম্মীয়োচিত, — রেসমি লুঙ্গি, রেসমি চীনে-কাটের কুর্ত্তা, ও রেসমি রুমালের ছোট পাগড়ি—এমন সুশ্রী, এমন ফিটফাট, এমন ফ্যান্সি ড্রেসের উপযুক্ত—চোখ জুড়িয়ে যায়। আমি চমিনকে বল্লুম, "তোমরা যে একটা প্রচণ্ড রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ভিতর রয়েছ তা তোমাদের পোষাক দেখলে মনে হয় না। যুদ্ধে নেমেও ভারতবাসীর মত সব শোভা সৌন্দর্য্য তোমাদের ত্যাগ করতে হয়নি সে ভাল।" তিনি বল্লেন —"আমাদের দেশেও খদ্দর হয়, তাকে আমরা বলি 'পিনি', গরীব-গুরবারা পরে। আমরা ক্রমে ক্রমে সেটা ন্যাশনালিষ্টদের পরিধান করে আনব।"

ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় জাহাজে ফার্ষ্টক্লাসে একজন ন্যাশনালিষ্ট বর্ম্মীকে পিনির কুর্ত্তা পরিহিত দেখলুম, — সাদা নয়। আমাদের দেশের ফিকে খাকি খদ্দর। কিন্তু রঙচঙে রেসমি লুঙ্গি ও পাগড়ি থাকায় তাতে ঠাটের কিছুমাত্র ন্যূনতা হয়নি।

মিসেস সেন তাঁর গৃহে সান্ধ্যভোজে যে দুজন বর্ম্মী বন্ধুকে আমন্ত্রণ করেছিলেন, তার মধ্যে একজন সস্ত্রীক মিষ্টার বার্দূন এবং আর একজন পর্ত্তুন্‌। বার্দূন উচ্চপদস্থ গবর্ণমেন্ট কর্ম্মচারী, পলিটিক্সের ধার ধারেন না ; পর্ত্তুন্‌ ব্যারিষ্টার ও একটি পোলিটিকাল দলের নেতা।

বার্দূন একজন বিদ্বান ব্যক্তি। বর্ম্মার ইতিহাস, সাহিত্যকলা প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞান তাঁর অগাধ। তাঁর স্ত্রী সুন্দরী ও ভারি একটি সৌকুমার্য্যসম্পন্না। তাঁর বেশভূষায় কথাবার্ত্তায় এমন একটি মোহিনী আছে যা বর্ম্মী মেয়েদের বিশেষত্ব।

পর্ত্তুনের পত্নী আমেরিকান, আজ অসুস্থ বলে আসতে পারেননি। পর্ত্তুন্‌ ইংরেজী ডিনার সূটে বিভূষিত হয়ে এসেছেন, বর্ম্মার আত্মা যেন তাঁর দেহত্যাগ করে চলে গেছে মনে হল। এর পরে আর একদিন তিনি সস্ত্রীক চায়ের নিমন্ত্রণে এসেছিলেন, সেদিন কিন্তু বর্ম্মীজ পোষাকে শোভিত ছিলেন। সেদিন তাঁর দেহের ভিতর স্বাভাবিক মানুষটাকেও যেন চেনা যাচ্ছিল।

বার্দূনের কথায় জানতে পারলুম, আদৎ যে বর্ম্মা জাতি, তারা নিজেদের মূলতঃ তিব্বতী আর্য্য জাতি বলে বিশ্বাস করে। ভারতবর্ষের প্রতি তাদের বিশেষ টান নেই। বৌদ্ধধর্ম্মগত যে টান সেটা সিংহলের উপরেই বেশী পড়েছে। কেননা প্রথম প্রথম উত্তরপূর্ব্ববঙ্গ থেকে বৌদ্ধ প্রচারকের দল বর্ম্মাদেশে অভিযান করলেও শেষাশেষি সিংহলের মহাযান-পন্থার

বৌদ্ধধর্ম্মই তাদের মধ্যে বিশেষভাবে বিস্তারলাভ করেছে ; সিংহল থেকে বুদ্ধের দন্ত প্রভৃতি অনেক স্মৃতিচিহ্ন তারা লাভ করেছে ; তাই প্রায় দু'তিন শতাব্দী থেকে সিংহলের সঙ্গেই বর্ম্মার বৌদ্ধদের বেশী ঘনিষ্ঠতা, এবং সিংহলে যাতায়াতও বেশী।

এদিকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংঘর্ষে বর্ম্মাস্থ ভারতবর্ষীয়দের প্রতি অনেক বর্ম্মীরা সম্প্রতি বিশেষভাবে বিমুখ হওয়ায় ভারতবর্ষের প্রতি তাদের ধর্ম্ম ও সভ্যতার ঋণ একেবারে ভুলে যাবার যোগাড় হয়েছে। হিন্দু মহাসভার সভানেত্রী যে বৃহত্তর ভারতের স্বপ্ন ও সন্দেশ নিয়ে এখানে উপনীত হয়েছে, তার কর্ণকুহরে বর্ম্মীমুখপ্রসূত এ-সব তথ্যগুলি বড় শ্রুতিমধুর হল না। কিন্তু বার্দূন এ-সব ঝগড়াঝাঁটির ধার ধারেন না। সকলের সঙ্গে মেলামেশাতেই তাঁর আনন্দ। ভারতবর্ষ থেকে যে কোন খ্যাতনামা লোক আসেন তাঁদেরই তিনি সম্বর্দ্ধনা করেন। লাহোরের তথা-কথিত বৌদ্ধ, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর স্বজাতি, পণ্ডিত শিবনারায়ণ একবার বর্ম্মা পরিভ্রমণে আসার পর বার্দূনের পরম বন্ধু হয়েছেন। পূজনীয় মাতুল রবীন্দ্রনাথকেও নাকি তিনি বর্ম্মী কলাগহনের মধ্যে পরিচালিত করেছেন। ভারতবর্ষে কিন্তু কখন যাননি ; সিংহলে ও শ্যামে যেতেই তাঁর সমস্ত অবসর কেটে যায়। আমায় তার পরদিন প্রভাতে শোয়ে-ডাগন পাগোডা দেখানর ভার তাঁরা নিলেন। তার বর্ণনা পরে দেব।

দুদিন পরে আমার জন্যে বার্দূন একটা মস্ত বড় বার্ম্মীজ ভোজের আয়োজন করলেন। সে রাত্রি বাকী সকল নিমন্ত্রিতদের জন্যে কিছু কিছু আমিষ খাদ্য থাকলেও আমার হিতকল্পে মিসেস বার্দূনের স্বহস্তে রাঁধা বর্ম্মীজ নিরামিষ ব্যঞ্জনে টেবিল ভরে গিয়েছিল। তিনি নিজে সে-দিন আমাদের সঙ্গে খেতে বসতে পারেননি। বর্ম্মীজ-চটিপরা-পায়ে দুখানা টেবিলে দ্রুতগতিতে পরিবেশন করতে এত ব্যস্ত ছিলেন যে, আমাদের সঙ্গে বসে খাবার তাঁর তিলমাত্র অবসর ছিল না। আমি আনাড়ির মত খাচ্ছি লক্ষ্য করে, আমার প্রতি বিশেষ স্নেহে আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছোট ছেলেকে মা যেমন সব মেখেচুকে খাইয়ে দেয়, তেমনি আমার প্লেটে একরাশ বার্ম্মিচেলি সিদ্ধ ভাতের মত তুলে দিয়ে, তাতে সবরকম ব্যঞ্জন একত্রে মিশিয়ে অনেকটা তেঁতুলগুলা ঢেলে সুমিষ্টভাবে বল্লেন—"এইবার ঠিক হয়েছে, ভাল করে খান।" তরকারিগুলি অধিকাংশ সামুদ্রিক ঘাসের। আমি প্রত্যেকটা একটু একটু করে খেলে হয়ত বেশী স্বাদ গ্রহণ করতে পারতুম — কিন্তু সেটা বর্ম্মীজ রীতি হত না। গৃহকর্ত্রী যে ভাবে মিশিয়ে দিলেন সেটা ঠিক বর্ম্মীজ কায়দা, কিন্তু তাতে সে রাত্রে আমি প্রায় অভুক্তই থেকে গেলুম। দু-একটি গ্রাস কষ্টে-সৃষ্টে গলাধঃকরণ করে, শেষে দু একটা আম খেয়ে ক্ষুধার তৃপ্তি করলুম। আমার পাশে মাউঙ ছিলেন। তিনি স্বদেশী নিরামিষ খাদ্যের দিব্যি মান রক্ষা করলেন। স্বাদ জিনিষটা অভ্যাসের বশবর্ত্তী। যে জিনিষটা যে রকম ভাবে আমরা খেতে অভ্যস্ত সেই রকমেই সুস্বাদু লাগে, অন্যথা রুচিকর হতে কিছু সময় চাই। সেই একই জিনিষ মিসেস সেন একদিন নিজের বাড়ীতে বাঙালী রকমে রেঁধে আমায় খাওয়ালেন, পরম উপাদেয় লাগল।

সে-দিন টেবিলে আর একটা জিনিস ছিল। 'ডোরিয়ান্' নামে কাঁঠাল জাতীয় এক ফল আমার জন্যে বিশেষ করে আনা হয়েছিল। এই ফল সম্বন্ধে আমার সখীর কাছে ইতিপূর্ব্বেই

আমি বর্ণনা শুনেছিলুম যে, এ ফল ভাঙ্গবার সময় এক মাইল দূর থেকে এর উৎকট গন্ধে অতিষ্ঠ হতে হয়—খাওয়াও সকলের সাধ্য নয়। কিন্তু সামনা-সামনি ভাঙ্গা হয়নি বলে, শুধু কতকগুলি কোয়া টেবিলে রাখা ছিল বলে বোধ হয় গন্ধের কোন তীব্রতা কেউ অনুভব করেনি। কোয়াগুলি খেয়ে যা দেখলুম, তাতে কিছু সুস্বাদ না পেলেও বিশেষ কিছু বিস্বাদও পেলুম না, নিকৃষ্ট জাতের নেও কাঁঠালের মত মনে হল। বাড়ী ফিরে এসে আমার বান্ধবী, এবং তাঁর স্বামী ও কন্যারা আমায় খুব বাহাদুরী দিলেন, বল্লেন— "বীরাঙ্গনা বটে ! নয় ত প্রথমবারেই ডোরিয়ান এমন নিঃশব্দে গলাধঃকরণ কর্‌লে।"

আমার সঙ্গে পরিচয় করাবার জন্যে বার্দুন সাহেব সেদিন তাঁদের দেশের চারপাঁচ নব্য যুবতীকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একটি খ্রীষ্টান, আবাল্য মিশনরিদের হাতে মানুষ, কলেজে পাশ করা---নাকে মুখে চোখে কথা কন। মাউঙও সে ডিনারে উপস্থিত ছিলেন বলেছি। তিনি থিয়সফিষ্ট, সুতরাং নিরামিষাশী, তাছাড়া কোন কোন ইঙ্গবঙ্গ বা ইঙ্গবর্ম্ম যুবকের মত ডিনার টেবিলে কথার তুবড়ি চালাতে পারেন না। তাঁর ভিতর একটি প্রাচ্য সৌম্য সংযম আছে। এই সবগুলি কারণে পূর্ব্বোক্ত নব্য বর্ম্মীজ মেয়েটির তিনি বিশেষভাবে উপহাসের পাত্র দেখলুম। ভদ্রলোককে প্রতি পদে পদে সে মেয়েটি বাক্যবাণে দিগ্ধ করতে লাগল। মাউঙ তাঁর শোভন ধৈর্য্যের বলে নিজেকে অক্ষত রাখলেন। বরঞ্চ শ্রোতারা শুনে শুনে হাসির আড়ালে অধীর হতে থাকল।

মাউঙ আমাকে একবার নেপথ্যে বললেন—"এ মেয়েটিকে বর্ম্মীজ শিক্ষিত মেয়েদের আদর্শ ভাবলে একটা ভুল ধারণা নিয়ে ভারতবর্ষে ফিরে যাওয়া হবে। সাধারণতঃ আমাদের মেয়েরা এরকম নয়, তারা শিষ্ট ও সংযত, এ মেয়েটি মিশনরি শিক্ষার ফল।"

তা সত্য। দোষে গুণে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংস্পর্শের নমুনা এ মেয়েটি। দোষগুলি উপেক্ষা করলে দেখা যায় সে অনেক গুণে গুণান্বিতা। সে গুণগুলি ফুটবার অবসর পেয়েছে মিশনরিদের কল্যাণে। সে গান গায় অতি সুন্দর। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মসঙ্গীতে সিদ্ধ গায়িকা, আবার ইংরাজী হাল গানে, মজার গানে, নাচুনে গানে, প্রেমের গানেও পরিপক্ক। তার মুখে সুমিষ্ট বর্ম্মীজ গানও শুনলুম; আমি তখনি তখনি তার স্বরলিপি করে নিলুম। সামাজিক সম্মিলনীতে যে কোন সমাজে তার পাসপোর্ট সহজলভ্য। এমন হাসিমুখী, জীবন্ত, প্রাণবন্ত মেয়ে উপস্থিত সবাইকেই প্রাণবন্ত করে তোলে। প্রাচ্য সমাজের আদর্শ তা হয়ত নয়; কিন্তু মনুষ্য সমাজে সেটা সর্ব্বত্র আদরণীয়। মেয়েটি শীঘ্রই গবর্ণমেন্টের বৃত্তি নিয়ে বিলেত যাবে—বিলেতের সমাজে সে নিজের মার্কা মারতে পারবে সন্দেহ নেই।

এদিকে যতই ইংরাজী প্রভাবান্বিতা হোক, সে সাজসজ্জায় সম্পূর্ণ বার্ম্মীজ। ইংরাজী পোষাক ও প্রসাধনের চেয়ে বর্ম্মীজ বেশে ও কেশবিন্যাসে যে তাদের আর্কষণী শক্তি শতগুণ বর্দ্ধিত হবে, সে বিষয়ে নব্য বর্ম্মীজ মেয়েদের মেয়েলি বুদ্ধি টন্‌টনে আছে। নিজের চুলটা পিছন থেকে আঁচড়িয়ে মাথার মধ্যিখানে তুলে নিয়ে পরিপাটি করে একটা ছোট বিঁড়ে মত করে তারা থেপে দেয়। তারপরে পরচুলা নিয়ে সেই গোল ভিত্তির চারপাশে জড়িয়ে জড়িয়ে

সেটাকে বড় ও উঁচু করে তোলে। যে যত উঁচু করতে চায় সে ততগুলো পরচুলা ব্যবহার করে। মধ্যে মধ্যে সুচারু কাঁটা ও চিরুনি বসায়। খোঁপার উচ্চতার পরিমাণ ফ্যাসনের সঙ্গে সঙ্গে বদলায়। এই মেয়েটি একবার সগর্ব্বে বললে—তার খোঁপায় তার দিদিমার চুলের পরচুলা জড়ান।

নব্য বর্ম্মিনীদের কাপড়ের ফ্যাসানে একটা পরিবর্ত্তন এসেছে। রঙিন ঘাঘরা বা লুঙ্গির সঙ্গে উপরের জামাটা এখন শুভ্র শ্বেতরঙের পরা ফ্যাসন হয়েছে। তাও খুব পাৎলা হওয়া চাই, যেন ভিতবের লেসওয়ালা বডিস সকলের চক্ষুগোচর হয়। এ তথ্যটা একজন বিবিয়ানাব বিরোধী বর্ম্মীজ্ পুরুষের সকাশাৎ লাভ করি। নব্য সহুরে মেয়েদের পরিধানে আর একটী বিশেষত্ব দেখা যায়। তাদের গলায় একটি সাদা শিফনের ছোট স্কার্ট বা উড়নী থাকে, তাতে সাদা জামার সৌন্দর্য্য আরও বর্দ্ধিত হয়।

খ্রীষ্টান মেয়েটি ছাড়া আরও দুটি কুমারী মেয়ে ছিল—তারা দুই বোন। তারাও নব্যশিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত, কিন্তু পুরাকালের মেয়েদেরই মত স্বল্পভাষিণী। তাদের মধ্যে একজন চিত্রকর ও একজন সঙ্গীতানুশীলনপর। চিত্রকর মেয়েটি একমাস পরে নিজের চিত্রের একটি প্রদর্শনী খুলবে, তার আয়োজন করছে। সঙ্গীতপরায়ণা মেয়েটি বর্ম্মীজ সঙ্গীতে ইংরাজী হার্ম্মনি কি করে ঢোকান যায় তার অনুসন্ধানে রত। মিসেস সেনের অনুরোধে আমার রচিত হার্ম্মনিযুক্ত দুই একটি বাঙ্গলা গান তাদের শোনান হল।

একটি বিবাহিত বর্ম্মীজ মেয়ে স্বামীসহ সে ডিনারে উপস্থিত ছিল। সে একে বারে চুপচাপ। শুনলুম বিবাহের পূর্ব্বে সে খুব চটকদার ও কইয়ে-বলিয়ে ছিল। ভদ্র বর্ম্মীজ পরিবারের রীতি অনুসারে বিবাহের পর তাকে এইরকম মৌন স্থবিরভাব ধারণ করতে হয়েছে। অনেকের ধারণা বর্ম্মার স্ত্রীরা পুরুষপরতন্ত্র নয়, অত্যন্ত স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। আমার বন্ধুরা বল্লেন সেটা ভ্রান্ত ধারণা। তাদের পর্দ্দা নেই বটে, তারা ইচ্ছে করলে নিজের জীবিকা নিজে অর্জ্জন করতে পারে বটে, কিন্তু ভদ্র-ঘরের বর্ম্মীজ পত্নী কখন পরপুরুষের সঙ্গে বেশী মেশামেশি, কথা-কওয়াকওয়ি করে না। এ বিষয়ে ভারতবর্ষীয় আদর্শ ও বর্ম্মী আদর্শ একই। একটি বর্ম্ম-ফরাসী দম্পতি ছিলেন। ফরাসী পত্নীর ভারতবর্ষের প্রতি অত্যন্ত আকর্ষণ, কোনদিন হয়ত ভারতবর্ষে আসবেন এই আশা হৃদয়ে পোষণ করছেন। কিন্তু স্বামীর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে যা শুনলাম তার থেকে মনে হল না, সে আশা অচিরে পূর্ণ হবার কোন সম্ভাবনা আছে। তাঁর স্বামী বর্ম্মীজ 'বীণা' বাজান, আমাদের বাজিয়ে শুনালেন। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন বর্ম্মীজ ভদ্রলোক বর্ম্মীজ তবলার সঙ্গত রাখলেন। সে বীণাকে বর্ম্মার ভারতবর্ষীয়েরা বলেন কাঠতরঙ্গ। একখানা নৌকাকৃতি কাঠের উপর সাতখানা চওড়া লোহার পাতের পরদা, দুধারে দুটি ছিদ্রে সুতো দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে জোড়া। সাতখানা পরদা—সা, রে, মা, পা, নি, র্সা, র্রে, 'কোমল' এই সাতটা সুরে বাঁধা। যতই গান বা বাজনা হোক্ না, ঐ কটা সুর অতিক্রম করে সরগমের আর কোন সুর স্পর্শ করার যো নেই। তাই প্রত্যেক বর্ম্মা সঙ্গীত গান্ধার ও ধৈবৎ-বর্জ্জিত কতকটা আমাদের সারঙ্গের মত।

মিসেস সেন আমায় বর্ম্মার 'পোয়ে' নাচ দেখাবার জন্যে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়েছিলেন, তার সুযোগ যখন তখন হয় না। বার্দূন শুনে বল্লেন, "আমার এক ভাইঝির বিয়ে পরশু, তদুপলক্ষ্যে পোয়ে হবে। যদি অনুমতি দেন, আপনার অতিথিকে সকালে বিয়েতে ও বিকেলে পোয়েতে নিয়ে যাব।"

মিসেস সেন যেন আমার হয়ে চাঁদ হাতে পেলেন, আহ্লাদে উৎফুল্ল হয়ে বল্লেন—"আশাতীত সুযোগ। বর্ম্মীজ বিয়ে ও ' পোয়ে' দুই দেখতে পাবে। কি শুভক্ষণে এসেছ।"

বর্ম্মার শ্বেতহস্তীর কথা উঠল। তাঁরা বল্লেন শ্বেতহস্তী আর দেখা যায় না, তবে বর্ম্মা শেল কোম্পানীতে ও অন্যত্র হাতী দিয়ে ভারতোলা দেখা একটা দর্শনীয় বস্তু বটে; কিন্তু সে কারখানাগুলিও এখন বন্ধ। তার ছবি সংগৃহীত হতে পারে। অনেক রাত্রে ডিনার পার্টি ভঙ্গ হল। পরদিন বিয়ে ও নাচ দেখার আশা মনে রেখে আমরা সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করলুম।

শোয়ে-ডাগন

নমস্য সেই মহাপুরুষেরা যাঁরা বর্ম্মায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। যেখানে কথায় কথায় মানুষে মানুষের মুণ্ডপাত করে এসেছে, যে দেশের প্রতি ধূলিকণা নররক্তে রক্তাক্ত, সেই আপূর্ব্ব-পশ্চিম-দক্ষিণোত্তর সমস্ত বর্ব্বর দেশটার বুক ফুঁড়ে উঠেছে সভ্যতার চূড়ান্ত নিদর্শন এক একটি প্রকাণ্ড সুধাধবল স্বর্ণচূড়ান্বিত মন্দির,— বুদ্ধের ও তাঁর শিষ্যগণের শান্ত মূর্ত্তির অধিষ্ঠানস্থল।

বর্ম্মার ইতিহাসে পাওয়া যায় জীবনের প্রচণ্ড মধ্যাহ্নে যে যত ক্রূরতা করেছে, জীবনের শান্ত সন্ধ্যায় সে তত শান্তি-নিদান বুদ্ধের শরণাপন্ন হয়েছে। শুনা যায় বর্ম্মীজদের প্রকৃতি শিশুসুলভ। এই হাসিমুখী, আমোদ আহ্লাদে রত, এই ক্রোধে উন্মত্ত এবং একবার ক্রুদ্ধ হলে দিক্‌বিদিক্ বা হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। সেই আদিম মানবের পাশব প্রকৃতিকে দমন করে যাঁরা ক্ষমা ও দয়ার অবতার বুদ্ধের নিকট মাথা নত করিয়েছিলেন, তাঁদের শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য-পর্ব্বত ও উত্তালতরঙ্গময় সমুদ্রলঙ্ঘন করে দেশবিদেশে অভিযান সার্থক হয়েছিল।

নির্দ্দয়তা ও হত্যার দেশে যাঁরা দয়া ও অহিংসার বাণী প্রচার করেন, তাঁরাই যথার্থ মরুভূমিতে কমণ্ডলু ভরে ভরে তৃষ্ণার বারি বিতরণ করেছেন। কিন্তু কি তপস্যা, কি অধ্যবসায় এবং কি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তির বলেই তা হতে পেরেছিল। সেই শ্রদ্ধার প্রেরণা ভারতের বর্ত্তমান হিন্দুর মধ্যে আছে কি? যদি বিশ্বাস করি, আমার ধর্ম্মে অমৃত আছে, এবং যদি সে অমৃত নিজে পান করে থাকি, তবেই তার মর্ম্মগ্রাহী হয়ে তা অপরকে দানের ইচ্ছা ও প্রেরণা-শক্তি আসে।

এই যে এত লক্ষ লক্ষ লোক ভারতে থেকেও বিধর্ম্মী হয়ে গেল, কেউ বা বাইব্‌ল্,

কেউ বা কোরাণের তথ্যকে ধর্ম্মের চূড়ান্ত বাক্য বলে গ্রহণ করলে—ভারতীয় হিন্দুর নিজধর্ম্মে ও ধর্ম্ম-গ্রন্থাবলীতে অনাস্থাই কি তার মূল কারণ নয়? মুসলমান বাদশার অনুচরেরা জোর করে মুসলমান করেছিল? নিজের ধর্ম্মে সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকলে কেউ কাউকে জোর করে অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে পারে কি? রোমের সমস্ত রাজকীয় বলও তৎপরবর্ত্তী কত সহস্র খ্রীষ্টানকে সধর্ম্ম ত্যাগে রত করতে পারেনি কেন? ইংলণ্ডে এবং সমস্ত ইউরোপে ল্যাটিমার প্রভৃতি শত শত স্বধর্ম্মে বিশ্বাসী সামান্য প্রজাও রাজাদেশে আগুনে পুড়ে মরা স্বীকার করেছে, তবুও নিজের ধর্ম্মকে অস্বীকার করেনি কেন?[১] ভারতবর্ষেও মোগল বাদশাদের হুকুমে শিখগুরু এবং তাঁদের বীর অনুচরেবা প্রাণ দিয়েছেন, কিন্তু ধর্ম্ম দেননি কেন? তাঁরা স্বধর্ম্মের অমৃতের মধ্যে অবগাহন করেছিলেন; নিজের ধর্ম্ম ছেড়ে পরধর্ম্ম গ্রহণে যে গঙ্গাস্নানের পর গোস্পদে স্নান করা হবে তা জানতেন; সে হীনতা সে আত্মাবমাননা স্বীকার করতে প্রস্তুত হননি। তাই মৃত্যু-বরণ করেছিলেন কিন্তু ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেননি।

খ্রীষ্টধর্ম্মে বা মহম্মদীয় ধর্ম্মে এমন কোন নূতন তত্ত্ব, জ্ঞান বা রস নেই যা হিন্দুধর্ম্মে পাওয়া যায় না, সুতরাং জন্ম হিন্দুর শুধু ধর্ম্মের তৃষ্ণায় অপর ধর্ম্ম গ্রহণ অনাবশ্যক, এবং যে ভারতবাসী মাত্রই হিন্দুধর্ম্মের বৃহৎ খনির পাশেই বসে আছে, তার পক্ষে শত সমুদ্র পারের ছোট ছোট খনির থেকে আমদানী-করা ধর্ম্মগ্রহণও নিষ্প্রয়োজন। তবে এ কথা সত্য যে, ভারতে ধর্ম্মখনির প্রহরীরা তাদের খনিজ অমূল্য পদার্থের ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছিল বলেই বাইরের মাল এতদিন চলেছে। সুধাসাগরের তীরে বসে সুধা পান না করে শুধু সুধার প্রহরীগিরি করায় হিন্দুর ধর্ম্মভাব মৃতকল্প, তার ধর্ম্মদান-শক্তিও পরিক্ষীণ। কবে সে আবার সুধাপানে মাতোয়ারা হবে? নিজের ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত সত্য, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের হ্রদে ডুবে যাবে? কবে তার বার্ত্তা অন্যদের কাছে বহন করবার জন্যে পাগল হবে?

সেই যে একদল পাগল ভারতবাসী বহু শতাব্দী পূর্ব্বে বর্ম্মার দিকে ছুটেছিলেন, তার ফলে ভারতের বাইরে ভারত-ধর্ম্ম আজও মৌলিক অবস্থায় বর্ত্তমান। পাঁচবৎসর বয়সে ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষা, গুরু-গৃহবাস, ও স্বাধ্যায় ভারতবর্ষ থেকে উঠে গেছে, কিন্তু বর্ম্মায় এখনও স্থির আছে। রাজপুত্র হোক বা সামান্য গৃহস্থের পুত্র—সকলকেই কয়েক বৎসরের জন্য বিহারে গিয়ে ভিক্ষাব্রত গ্রহণ ও গুরুর নিকট বিনয়ত্রিপিটক শিক্ষা করতে হয়। বর্ম্মীজ শিশুদের বর্ণমালা-জ্ঞান ধর্ম্মযাজকদের কাছে আরম্ভ হয়। শতাধিক কাল থেকে সমগ্র বর্ম্মায় এইভাবে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা (free primary education) চলে আসছে। বর্ম্মায় নিতান্ত গরীবগুরবা, চাষাভূষোরাও তাই নিরক্ষর নয়, সকলেই বই পড়ে ও খবরের কাগজ পড়ে। শুনা গেল, এ অবস্থা আর বেশীদিন টিকে কিনা সন্দেহ; কারণ প্রাচ্য সভ্যতার নজর লেগেছে; আজকাল ভারতবর্ষের ন্যায় বর্ম্মায়ও কর্পোরেশন থেকে প্রাইমারী স্কুলের সৃষ্টি হচ্ছে; তাতে করে বৌদ্ধ ধর্ম্মযাজকদের কাছে গিয়ে গুরুগৃহবাস ও অক্ষর-পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ পাঠও ক্রমেই বন্ধ হয়ে আসবে।

বর্ম্মায় প্রত্যেক পাগোডা বা 'ফয়া'র সংলগ্ন বিহার বা 'ফুদিচঙ' আছে; সেখানে শত

শত ফুঙ্গি বা বৌদ্ধ-সাধু বাস করেন। এই সকল সাধুদের আহারের ব্যয় সমস্ত গৃহস্থেরা বহন করেন। ভোরবেলা প্রত্যেক বর্ম্মীজ গৃহিণীর প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে বৌদ্ধ ভিক্ষুর জন্যে ভাত রাঁধা। অধিকাংশ ভিক্ষু নির্দিষ্ট বাড়ী বাড়ী গিয়ে ভিক্ষা সংগ্রহ করে আনেন; যাঁরা চলতে অক্ষম, গৃহিণীরা তাঁদের ভিক্ষান্ন পাঠিয়ে দেন। অন্ততঃ চার পাঁচটি ভিক্ষুকে না খাইয়ে কোন গৃহস্থ বা গৃহিণী নিজে অন্নগ্রহণ করেন না। বৌদ্ধ সাধুদের খাওয়া একবেলা, তাও মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই সেরে ফেলতে হবে; সূর্য্য বিষুবরেখায় চড়লে আর খাওয়ার নিয়ম নেই। তাই গৃহস্থের সাধুসেবাটা একবেলাতেই সমাপ্ত হয়।

অনেক সময় অনেক ডাকাত সাধু-আবাসগুলিতে আশ্রয় গ্রহণ করে; দিনের বেলায় ভিক্ষুর বেশ ধারণ করে ফন্দিচণ্ডে লুকিয়ে থাকে, রাত্রে সুযোগ হলেই ডাকাতি করতে বেরোয়। সেইজন্যে বর্ম্মীজ গৃহিণীরা সময় সময় বড় ভীত হন, অজানা সাধুকে বিশ্বাস করবেন কিনা ভেবে পান না। আমাকেও একজন বৃদ্ধা বর্ম্মীজ-মহিলা সাবধান করে দিলেন যে-সে সাধু-আবাস দেখতে যেন না যাই, আর একলা যেন কখনই না যাই।

ভারতবর্ষের দিল্লী আগরা প্রভৃতি পশ্চিমের সহরগুলির আকৃতিগত বৈলক্ষণ্য হচ্ছে—কবরের পর কবর—সেগুলি মোগলবাদশা ও তাঁদের অনুচরগণের স্বনাম-প্রতিষ্ঠার মূর্ত্তিমান আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা; কিন্তু বর্ম্মার অধমাধম নরপতিও নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করে প্রভু বুদ্ধের প্রতিষ্ঠাতেই মনঃপ্রাণ ও ধন ঢেলে দিয়েছেন। বর্ম্মার কত সহরে, কত গ্রামে, কত ধূ ধূ প্রান্তরে কত পুরাতন ভগ্নমন্দিরের কারুকার্য্যময় ইটকাঠ পড়ে রয়েছে। তাদের জীর্ণসংস্কার হয়নি; তারই পাশে নূতন যুগের নূতন ভক্তের নূতন মন্দির ও বিহার গড়ে উঠেছে। এই সকল মন্দির ও বিহার, বা 'ফয়া' বা পাগোডাই, বর্ম্মার আকৃতিগত বৈলক্ষণ্য। ইংরেজরা বর্ম্মায় প্রবেশমাত্র এটা লক্ষ্য করে এর নাম দিয়েছেন—The Land of Pagodas—পাগোডার দেশ। বর্ম্মার সমস্ত পাগোডার মধ্যে রেঙ্গুনের শোয়ে-ডাগন পাগোডা সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। এর চেয়েও বড় পাগোডা অন্যত্র আছে, কিন্তু এত কারুকার্য্য আর কোন পাগোডায় দেখা যায় না।

এর চারদিকে চারটি সিংহদ্বার; সোপানের পর সোপান আরোহণ করে তবে দ্বারে প্রবেশ করা যায়। গুটি দশ পনের ছোট ছোট সোপানের পর একটি করে প্রশস্ত সোপান আসে, তার একধারে বসে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে আবার অগ্রসর হওয়া যায়। সব সোপানগুলি শেষ হলে মাথার উপর ছাদযুক্ত একটা লম্বা দালান; দালানের দুধারে বিপণি, এই পণ্যবীথিকায় বর্ম্মাজাত সবরকম শিল্পবস্তু পাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে প্রভু বুদ্ধের জন্য সুন্দর সুন্দর তাজা ফুলও কিনতে পারা যায়। দোকানদার খুব অল্প, সবই প্রায় দোকানদারণী; পরিষ্কার ফিটফাট কাপড় পরা, কারো হাতে সোনার চুড়ি, হয়ত বা পায়েও সোনার মল, কানে হীরের ফুল, গলায় সোনার চেন,—কখনো বা মুক্তোর মালা,—খোঁপায় সুন্দর চিরুনি বা ফুল। বিক্রেয় জিনিষ এবং বিক্রেত্রী দুই আমার পক্ষে সমান আকর্ষণজনক হল। অনেকের দোকানখানাই ঘরবাড়ী। সেখানে বসেই প্রকাণ্ড লম্বা লম্বা পরচুলা বিছিয়ে, আঁচড়িয়ে নিজের চুলের সঙ্গে জড়িয়ে মাথার উপর একটা প্রকাণ্ড উঁচু খোঁপা খাড়া করে তুলছে। কেউ বা প্রাতরাশ করছে, বর্ম্মিচেলি

সিদ্ধর সঙ্গে 'সাজি' (শুটকি মাছ) মিশিয়ে খাচ্ছে। আর যাই করুক না করুক, খদ্দেরকে হাত-ছাড়া কেউ করছে না। কোন কোন দোকান মেয়ে-পুরুষ দুজনে মিলে চালাচ্ছে। আমি কতকগুলি বর্ম্মিজ জিনিস সংগ্রহ করলুম। মিসেস বার্দূন্ এক মুঠো ফুল কিনলেন। এখানে যে ফুল বিক্রী হয় তা বৃন্তচ্যুত ফুল নয়, লম্বা লম্বা বৃন্তযুক্ত ফুল—তার কারণ পরে উপলব্ধি হল।

বাইবেলে পড়েছিলুম ইহুদিদের ধর্ম্ম-মন্দিরে এইরকম পণ্যদ্রব্যসম্ভার দেখে যীশুখ্রীষ্ট একদিন ক্রোধোন্মত্ত হয়ে বিক্রেতাদের চাবুক মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন—তাদের দ্রব্য সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিলেন। বৌদ্ধ-মন্দিরে বুদ্ধদেবের চরণছায়ে বসে এই সকল বিক্রেতা ও বিক্রেত্রীরা তাদের জীবিকা-নির্ব্বাহ করে বলে বৌদ্ধ-পুরোহিতেরা তাদের কখন দোষ ধরেন না, বা তাদের তাড়াবার জন্যে যত্নবান্ হন না।

বিপণি-বীথিকার শেষে ডাইনে ও বাঁয়ে দুধারে খোলা শান-বাঁধান অঙ্গন; সেই অঙ্গনের স্থানে স্থানে মন্দির। এক একটি মন্দিরে এক একটি প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্ত্তি, তাঁর পাশে পাশে আনন্দ প্রভৃতি তাঁর পারিপার্শ্বিকদের ছোট মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিগুলির অসাধারণ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বোধ হয় বর্ম্মার ভাস্কর্য্যের বিশেষত্ব—ভারতবর্ষে কোথাও এত বড় মূর্ত্তি দেখা যায় না। অথচ প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুমান এই যে বর্ম্মার শিল্পসমৃদ্ধির যা কিছু পরিচয় তার সূত্রপাত হয়েছিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিল্পরীতির প্রভাবে। দেওয়ালের চিত্রগুলি দেখলে তা সম্ভব মনে হয়—বুদ্ধের জীবনচরিতের সঙ্গে সঙ্গে মহাভারত রামায়ণের অনেক কাহিনীও কোন কোন মন্দিরের দেওয়ালে চিত্রিত রয়েছে।

আমরা মন্দির-অঙ্গনে প্রবেশ করে প্রথমতঃ ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। বৃহৎ অঙ্গনের উপর বসেই অনেক ভক্ত ও ভক্তানী জপ করছেন। মন্দিরগুলির কারুকার্য্যের প্রতি বার্দূন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। কাঠের উপর খোদাই-কার্যই এদের বিশেষত্ব দেখলুম। শুধু দুটি থামে ভারতবর্ষের মোগল আমলের শিস্‌মহলের তুল্য ছোট ছোট আয়না চিত্রকারী করে বসান আছে, তার উপর সূর্য্যের আলো পড়ে থামগুলি ঝকমক করছে। অঙ্গনে বহু বর্ম্মিজ মন্দিরের মধ্যে একটি চীনা মন্দিরও আছে; সেটি বাইরে থেকেও যেমন দেখতে স্বতন্ত্র, তার ভিতরের সাজসজ্জা ও মূর্ত্তিগুলিতেও তেমনি প্রভেদ—তাদের অধিকাংশই তান্ত্রিক দেবদেবীর মূর্ত্তি।

গতবৎসর বজ্রপাতে শোয়ে-ডাগনের একটি মণিমাণিক্য-বিজড়িত চৈত্যচূড়া পড়ে যায়—আমাদের মন্দিরের কলসের মত বর্ম্মিজ মন্দিরের এই চূড়া—বর্ম্মিজ ভাষায় 'টী' বলে আখ্যাত। এটি বজ্রাহত হয়ে ভূপতিত হওয়া রেঙ্গুনের বর্ম্মীজরা বড় অশুভ লক্ষণ মনে করেন। তাঁরা চাঁদা তুলে, একটি শুভদিন দেখে, খুব ধুমধাম করে আবার সেটি পুনঃস্থাপিত করেন।

এই অঙ্গনের এক জায়গায় একটি অতিকায় ঘন্টা আছে, সেটি নাড়ান যার-তার সাধ্যি নয়। কিন্তু যদি কেউ কোন ইচ্ছা মনে রেখে সেটি নাড়াতে পারে, তার নাকি সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়। রেঙ্গুনেরই আর একটি পাগোডায় আর একটি ঘন্টা আছে; সেটি নাড়ান সহজ, কিন্তু সেটি নাড়ালেই নাকি বিদেশীকে এদেশে আর একবার ফিরে আসতেই হবে। এর সত্যতা সম্বন্ধে

রেঙ্গুন-প্রবাসিনী দুই একটি বাঙ্গালী-ব্রাহ্মমহিলা আমার সাক্ষ্য দিলেন।

আমরা স্বচ্ছন্দভাবে দেখেশুনে বেড়াচ্ছি—কিন্তু কোন পাণ্ডার চিহ্ন নেই ; তাদের ধ্বস্তাধ্বস্তি নেই ; তাদের হাতে পড়ে যজমানের প্রাণ নিয়ে টানাটানি নেই—ভারতবর্ষের মন্দির-দর্শন থেকে মগের মুলুকের এই এক অত্যাশ্চর্য্য শান্তিময় সুশোভন প্রভেদ। তাতে যে দেবতার উদ্দেশে দান বন্ধ থাকে তা নয়। প্রত্যেক মন্দিরের কাছাকাছি বড় বড় বাক্স এঁটে বসান আছে দেখলুম ; তাতে যে যার ইচ্ছে-মত টাকা পয়সা সিকি আধুলি ফেলে যাচ্ছে। এই সব বাক্সে যত টাকাকড়ি জমা হয় তা 'পাগোডা ট্রষ্টে'র হাতে যায়। ট্রষ্টীরা মন্দির সংক্রান্ত সমস্ত ব্যবস্থা করেন। প্রতি রাত্রে মন্দিরকে দীপান্বিত করার খরচ এবং মন্দির ও মন্দিরবাসী সাধুদের সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ এই দানের টাকা থেকে নির্ব্বাহ হয়। টাকাপয়সা ছাড়া ভক্তেরা অন্যান্য দানও নিয়ে আসেন—অন্ন, বস্ত্র, ছাতা, পাখা, হীরা, মতি সবই আসে, দেবতার কিছুরই অপ্রতুল হয় না। আমাদের মন্দিরের ঠাকুরের মত এখানকার ঠাকুর পুরোহিত ছাড়া আর সকলের অস্পৃশ্য বা অনধিগম্য নন। ঠাকুরের কাছে গিয়ে ঠাকুরের গলায় স্বহস্তে যে চায় মালা পরিয়ে আসতে পারে, স্বর্ণমণ্ডিত ঠাকুরের গালে ও ভালে নিজেদের হাতে আরো সোণার পাতা লাগিয়ে আসে। ঠাকুর সকলেরই নিজস্ব, সকলেরই স্বহস্তে সেবনীয়, শুধু পাণ্ডা পুরোহিতের নয়।

আমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে বার্দুন হঠাৎ একবার একটি সাধুর সঙ্গে অন্তর্ধান হলেন। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বল্লেন—ঐ সাধুটি তাঁর কলেজের বন্ধু ছিলেন, একজন খুব প্রতিপত্তিশালী অফিসার হয়েছিলেন, হঠাৎ কয়েক বৎসর থেকে তাঁর আর কোন সম্বাদাদি পাননি। আজ তাঁকে অকস্মাৎ এই সাধুর বেশে দেখলেন। তিনি আপাততঃ মৌনব্রত নিয়েছেন, তাই আর কথাবার্ত্তা হতে পারল না।

বর্ম্মায় প্রায় প্রত্যেক বড় বড় পাগোডার সংলগ্ন একটি পুষ্করিণী থাকে, তাতে পোষা মাছ ও কচ্ছপ বিচরণ করে। এই কচ্ছপদের খাওয়ান, মন্দির-দর্শনে আগন্তুকের একটি অতি অবশ্যকরণীয় কার্য্য। পুকুরের সান-বাঁধান ঘাটের উপরেই খই, পাঁউরুটির টুকরো প্রভৃতি মৎস্যজাতির প্রিয় নানা খাদ্য কিনতে পারা যায়। প্রায় দশ মিনিট ধরে আমরা তাদের খাইয়ে তাদের ক্রীড়া দেখতে লাগলুম।

আমরা ঘুরতে ঘুরতে প্রধান মন্দিরটিতে এসে পৌঁছলুম। ইতিমধ্যে নানাভাবে, নানা মুদ্রায় বুদ্ধের স্থির, শান্ত, বসা মূর্ত্তি ত অনেকই দেখেছি, তার উপরে একটি সুদীর্ঘ শয়ানে মূর্ত্তিরত্নের অতি অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি অনুভব করেছি। এখানে একটি বৃহৎ ছত্রের নীচে আসীন বুদ্ধমূর্ত্তির সামনে অনেকগুলি ফুলদানিতে ফুল সাজান রয়েছে দেখলুম। ভাবলুম বুঝি মন্দিরের ব্যবস্থাপকেরা এইরূপে মন্দিরকে সজ্জিত করেছেন। তা নয়, এ ভক্তদের নিজ হাতের সাজান। এইবার মিসেস বার্দুন যে ফুলগুলি কিনে এনেছিলেন, তার মধ্যে কতকগুলি আমার হাতে দিলেন, কতকগুলি তাঁর স্বামীর হাতে দিলেন ও কতকগুলি নিজে রাখলেন। তাঁরা উভয়ে অগ্রসর হয়ে পূর্ব্বোক্ত ফুলদানির একটিতে তাঁদের ফুলগুলি সাজিয়ে রেখে দিলেন দেখলুম,

আমিও তাই করলুম। আমাদের পরে যারা এল, তারাও তাই করলে। ভারতবর্ষের মন্দিরে যেমন পুরোহিতের নির্দ্দেশ অনুসারে মূর্ত্তিকে লক্ষ্য করে ফুল ছুঁড়ে ফেলা হয়, কাদায় জলে পায়ে পায়ে থেঁৎলে ফুলগুলি ম্লান হয়ে যায়—এখানে তেমন নয়। বুদ্ধের মূর্ত্তির সামনে ও আশেপাশে ছোট বড় নানারকমের খালি ফুলদানি রাখা থাকে, প্রত্যেক দর্শক ও ভক্ত নিজের নিজের সুদীর্ঘ বৃন্তসমেত ফুল সেই ফুলদানির একটিতে গুঁজে দেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এইরকম ফুলের স্তবকে মন্দিরের শোভা বাড়ে ও ফুলের মহিমাও অক্ষুণ্ণ থাকে। কোন কাদা নেই, জল নেই, মলিনতা নেই—সবই সুশ্রী, শোভন, পরিপাটি। ফুলবিন্যাস জাপানে একটি বিশেষ কলা বলে গণ্য হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেই কি ভারতের যত সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি বৌদ্ধজগতে পলাতকা হয়েছে ? আর তাকে হতভাগ্য ভারতে ফিরে আনা যায় না ? যে মন্দিরের পুরোহিতেরা আচারে ব্যবহারে, আকারে প্রকারে অপরিচ্ছন্নতা ও শ্রীহীনতার প্রতিমূর্ত্তি, সে মন্দিরগুলিও যে শ্রীহীন এবং তার দেবতারাও শ্রীহীন হবেন তার আর আশ্চর্য্য কি ?

মন্দিরের অভ্যন্তরে মূর্ত্তিখানির সামনে শ্বেত মর্ম্মর বাঁধান হলের মত অনেকটা লম্বা জায়গা আছে ; তার উপর কতকগুলি মাদুর বিছান। ভক্তেরা ফুল সাজিয়ে সেখানে বসে খানিকক্ষণ বুদ্ধের ধ্যান করেন, কেউ কেউ পালিগ্রন্থ খুলে পাঠ করেন, কেউ মন্ত্র জপ করেন, তারপর উঠে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করে চলে যান। বার্দুনরা খানিকক্ষণ নিঃশব্দে প্রার্থনা করে দণ্ডবৎ হলেন। আমিও ভক্তিভরে প্রণাম করে মনে মনে আত্মনিবেদন করলুম—

বাসনাদিগ্ধ নয়নে স্নিগ্ধ
নয়ন রাখ হে বুদ্ধ !
অন্তর-জ্বালা জুড়াইয়ে যাক্
শান্ত হউক লুব্ধ !
পুণ্য মুরতি-ধ্যানেতে বিরতি
লভুক লজ্জাস্তব্ধ
হিংসা কুটিল আচরণ, হোক্
কলরব নিঃশব্দ।
তব দয়ার্দ্র অমৃত ভদ্র
বাণীতে ভরুক চিত্ত !
কামনার পার লয়ে যাও মোরে,
এস হে পরম বিত্ত !
এস তথাগত ! শ্রীপদে আনত
তাপিত জনের শরণ !
জনমে জনমে আন হে ধরমে
দুঃখ কলুষ হরণ!

ভারতবর্ষ, কার্ত্তিক, চৈত্র ১৩৩৮; শ্রাবণ ১৩৩৯